নারী ও নগরী

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

সুন্দর প্রকাশন

শ্রীমনোজ বসু

শ্রদ্ধাস্পদেষু ॥

'নারী ও নগরী'র প্রথম দুটি সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষিত হওয়া সত্ত্বেও বিচিত্র কারণে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি। সুন্দর প্রকাশন উদ্যোগী না হ'লে হয় তো তৃতীয় সংস্করণ আদৌ প্রকাশিত হতো না।

এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এর বাংলা ও তেলেগু চিত্রস্বত্ব কিনেছিলেন মোতিমহল থিয়েটার্স। খ্যাতনামা পরিচালক শ্রীমধু বসুর পরিচালনায় বোধ হয় চিত্রগ্রহণের কাজও কিছু এগিয়েছিল। যশস্বী চিত্র পরিচালক শ্রীবিমল রায় বম্বে থেকে এই গ্রন্থটিকে সম্বর্ধিত করে ও চিত্রস্বত্ব ক্রয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করে পত্র দিয়েছিলেন। কলিকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রখ্যাত শিল্পীসমন্বয়ে গ্রন্থটির নাট্যরূপ প্রচারিত হয়েছে। এ ছাড়া বহু পেশাদারী দল এটি অভিনয় করার অনুমতি চেয়ে গ্রন্থকারকে পত্র লিখেছিলেন।

তৃতীয় সংস্করণে গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পরিমার্জিত করলাম। যে সব পাঠক পাঠিকা অভিনন্দন জানিয়ে আমাকে পত্র লিখেছিলেন এই সুযোগে তাঁদের সকলকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

ফোন: ৪৬-৬০৯৬
২০, চারু এভিনিউ।
কলিকাতা-৩৩।

॥ এক ॥

মাতঙ্গী নদীর ধার থেকে মল্লিক বাড়ির গেট পর্যন্ত পেট্রোম্যাক্সের সার। ঘাটের ধারে ছেলে বুড়ো মেয়েদের ভিড়। ভরতপুরে বোধ হয় বাড়ির মধ্যে আর কেউ নেই।

সবাই উন্মুখ। বাঁকের মুখে একবার বজরাটা দেখা গেলে হয়। বাজনদাররা ঘাসের ওপর বসেছে গোল হয়ে। বাদ্যযন্ত্রগুলো আশেপাশে ছড়ান। বজরা কাছে না এলে আর বাজনায় হাত দিয়ে লাভ কি।

জলের কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে জনার্দন ঘোষাল। ভোল বদলে ফেলেছে একেবারে। সযত্নে আঁচড়ান বাবরী চুল, দুটি গোঁফের প্রান্ত মোম দিয়ে ছুঁচল করা। কপালের মাঝখানে আধুলি পরিমাণ সিঁদুরের টিপ। সিল্কের চাদর সাদা চীনে কোটের ওপর আড়াআড়ি ভাবে বাঁধা। হাতে রূপো-বাঁধান লাঠি। ভরতপুরের দুর্দান্ত নায়েব জনার্দন ঘোষাল। এক ডাকে সাতখানা গাঁয়ের লোক চেনে। শুধু একটু ইঙ্গিতের অপেক্ষা। ব্যস, আর দেখতে হয় না। কাজ ঠিক হাসিল হয়ে যায়।

কথা উঠলে সোডার ছিপি খোলার মতন শব্দ করে হাসে। বলে, আরে বাবা, সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠলে কি আর মিছিমিছি আঙ্গুল বাঁকাই আমি?

হঠাৎ নায়েবের বাজখাঁই আওয়াজ শোনা গেল। বাজনদারদের দিকে চেয়ে বলল, বাপধনরা এবার কষ্ট করে গা তোল। বজরা দেখা যাচ্ছে।

আর বেশী বলতে হল না। শানাই আর রামশিঙের শব্দে জায়গাটা সরগরম। মেয়ের দল শাঁখ মুখের কাছ বরাবর নিয়ে একেবারে তৈরি। জন পাঁচ ছয় ছোকরা লাঠি হাতে জলের কোল ঘেঁসে ছুটোছুটি শুরু করল। এই সাবধান, জলের কাছে এস না, পিছিয়ে যাও সব। বর্ষার মাতঙ্গী, একবার পা পিছলে গেলে আর দেখতে হবে না, একেবারে সাগরে টেনে নিয়ে ফেলবে।

বজরা দেখা গেল, জলের বুকে সার্চলাইটের তীব্র আলো। ষোল দাঁড়ে ভর দিয়ে যেন উড়ে আসছে। বাজনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মেয়েদের উলুধ্বনি আর শাঁখের আওয়াজ।

ভরতপুরের ছোট বাবু ফিরছেন। একা নয়, জোড়ে। বংশের দুলাল। শিবরাত্রির সলতে।

বজরা ঘাটে লাগতেই সবাই পিছিয়ে এল। কাঠের তক্তা পেতে দিয়েছে মাঝিরা। কাদা না লাগে হুজুরের পায়ে। নতুন বৌয়ের আলতা এঁটেল মাটি লেগে নষ্ট না হয়ে যায়। কাঠের তক্তার ওপরে নায়েব নিজের হাতে গালিচা বিছিয়ে দিল। সবুজ রংয়ের পুরু গালিচা, বাদামী বর্ডার।

প্রথমে নামলেন শেখরনাথ। দীর্ঘ কাঠামো, টকটকে রং, মাথার কোঁকড়ানো চুলগুলোতে পর্যন্ত কটা রংয়ের ছোপ। পিছনে খুব সাবধানে পা ফেলে নতুন বৌ। মুখ ঘোমটায় ঢাকা। পরনে বেনারসী। সবুজ জমির ওপর সোনালী পাতা। তারপর ভটচাজ মশাই, শেখরনাথের চারজন পাইক, আর সব চেয়ে পিছনে বন্দুকের বাক্স মাথায় হীরু বাগদী।

ঘাটের ওপরেই পালকি তৈরি। নতুন বৌ পালকিতে উঠল। নায়েব শেখরনাথের কাছে এগিয়ে এসে তাঁকেও উঠতে বলল, কিন্তু হাত নেড়ে শেখরনাথ আপত্তি করলেন। কতটুকুই বা পথ। জোর পায়ে চললে পালকির আগেই গিয়ে পৌঁছতে পারবেন।

বরণ শুরু হল মল্লিক-বাড়ির গেটের সামনে। পালকি নামান হয়েছিল বুড়ো অশত্থতলায়। মল্লিক-বাড়ির গেট থেকে হাত চল্লিশেক বড় জোর। মল্লিক বংশের নিয়ম নতুন বৌকে প্রথম নেমে হাঁটু মুড়ে প্রণাম করতে হয় এই গাছতলায়, তারপর হেঁটে যেতে হয়। মল্লিক-বাড়ি ঢোকবার আগে ভরতপুরের মাটি মাড়াতে হয়। তিন পুরুষ ধরে এই নিয়ম চলে আসছে।

শেখরনাথ আগেই পৌঁছলেন। বুড়ো অশ্বত্থতলায় প্রণাম সারতে একটু দেরি হয়ে গেল নতুন বৌয়ের। সেই ফাঁকে শেখরনাথ পাশ কাটিয়ে চলে এ.লন।

নিকষ কালো পাথরের ওপর দাঁড় করান হল দুজনকে। বৌয়ের পায়ের সামনে রূপোর বাটিতে জল রাখা হল। বৌকে নিচু হয়ে বসে সেই জলে শেখরনাথের পা ধুইয়ে নিজের চুল দিয়ে পা মুছিয়ে দিতে হবে। তারপর পাশা-পাশি দুজনকে ঢুকতে হবে বাড়িতে।

পা ধুইয়ে দেবার সময় নতুন বৌয়ের ঘোমটা অনেকখানি সরে গেল। এক-মাথা কালো কোঁকড়ানো চুলের রাশ, তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ, টিকালো নাক, আয়ত

টলটলে দুটি চোখ। কারো চোখের পলক পড়ল না। এত সুন্দর হয় মানুষ! এমন রূপ না থাকলে কি আর এই বয়সে ব্রতভঙ্গ হয় শেখরনাথের। ছেলেবেলা থেকে কেবল লাঠি খেলা, ছুরি খেলা, শখের গানবাজনা তারপর আর একটু বড় হতে শিকারের ঝোঁক, বন্দুক হাতে নিয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। সময় কোথায় বিয়ে করার? বলে বলে বুড়ী মা হয়রাণ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি চোখ বুজবার পর তাঁর জায়গায় এলেন পিসি। সকাল সন্ধ্যা নিয়মিত শেখর-নাথকে বিয়ের তাগিদ দিতে লাগলেন। প্রথম প্রথম তবলায় চাঁটি দিতে দিতে হেসে উঠতেন শেখরনাথ, ঠিক আছে পিসি, তুমি মায়ের অভাব কাঁটায় কাঁটায় পূর্ণ করেছ, যত্ন-আত্তি তো আছেই তার ওপর তাঁর তাগিদ দেওয়ার ধারাটাও বজায় রেখেছ।

ওই পর্যন্ত। কথাটা শেখরনাথ গায়েই মাখতেন না। বেগতিক দেখলেই বন্দুকের বাক্স হীরু বাগদীর কাঁধে চাপিয়ে দিন পাঁচ সাতেকের জন্যে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতেন বাড়ি থেকে।

বড় অমরনাথ মারা গিয়েছিলেন বিয়ের বছর দুই পরেই। মহালে খাজনা আদায় করতে গিয়েছিলেন, দিন সাতেক পর যখন ফিরলেন তখন পালকি থেকে নেমে হেঁটে আসবার ক্ষমতা ছিল না। বেহারারা পাঁজাকোলা করে সন্তর্পণে নিয়ে এসেছিল বাড়ির ভিতর। ওপরের জানলার আড়াল থেকে সতী সবই দেখেছিল। কিন্তু তেমন আশ্চর্য কিছু লাগে নি। এ ব্যাপার এ বাড়িতে প্রথম নয়। মদে চুর হয়ে কতদিন এইভাবে ফিরেছেন অমরনাথ। মার চোখ এড়িয়ে বৈঠকখানা ঘরে শোয়ানো হত তাঁকে। বৌকে যেতে হত না। নায়েব জনার্দন ঘোষালই সব বন্দোবস্ত করত। বন্দোবস্ত আর কি। তার হুকুমে চাকরেরা ঘটি ঘটি জল ঢালত মাথায় কিংবা বাড়াবাড়ি কিছু হলে গাঁয়ের কবিরাজ প্রসন্নবাবু এসে ঘুমের ওষুধ দিয়ে যেতেন।

সেই রকমই কিছু একটা ভেবে সতী প্রথমটা মোটেই উতলা হয়নি।

কিন্তু একটু পরেই দিনের আলোর মতন সব কিছু স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। নায়েব জনার্দন ঘোষালের থমথমে আওয়াজ, মা, বাইরে আসবেন একটু?

কি হয়েছে নায়েবকাকা? দরজার ওপাশে দাঁড়ান নায়েবের সামনে গিয়ে সতী দাঁড়িয়েছিল।

একবার নিচে চলুন, বড়বাবুর শরীর বড্ড খারাপ।

সতী আর দাঁড়াতে পারে নি। সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠেছিল। চোখের সামনে তরল অন্ধকারের স্রোত। টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়েছিল।

তারপরে দিন সাতেক বোধ হয় বেঁচে ছিলেন অমরনাথ। জ্ঞান হয় নি। প্রবল জ্বরের ঘোরে কেবল প্রলাপ বকে গিয়েছিলেন। অনর্গল কথার প্রবাহ। কিন্তু বাড়ির কথা একটুও বলেন নি, আত্মীয়স্বজনের নাম নয়, কেবল কোথাকার সব বাইজীদের নাম, তাদের রূপের বর্ণনা, দেহ-সৌষ্ঠবের নিখুঁত বিবরণ।

মাথার কাছে চুপচাপ বসে ছিলেন অমরনাথের মা। পাথরের মতন শক্ত কঠিন। কিন্তু পায়ের কাছে বসা সতীর অবস্থা আরও ভীতিপ্রদ। কাগজের মতন ফ্যাকাশে মুখের রং, সুখ দুঃখ বেদনা আনন্দ সব অনুভূতির বাইরে। অন্য এক জগতের বাসিন্দা। চোখের সামনের বিয়োগান্ত নাটকে যেন ওর কোন ভূমিকা নেই। কেবল নিমন্ত্রিত দর্শক।

বিয়ের কথা মনে হলেই দাদার মৃত্যুর দৃশ্য আর অনর্গল প্রলাপের পাশাপাশি বৌদির শান্ত সমাহিত মূর্তি ভেসে উঠত চোখের সামনে। না থাক, বিপদ এনে দরকার নেই। শেখরনাথ বন্দুকের কলকব্জা পরিষ্কারে মন দিতেন।

কিন্তু ব্যাপারটা যেন কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। শিকারেই বেরিয়েছিলেন শেখরনাথ।

চকদীঘির জঙ্গলে চিতাবাঘ নাকি গুনে শেষ করা যায় না। আকারে খুব বড় নয় কিন্তু ভীষণ হিংস্র। আশেপাশের গাঁয়ের গোরু ছাগল কিংবা আওতায় পেলে কাঠুরেদের আর প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে হত না। এখান থেকে বজরাতে তিন রাতের পথ।

পিসির কথা থেকে বাঁচবার জন্যে শেখরনাথ চকদীঘির জঙ্গলেই পাড়ি দেওয়া স্থির করেছিলেন।

গিয়ে অবশ্য পৌঁছলেন কিন্তু বিপত্তি বাধল আস্তানা নিয়ে। ছোট্ট ডাক বাংলো। একটি মাত্র কামরা, সেখানে আগেই ডেরা বেঁধেছেন বনবিভাগের লালমুখ সাহেব। শিকারের খোঁজে নয়, সুন্দরী গাছের হিসেব নিতে। মাস খানেকের আগে নড়বেন এ ভরসা অত্যন্ত কম। শেখরনাথ মুশকিলে পড়লেন। পাইক চারজনকে চারদিকে ছোটালেন আশ্রয়ের খোঁজে। এতদূর এসে ফিরে যাওয়াও তো যায় না। আর সেটা শেখরনাথের কুষ্ঠিতে লেখেনি।

পাইকেরা ফিরে এল। এখান থেকে গাঁ মাইল তিনেক দূর। সেখানে মিলতে পারে আশ্রয়। অগত্যা নদীর ধার দিয়ে দিয়ে শেখরনাথ গাঁয়ের উদ্দেশেই রওনা হয়েছিলেন।

গাঁ অবধি আর যেতে হয়নি, মাঝপথেই আশ্রয় পেয়েছিলেন। বনের কোল ঘেঁষে ছোট্ট বাংলো। চারদিকে তরিতরকারির ক্ষেত। ধারে ধারে তাল সুপুরির সার। দরজা ঠেলে ভিতরে গিয়ে ঢুকেছিলেন।

পুরু পাওয়ারের চশমা, শুভ্র-কেশ একটি প্রৌঢ়, বইটা নামিয়ে রেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন, তারপর পরিচয় পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন।

ঘরের কোন অভাব নেই। খান দুয়েক ঘর তো বাড়তিই পড়ে ছিল। অনায়াসেই থাকতে পারেন শেখরনাথ, লোক লস্কর নিয়ে যতদিন ইচ্ছা।

ক্রমে আলাপ হয়েছিল। ভবতোষবাবু কৃষিবিভাগের বড় চাকুরে। অবসর গ্রহণ করেও কৃষিকর্মের মায়া কাটাতে পাবেন নি। বিঘে পঞ্চাশ জমি কিনে লোকজন লাগিয়ে মহা উদ্যমে চাষবাস শুরু করে দিয়েছিলেন। দুনিয়াতে আপনার বলতে ওই একটি মাত্র মেয়ে লীলা,—মা-মরা।

লীলার সঙ্গে শেখরনাথের আলাপ হয়েছিল তার পরের দিনই। বসে বসে হীরু বাগদীর সঙ্গে শিকারের আয়োজন করছিলেন, এমন সময় লীলা এসে দাঁড়িয়েছিল চৌকাঠের কাছে। ছিপছিপে একহারা মেয়েটি। সুগৌর বর্ণ। অপূর্ব মুখশ্রী। শেখরনাথ কবি হলে বনশ্রী কিংবা বনলক্ষ্মী এমনি একটা উপমাই বোধ হয় মনে পড়ত।

আপনার চা দেওয়া হয়েছে। অকুণ্ঠ গলার স্বর। সামান্য জড়তা নেই।

ভাল করে আলাপ হয়েছিল চায়ের টেবিলে। ভবতোষবাবুই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এই আমার মেয়ে লীলা। একে সম্বল করেই সভ্য জগতের বাইরে পড়ে আছি।

লীলা হাত দুটো জোড় করে নমস্কার করেছিল, কিন্তু শেখরনাথ প্রতিনমস্কার করেন নি। হাত তুলে কাউকে নমস্কার করার অভ্যাস তাঁর নেই। পথে-ঘাটে প্রচুর নমস্কার তিনি পেয়েই আসছেন। গাঁয়ের প্রজাবর্গ থেকে পাইক বরকন্দাজদের। উত্তরে শুধু ঘাড়টা ঈষৎ নেড়ে থাকেন। প্রত্যভি-বাদনের এই ধারার সঙ্গেই তিনি পরিচিত। এবারেও ঘাড় নেড়ে পালা শেষ করলেন।

শিকার আপনার ভাল লাগে ?

মেয়েটির আচমকা প্রশ্নে শেখরনাথ একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু শুধু অল্পক্ষণের জন্যে, তারপরই সামলে নিয়ে বলেছিলেন, হুঁ, খুব ভাল লাগে! মাসের মধ্যে বার দুয়েক আমি বেরিয়ে পড়ি বাড়ি ছেড়ে।

কিন্তু এমন নিষ্ঠুর আমোদে আপনার মতো লোকের কি করে মন বসে তাই ভাবছি।

শেখরনাথ হঠাৎ যেন প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছিলেন। কি বলতে চায় মেয়েটি ? ওর মতো লোক! শিকার তো রাজা রাজড়াদেরই নেশা।

মেয়েটি উত্তর দিয়েছিল, শিকার আপনাদের জন্যে, এই তো বলবেন ? কিন্তু বন্দুকের বাক্সের পাশাপাশি বেহালার বাক্সটাও যে দেখে ফেলেছি।

অবশ্য আশ্চর্য হবার বিশেষ কিছু এতে পান নি শেখরনাথ। বাইরে শিকারে গেলেই বেহালাটা সংগে নিতে ভুলতেন না। অবসর সময়ে আস্তে আস্তে ছড় টানতে ভাল লাগত। থুতনী দিয়ে বেহালার মাথাটা চেপে ধরে খুব মোলায়েম কোন সুর।

শিকারে কালই না হয় যাবেন, আজ আমায় বেহালা শোনাতে হবে। বাপের একটি মাত্র সন্তান। পুরো মাত্রায় আবদারে। স্থানকালপাত্র জ্ঞান নেই। এত কষ্ট করে স্রোতের মুখে পাড়ি দিয়ে শেখরনাথ এতদূর এসেছেন বুঝি অজানা এক মেয়েকে বেহালা শোনাতে!

কোন উত্তর দেন নি শেখরনাথ, শুধু ঠোঁট মুচকে হেসেছিলেন।

কি যে যাদু মাখানো ছিল মেয়েটির আয়ত কাজল দুটি চোখে, শেখরনাথ যাই যাই করেও শিকারে যেতে পারেন নি। দুপুর বেলা বসে বসে বেহালায় পিলু আর বসন্ত আলাপ করেছিলেন। মেয়েটি কাছে বসে একমনে শুনেছিল।

কিন্তু শুধু কি একটা দিন! দিনের পর দিন গেল। বন্দুকের বাক্স এক-কোণে পড়ে রইল। ধুলো জমল কলকব্জায়। হীরু বাগদী তাগাদা দিয়ে দিয়ে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। অবস্থা দেখে ঝাঁকড়া চুলের গোছা নেড়ে একদিন বলেই ফেলেছিল পাইকদের কাছে।

শিকার করতে এসে ছোটবাবুই বুঝি ঘায়েল হয়ে গেলেন।

দিন সাত আট পরে শেখরনাথই পেড়েছিলেন কথাটা। আধস্বরে প্রেমের

গুঞ্জন নয়। ও বালাই শেখরনাথের ছিল না। কোন একটা জিনিস তাঁর ভাল লেগেছে, কাজেই চাই, সম্পূর্ণ জমিদারী মনোভাব।

লীলাও আপত্তি করে নি, কেবল এক সময়ে ক্ষীণ গলায় বলেছিল ওর বাপের কথা। আবার মুচকি হেসেছিলেন শেখরনাথ। বাপের ক্ষেত রইল, ফলপাকুর রইল, রইল মজুর মজুরানী, আর কিসের অভাব!

তারপর চলল চিঠি লেখার পালা। শেখরনাথই পিসিকে লিখলেন ব্যাপারটা। পিসি প্রথম প্রথম একটু খুঁতখুঁত করেছিলেন। এ যেন সমানে সমানে হল না। কোথাকার কে মেয়ে তার নেই ঠিক, কি জাত, কেমন বংশ কিছুই জানা গেল না। কিন্তু দু-এক দিনের মধ্যেই পিসি বেশ বুঝতে পারলেন, তাঁর মতামতের ওপর নির্ভর করছে না কেউ। শেখরনাথের ইচ্ছা, কাজেই বিয়েটা হবেই।

পুরুত ঠাকুর গেলেন, গাঁয়ের দু-একজন বুড়ো লোক গেলেন অভিভাবক স্থানীয়। বেশী ভিড় করতে চান নি শেখরনাথ। ধুমধাম, হৈ চৈ যা কিছু করার ভরতপুরে গিয়ে করলেই চলবে।

কোন রকমে নমো নমো করে বিয়েটা সেরে শেখরনাথ ভরতপুরে ফিরলেন। যা একটু মন খুঁতখুঁতানি ছিল পিসির, বৌয়ের মুখ দেখে সেটা ঘুচে গেল। বৌ তো নয় যেন পূর্ণিমার চাঁদ। যেমন শ্রী তেমনি গড়ন। রাজরাজড়ার ঘরেরই উপযুক্ত। পছন্দ আছে বলতে হবে শেখরনাথের।

ভটচাজ মশাই বর কনেকে সংগে নিয়ে বিরাট হলঘরে গিয়ে দাঁড়ালেন। দেয়ালে প্রকাণ্ড অয়েল পেন্টিংয়ের সার। মাঝখানে রঙীন ঝাড় লণ্ঠন। পায়ের তলায় পুরু গালিচা ঘাসের মতন নরম। ছবির দিকে আঙুল দিয়ে দিয়ে ভটচাজ মশাই পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন একটার পর একটা। কৃতী পূর্বপুরুষদের আলেখ্য। বৌ হেঁট হয়ে প্রণাম করতে লাগল।

প্রপিতামহ দর্পনারায়ণ মল্লিক। প্রথম জমিদারির পত্তন করেন। বাপের নামে জমিদারির নাম রাখলেন ভরতপুর। অমায়িক সজ্জন লোক ছিলেন। প্রতি প্রত্যূষে ব্রাহ্মণকে কিছু দান না করে জলস্পর্শ করতেন না।

পিতামহ শিবনারায়ণ মল্লিক। দাপটে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত। একবার এক নীলকর সাহেবকে আধমরা করেছিলেন। বিখ্যাত লাঠিয়াল ছিলেন। গণি মিয়ার সাকরেদ। অল্প বয়সে কলেরায় মারা যান।

পিতা কেশবনাথ মল্লিক। ধর্মভীরু, নির্বিরোধ পুরুষ। গোত্রে না হলেও হৃদয়ে ব্রাহ্মণ ছিলেন। দান-ধ্যান, পূজা-অর্চনা এই নিয়েই দিন কাটাতেন। গান-বাজনায় খুব ঝোঁক ছিল। দু-বার সন্ন্যাস নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন সংসার থেকে, কাকুতি মিনতি করে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল।

তারপর শেষ ছবিটার কাছে এসে ভটচাজ মশাই কিছুক্ষণ চুপচাপ মাথা নিচু করে দাঁড়ালেন। পিছন থেকে চাপা কান্নার একটু আওয়াজও শোনা গেল। শেখরনাথকেও যেন একটু বিচলিত মনে হল। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে কিছুই নজর এড়াল না লীলার।

এক সময়ে ভটচাজ মশাই ধরা গলায় বল্লেন, অমরনাথ মল্লিক, এ বাড়ির বড় বাবু। ব্যস, এইখানেই তিনি কথায় ছেদ টানলেন। গুণবত্ত্বা ব্যাখ্যা নয়, পৌরুষ কীর্তন নয়, বাছা বাছা বিশেষণের উপঢৌকন নয়, নিছক নীরস পরিচিতি। নিঃশেষিত অমরনাথের বুঝি কোন দান ছিল না ভরতপুরে।

ছোটবাবু শেখরনাথ মল্লিক। দক্ষ শিকারী, সুদক্ষ যন্ত্র-শিল্পী। কথাটা লীলা মনে মনে দুবার আওড়াল, তারপর বাড়ির মেয়েদের ইঙ্গিতে দালান পার হয়ে অন্তঃপুরে ঢুকল।

॥ দুই ॥

বিয়ের গোলমাল মিটতে প্রায় দিন পনের। বাড়তি আত্মীয় স্বজন যাই যাই করেও রয়ে গেলেন দু-পাঁচদিন। এ কদিন লীলার যেন আর নিশ্বাস ফেলার সময় ছিল না। সাজপোশাক জড়োয়া গয়না পরে রং করা পুতুলের মতন বসে থাকতে হত। কখন ডাক পড়ে ঠিক আছে কিছু! হয়তো দক্ষিণের জানলাটা খুলে দিয়ে একটু বিশ্রামের আয়োজন করছে, পিসি দরজায় টোকা দিলেন, বৌমা আছ নাকি?

লীলা অনভ্যস্ত হাতে ঘোমটা টেনে দিয়ে উঠে দাঁড়াল, আসুন পিসিমা।

পিসি ঘরে ঢুকেই বললেন, চট করে শাড়িটা পালটে একটু এদিকের ঘরে এস বাছা। চারু দিদি তোমায় দেখবার জন্য বসে আছেন। যেতে যেতে আলগোছে

আরো কিছু কথা ছুঁড়ে দিয়ে গেলেন, গয়নাগুলোও অমনি পরে এস বৌ। একেবারে ন্যাড়া হাতে থাকা ঠিক নয়।

সব চুকে যেতে খুব ভালই লাগল লীলার। একটানা পথ চলার পরে পান্থনিবাসের আশ্রয়। নিশ্চিন্ত আরামের আমেজ।

দক্ষিণদিকের জানলাটা লীলার খুব প্রিয়। আবছা অন্ধকার। অনেক দূরের মন্দিরের অস্পষ্ট কাঠামো আকাশের বুকে। সান্ধ্য-আরতির ঘণ্টার আওয়াজ। গরাদে মাথা রেখে চুপ করে বসে রইল।

দরজার পর্দা সরিয়ে শেখরনাথ কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন খেয়াল নেই। খেয়াল হল তার কাঁধের ওপর আলতো হাতটা রাখতে।

কে? লীলা একটু চমকে উঠল।

ভয় পেযো না, বাইরের কেউ নয়। শেখরনাথ হাসলেন, তারপর লীলার একটা হাত তুলে নিয়ে বললেন, ঘর অন্ধকার। বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে যায় নি এখনও?

জ্বালাতে এসেছিল, আমিই বারণ করেছি।

কেন? আলো ভাল লাগে না তোমার? লীলার নরম হাতটা শেখরনাথ এবারে নিজের দুটো হাতের মধ্যে চেপে ধরলেন।

এ কদিন এত আলোর পরে অন্ধকারই ভাল লাগছে।

সত্যি এ কদিন খুব ক্লান্তি গেছে, না লীলা?

এ কথার কোন উত্তর দিল না লীলা। আঙুল তুলে জানলার দিকে দেখিয়ে বলল, আচ্ছা, ওটা কিসের মন্দির গো?

পশুপতিনাথের। আমার ঠাকুরদা ওই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

একদিন যাবে ওখানে? আরতি দেখব। লীলা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

বেশ তো, নায়েবকে খবর পাঠালেই হবে। তুমি কবে যেতে চাও বল।

নায়েবকে খবর! বিড়বিড় করে লীলা উচ্চারণ করল। তার মানে একগাদা মানুষ যাবে সঙ্গে, পথের দুধারে গাঁয়ের কিছু লোকও জমা হবে, পাইকের দল পাশে পাশে চলবে। লীলাকে হয়তো পালকিতে গিয়েই উঠতে হবে। মল্লিক-বাড়ির বৌ তো হেঁটে যেতে পারে না গাঁয়ের মধ্য দিয়ে! কিন্তু চুপিচুপি যাওয়া যায় না? শুধু সে আর শেখরনাথ? একদিন সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে লুকিয়ে হাত ধরাধরি করে? শান বাঁধান প্রশস্ত চাতালে পাশাপাশি

বসা যায় না? গাঁয়ের ছোটবাবু আর তাঁর বধূ নয়, নেহাত পথচলতি দুজন। শাঁখ ঘণ্টার আওয়াজ শুনে মন্দিরে এসে উঠেছে।

না, তা আর হয় না। বুক কাঁপিয়ে নিশ্বাস ফেলল লীলা।

বাবার জন্যে মন কেমন করছে বুঝি? শেখরনাথ লীলার আলগোছে জড়ান এলো খোঁপার ওপর হাত রাখলেন।

উহুঁ, লীলা ঘাড় নাড়ল। এইতো কিছুদিন আগে বাবা এসেছিলেন। তাঁর জন্যে মন কেমন করছে না।

বুকের মধ্যে একটা ব্যথা মোচড় দিযে উঠছে। এ কারুর জন্যে মন কেমন করা নয়। এত আলো, এত সম্পদ, এই আভিজাত্য এ যেন স্বপ্নের অতীত। ওর কেবলই ভয় হচ্ছে এসব বুঝি দুদিনের ইন্দ্রজাল। একদিন হঠাৎ চোখ খুলে দেখবে কোথাও কিছু নেই। ধূ ধূ প্রান্তর। সব কিছু হাওয়ায় মিশিয়ে যাবে। অনাগত দিনের সেই দুঃস্বপ্নের কথা ভেবেই বুঝি চমকে ওঠে লীলা।

না, বাতিটা জ্বালিয়ে দিতে বলি এবার, শেখরনাথ উঠে পড়লেন।

এবার আর আপত্তি করল না লীলা। অন্ধকারে ভয় করছে ওর।

বাতি জ্বালান হল। ঝাড়ের বাতির আলো দেয়ালে টাঙান আয়নার সারের ওপর গিয়ে পড়ল। মসৃণ দামী আসবাবগুলো ঝকঝক করে উঠল। দূরের পশুপতিনাথের মন্দিরটা আর দেখা গেল না। আরতির শাঁখ ঘণ্টার আওয়াজও থেমে গেছে।

কেমন সাজান হয়েছে তোমার ঘরটা বল? কথার সঙ্গে শেখরনাথ চোখ ঘুরিয়ে দেখলেন সারাটা ঘর। লীলার বসবার ঘর। অবসর বিনোদনের জন্যে।

ভালই তো, খুব অস্ফুট গলায় লীলা উত্তর দিল, বেশ ভাল। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারল না, হরিণ আর চিতাবাঘের চামড়াগুলো কি দরকার এ ঘরে টাঙাবার? বিশেষ করে ওই কোণের দিকে দাঁড় করান মাঝারি আকারের গুলবাঘটা! জ্বলজ্বল করছে সবুজ কাঁচ বসান চোখ দুটো। কি বিরাট হাঁ। লকলক করছে জিভের ফালি। ঝকঝকে দাঁতের সার। সর্বগ্রাসী মুখব্যাদান। ঘরের শান্ত আবহাওয়াকে আবিল করে তোলে। কিন্তু এ ঘর থেকে ওগুলো সরাবার কথা কি বলা যায়। শেখরনাথের নিজের হাতে শিকার করা সব। বলতে গেলে ওঁর হাতের জিনিস বুঝি বা বীর্যের প্রতীক। ইচ্ছা করেই তো লীলার সামনে ধরে রাখা হয়েছে ওগুলো।

একটা কথা বলব ? খুব নিস্তেজ গলার স্বর লীলার।

কি, বল ? শেখরনাথ একটু বিচলিত হলেন। এত দীনতা কেন লীলার কণ্ঠে ? ইঙ্গিত মাত্রেই প্রয়োজনের জিনিস যার সামনে আসার কথা, তার এ কাকুতির অর্থ হয় কোন ?

বল, চুপ করে রইলে যে ? শেখরনাথ আবার বললেন।

দু-একবার ঢোঁক গিলে গলাটা পরিষ্কার করে নিল লীলা তারপর আস্তে আস্তে বলল, বেহালা বাজাবে একটু ? পূরবী ?

এই কথা ! শেখরনাথ দাঁড়িয়ে উঠলেন, বেহালার বাক্সটা বোধ হয় বাইরের বৈঠকখানাতেই পড়ে আছে। এই গোলমালে আর আনা হয়নি। চাকরদের কাউকে বলি ভিতরে নিয়ে আসতে। এই ঘরে।

শেখরনাথ উঠে দাঁড়াতেই দরজায় টোকা পড়ল।

কে ?

ছোটবাবু, আপনাকে নায়েব মশাই একবার ডাকছেন, অন্দরের পরিচারিকা নিস্তারিণীর গলা।

লুটিয়ে পড়া দামী চাদরটা শেখরনাথ গায়ে জড়িয়ে নিলেন।

শুনে আসি, আবার কেন খোঁজ পড়ল, শেখরনাথ বেরিয়ে গেলেন।

জানলার গরাদে মাথা রেখে লীলা চুপ করে বসে রইল।

শেখরনাথ ফিরলেন প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে। একটা বই পড়তে পড়তে লীলা চেয়ারের হাতলেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বইটা আধখোলা অবস্থায় কোলের ওপর। শাড়ির আঁচল মোজেইক মেঝেয় লুটাচ্ছে।

পা টিপে টিপে এসেছিলেন শেখরনাথ। দামী পর্দা দুহাতে সরিয়ে ভিতরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেলেন। বাড়ির লোক অন্ধ নাক ? দেখতে পায় না কি-ভাবে চেয়ারে কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে একটা মানুষ ? ডেকে শোয়াবার বন্দোবস্ত করতে পারে না ?

সজোরে জুতা ঠুকে শেখরনাথ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, নিস্তার !

গলার আওয়াজে লীলা ধড়মড় করে উঠে বসল। বইটা কোল থেকে মেঝেয় পড়ল ছিটকে। কি হল ?

এগিয়ে এসে শেখরনাথ বইটা তুলে নিলেন, বাড়ির সব গেল কোথায়? তুমি এভাবে চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছ দেখতে পায়নি কেউ?

শেখরনাথের গম্ভীর গলার আওয়াজে লীলা দাঁড়িয়ে উঠল। এখনি হয়তো হাঁকডাক করে ঝি চাকর ডেকে বাড়ি একেবারে মাথায় করে তুলবেন। কড়া কথা শোনাবেন সবাইকে। ভারি লজ্জা করে লীলার। ছি, ছি, নতুন বৌকে নিয়ে একি কেলেঙ্কারি?

না, না, আর ঘুমোব না আমি। তোমার সঙ্গে গল্প করতে ভারি ইচ্ছা করছে। শেখরনাথের দিকে লীলা আরও একটু এগিয়ে গেল।

গল্প? শোন তাহলে মজার ব্যাপার। শেখরনাথ এ পাশের চেয়ারটা টেনে নিয়ে লীলার সামনাসামনি বসলেন, ছোটলোকের আস্পর্ধার শেষ নেই।

ছোটলোকের আস্পর্ধা! ঘুম-জড়ান চোখ দুটো লীলা বড় করে ফেলল। কে আবার কি করল! থমথমে মুখের ভাব শেখরনাথের।

নায়েবের কাছে লোক এসেছে গড়বিষ্টুপুর থেকে। শেখরনাথ চেয়ারে জুত হয়ে বসলেন, পায়ের ওপর পা তুলে। নাগরার জরির বুটিগুলো আলোয় চকচক করে উঠল, ওখানকার প্রজারা নাকি খাজনা মকুব চায়। গত বছর বৃষ্টি হয়নি এক ফোঁটা। ধানের একটি কণাও কেউ বুঝি ঘরে তুলতে পারেনি। রোদের তেজে সব শুকনো খড় হয়ে গিয়েছিল। অজন্মা তার সঙ্গে মহামারী। অর্ধেক গাঁ উজাড়। আরে, তার আমি করব কী? সব গিয়ে তো ওই তিনটি মৌজায় এসে ঠেকেছে। খাজনা মকুব করলে আমার চলবে কিসে?

কোন উত্তর দিল না লীলা, অবশ্য ওর উত্তরও কেউ প্রত্যাশা করেনি। জমিদারির কথায় বাড়ির বৌ মাথা গলাবে মল্লিকবংশের এ রেওয়াজ নয়। তা লীলা এ কদিনেই বেশ বুঝতে পেরেছে। তবু হঠাৎ কেমন করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কথাটা, আহা, ভারি তো কষ্ট বেচারীদের। ধান প্রাণ দুই-ই গেল। তোমার কাছে দুঃখ জানাবে না তো কার কাছে জানাবে?

দু এক মিনিট। তারপরই শেখরনাথ হেসে উঠলেন। দরাজ গলার অট্টহাসি। লীলার মনে হল যে হাসির গমকে ঝাড়ের বাতির কাচগুলো পর্যন্ত ঠুন-ঠুন করে বেজে উঠল। হাসি থামিয়ে শেখরনাথ চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, দুঃখ তো জানাতে এসেছিস, তোদের ক্ষেতে যেবার ডবল ফসল হয়, সেবার কি জমিদারকে দু-গুণ খাজনা দেবার কথা মনে হয়েছে। যত সব নেমক-

হারামের দল! বিরক্তিতে শেখরনাথ মুখটা কঠিন করে ফেললেন। দুটো হাত মুষ্টিবদ্ধ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কোণের দিকে রাখা গুল-বাঘটার ওপর একটা হাত রেখে দৃঢ় গলায় বললেন, আচ্ছা, খাজনা দিতে পারিস কি না পারিস বোঝাপড়া হবে। সোজা আঙুলে কি কোনদিন ঘি উঠেছে।

লীলা মুখ তুলেই অবাক হয়ে গেল। অবিকল এক। গুলবাঘের চোখ দুটোর মতনই শেখরনাথের চোখ ঝকঝক করে জ্বলে উঠছে। লীলা নিজের চোখ দুটো বুজে ফেলল। চোখ বুজেই বুঝতে পারল শেখরনাথ ওর দিকে এগিয়ে আসছেন। অনুভব করল ওর ভেঙ্গে পড়া চুলের গোছার ওপর হাতের স্পর্শ। কানের কাছে মুখটা এনে শেখরনাথ ফিসফিস করে বললেন, বেহালা শুনতে চেয়েছিলে. বাজাব একটু ?

নিজের অজ্ঞাতেই লীলা শিউরে উঠল। বেহালা ? গুলবাঘের মাথার ওপর রাখা দৃঢ়বদ্ধ হাত দিয়েই শেখরনাথ বেহালার ছড় টানবেন। পূরবীর করুণ মূর্ছনায় গড়বিষ্টুপুরের অসহায় প্রজাদের কাতরোক্তিই ঝংকৃত হবে শুধু। খাজনা মকুবের ব্যর্থ কাকুতি। কিন্তু বেহালা বাজাবার ইচ্ছা হয়েছে শেখর-নাথের, বেহালা তিনি বাজাবেনই।

বেহালা আনতে যাবার মুখেই শেখরনাথ বাধা পেলেন। পর্দার ওপারে পিসির গলা, বৌমা আছ এ ঘরে ?

মাথার কাপড় ঠিক করে লীলা দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আছি পিসিমা, আসুন।

পিসি ঘরে ঢুকলেন। একেবারে পূজোর ঘর ফেরত। পরনে গরদ, কপালে নাকে চন্দনের ফোঁটা। হাতে রেকাবীতে ফল আর মিষ্টি। ঘরে পা দিয়ে শেখরনাথকে দেখেই একটু হকচকিয়ে গেলেন, ওমা, তুই আছিস এ ঘরে ? বোস, তোর জন্যেও নিয়ে আসি।

লীলা এগিয়ে পিসির হাত থেকে থালাটা নিতে গেল, আপনি নিজে কেন কষ্ট করে এ সব আনতে গেলেন, নিস্তারকে দিয়ে ডেকে পাঠালেই হত।

তা আর কি হয়েছে মা, পিসি একগাল হাসলেন। তারপর আড়চোখে শেখরনাথের দিকে একবার চেয়ে পর্দা সরিয়ে বাইরে চলে গেলেন।

॥ তিন ॥

জানলার ধারে বসে বসেই লীলা দেখল। শীতশীর্ণ কদম গাছের পাতাগুলো বৈশাখের খরদাহে এক সময়ে লালচে হয়ে উঠল। তারপর বর্ষার অজস্র ধারায় স্নান করে কোমল মসৃণ হল শাখা-প্রশাখা। পাতার সমারোহে আর ফুলের অজস্রতায় যৌবনের রূপ। হেমন্তের পাতা চুঁয়ে পড়া শিশিরের বিন্দু শুকোবার সঙ্গে সঙ্গেই পাতা ঝরার ইতিহাস শুরু হল। পুরো একটি বছর ঘুরে গেল।

শুধু বাইরের রূপই বদলাল না, ভিতরেরও হল রূপান্তর। গড়বিষ্টুপুর আর চণ্ডীডাঙ্গার পাট্টা হাত বদল করল। বাকী রইল ভরতপুর। টলমলে অবস্থা। কলসীর জল, সমুদ্রের তো আর নয়। গড়াতে গড়াতে কতদিন থাকে! অথচ বাইরের ঠাট একটুও কমাতে রাজী নন শেখরনাথ। দু-একবার সাহস করে লীলা কথাটা পেড়েওছিল, কিন্তু সশব্দে তিনি হেসে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, পাগল, তা কখনও হয়! তোমার কিছু অসুবিধে হচ্ছে, বল?

অসুবিধে, লীলা থতমত খেয়েছিল, না, না, আমি খুব ভাল আছি।

সত্যিই লীলার কিছুরই অভাব হয়নি। মুখের কথা খসাবার আগেই জিনিস সামনে এসে হাজির হয়েছে। মুখ ফুটে আর বলতে হয়নি।

কিন্তু তবু অবুঝ তো নয় লীলা। চালচলনে, নায়েব মশাইয়ের ঘন ঘন আসা যাওয়ায়, চাকরবাকরদের ফিসফিসানিতে অল্পে অল্পে ভেঙ্গে পড়ার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে বাপের বাড়ি একবার ঘুরে এসেছে লীলা, কিন্তু বেশীদিন থাকতে পারেনি। শেখরনাথকে ছেড়ে থাকতে ভাল লাগেনি। আর একদিন গিয়েছিল পশুপতিনাথের মন্দিরে। শেখরনাথের সঙ্গে একলা পায়ে হেঁটে নয়, পিসিমার সঙ্গে পালকিতে চড়ে। পাশে পাশে জন দুই বরকন্দাজ ছেঁড়া মখমলের কোট পরে আর মেজে ঘষে চকচকে করে তোলা মান্ধাতার আমলের বর্শা নিয়ে। মন্দিরের সামনের ভিড় সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ধারে-কাছে কাউকে আসতে দেওয়া হয়নি! এও ভাল লাগেনি লীলার। ঠাকুরের কাছেও এমনি আলাদা ভাব। মান বাঁচিয়ে, সম্ভ্রম বাঁচিয়ে চলাফেরা।

সকাল থেকে অঝোর ধারায় বর্ষা নেমেছে। মল্লিক-বাড়ির ফটকের ওপাশে মাঠ ঘাট ডুবে গেছে জলে। ঝড়ের ঝাপটায় পাকুড় আর কদমের ডাল নুয়ে নুয়ে পড়ছে। বন্ধ কাচের শারসিতে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা। কুণ্ডলী পাকান কাল মেঘ সারা আকাশে হামাগুড়ি টেনে বেড়াচ্ছে। ঝড়ের শব্দে কান পাতা যায় না। ঘরের কোণে মেহগ্নি খাটের ওপর পা মুড়ে বসে শেখরনাথ বেহালার ছড় টানছেন। করুণ মূর্ছনা। সমস্ত ধরিত্রী যেন কেঁদে কেঁদে উঠছে। বিরহীর অনুক্ত বেদনার মতো। একেবারে কাছে বসে লীলা তন্ময় হয়ে শুনছিল। ভারি মিষ্টি হাত শেখরনাথের। কয়েকটি কাঠের টুকরো আর জট পাকানো তারের গোছা, কিন্তু শেখরনাথের হাতের ছোঁয়ায় নতুন রূপ নেয়, নতুন সুর পায়।

আচমকা পর্দার ওপারে জনার্দন নায়েবের কাশির শব্দ শোনা গেল। বৃষ্টির আওয়াজ আর বেহালার সুর ছাপিয়ে বেশ জোরাল কাশি। প্রথমে শেখরনাথের কানে গেল। মাঝপথে বেহালার ছড় থেমে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লীলা তার হাত চেপে ধরল, নাগো, থামিও না। বড় সুন্দর লাগছে ইমনের সুর।

কিন্তু নায়েব যেন বাইরে ডাকছে মনে হল।

লীলার হাত শ্লথ হয়ে গেল। কোলের ওপর হাত দুটো রেখে দেয়ালের দিকে আরো পিছিয়ে বসল। এমন একটা সময়ে এমন পরিবেশে দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটির কথা ভাল লাগে মানুষের! ভাল লাগে চুল চেরা হিসেব করতে কার ক-বছরের খাজনা জমিদারের তহবিলে জমা পড়েনি! আল ভেঙে কে লুব্ধ হাত বাড়াল পাশের ধান-জমির দিকে!

বেহালাটা সাবধানে কাত করে রেখে শেখরনাথ উঠে পড়লেন। যাওয়ার মুখে লীলার দিকে ফিরে হাসলেন, এক মিনিট, এখনি আসছি।

এক মিনিট অবশ্য নয়। শেখরনাথ ফিরলেন মিনিট কুড়ি পরে। আকাশের মতনই থমথমে মুখের ভাব। হাতে চিরকুট।

কাছে এসে দাঁড়াতেই লীলা মুখ তুলল, কার চিঠি গো?

তোমার বাবার, শেখরনাথ চিরকুটটা এগিয়ে দিলেন।

বাবার জবানী, কিন্তু বাবার হাতের লেখা নয়। পড়তে পড়তে লীলার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল। চোখের কূল ছাপিয়ে জলের ধারা। ভেজা গলায় বলল, বাবার অসুখ? আমি যাব দেখতে। এখনি যাব।

চিরকুটটা দিয়েই শেখরনাথ জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। লীলার কথার উত্তরে গম্ভীর গলায় শুধু বললেন, পাগল! এই দুর্যোগে!

এ আর এমন কী দুর্যোগ? লীলা উঠে শেখরনাথের পাশে এসে দাঁড়াল।

বর্ষার মাতঙ্গী সমুদ্রের চেয়েও ভয়ানক। বজরায় তিন দিনের পথ।

তা হোক, আকাশের এর চেয়ে খারাপ অবস্থায় আমি উঠেছি বজরায়।

কিন্তু দেহের এমন অবস্থায় কোনদিন ওঠনি।

জানলা দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসছে, তাই শেখরনাথ দু-পা পিছিয়ে দাঁড়ালেন। গরাদ চেপে লীলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। দেহের এমন অবস্থা! তাই তো। অলক্ষ্যে তারই রক্তমাংস নিংড়ে আর একটি সত্তা যে তিলে তিলে বেড়ে চলেছে, তার কথা একবারও মনে হয়নি! মল্লিক-বংশের অনাগত সন্তান। শেখরনাথের পৌরুষ আর লীলার লাবণ্যের স্পর্শমাখা।

হয়তো তেমন কিছু অসুস্থ নন, নইলে তোমাকে নিশ্চয় যেতে লিখতেন, শেখরনাথ লীলার কাঁধে হাত ছোঁয়ালেন, আমি দেখে আসি। তেমন বুঝি তো লোক পাঠিয়ে তোমায় নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করব।

শেখরনাথ আর দাঁড়ালেন না। একটু জোর পায়েই বাইরে চলে গেলেন।

সারা সপ্তাহ কেটে গেল। সোম থেকে শনি। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে লীলা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সন্ধ্যার দিকে শরীর বেশ খারাপ হয়ে উঠল। প্রতি গ্রন্থিতে অসহ্য ব্যথা। দাঁতে দাঁত চেপে এক সময়ে লীলা পালঙ্কের ওপরে লুটিয়ে পড়ল। সতী প্রস্তুতই ছিল। নিস্তারকে দিয়ে দাইমাকে খবর পাঠাল।

লীলার যখন জ্ঞান হল তখন রাত অনেক। একেবারে কোণের দিকে পিতলের পিলসুজে প্রদীপের ম্লান আলো। ভিতর-মহলে শেষের ঘরটায় তাকে রাখা হয়েছে। অনেক আগে যখন মল্লিক-বাড়ির জুড়ি-গাড়ি ছিল সেই সময়ে এ ঘরটায় ওয়েলার ঘোড়াদের দানাপানি আর ঘাসের গাঁট রাখা হত। এখন ঘোড়ার বালাই নেই, কাজেই ঘর খালি। আঁতুড় ঘরে পরিণত হয়েছে লীলার ভাগ্যে।

পাশ ফিরতেই সতীর সঙ্গে চোখাচোখি হল।

নবজাতাকে কোলে নিয়ে বসে আছে। চোখে চোখ মিলতেই হাসল, মেয়ে তো নয় সোনার তাল। যেমনি রংয়ের জেল্লা তেমনি মুখের গড়ন। বৌরানী, এ মেয়ে কিন্তু আমার। আমি মানুষ করব একে।

লীলাও হাসল, তারপর ফিসফিস করে বলল, একটু দাও না দিদি আমার কাছে।

মেয়েকে কাছে নিয়েই মনে পড়ে গেল মেয়ের বাপের কথা। মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতেও লজ্জা করে, কিন্তু সাতটা পুরো দিন কেটে গেল এখনও ফিরল না কেন মানুষটা। কিছুক্ষণ উসখুস করে কথাটা লীলা বলেই ফেলল, অনেকদিন হয়ে গেল এতদিনে তো ফিরে আসার কথা।

সতী কোন উত্তর দিল না। উঠে গিয়ে কাঠি দিয়ে সলতেটা বাড়িয়ে দিল একটু, তারপর বলল, আমি আসছি বৌরানী। বাইরে নিস্তার রইল, কিছু দরকার পড়লে ডেকো ওকে।

বেশ বুঝতে পারল লীলা। পাছে উত্তর দিতে হয় এই ভয়ে সতী ছল-ছুতো করে সরে গেল এখান থেকে। কিন্তু কি এমন হতে পারে শেখরনাথের যা ওর কাছে জানান প্রয়োজন মনে করে না বাড়ির লোক? অমঙ্গল আশঙ্কায় লীলার বুকটা কেঁপে উঠল। না, না, সে সব কিছু নয়। তা হলে জানতে পারত বৈ কি। কিন্তু এমনও তো হতে পারে, শেখরনাথ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তা না হলে একবার নিশ্চয় এসে দাঁড়াতেন সামনে। কেন এরা এমন করে লুকোচুরি খেলছে ওর সঙ্গে? স্পষ্ট করে কথাটা বলে ফেললেই তো পারে। দুর্বল শরীরে লীলার ভারি ক্লান্তিবোধ হল। বুকটা বেশ ধড়ফড় করছে। দ্রুত হৃৎস্পন্দনের তালে তালে শরীর ঝিমিয়ে আসছে।

উঃ মা, লীলা ঠোঁট দুটো শক্ত করে চেপে ধরা সত্ত্বেও বেরিয়ে গেল আওয়াজটা।

ডাকলেন বৌরানী? ভেজান দরজা ঠেলে নিস্তার ঘরে এসে ঢুকল।

লীলা একটু ইতস্ততঃ করল তারপর আস্তে আস্তে বলল, বাবু ফেরেন নি নিস্তার?

নিস্তার হাঁটু মুড়ে বসল লীলার কাছাকাছি। হাত বাড়িয়ে বলল, মেয়েকে একটু দিন না বৌরানী।

লীলা হাত আড়াল দিল, না। তোমাকে আমি কী জিজ্ঞাসা করলাম ?

নিস্তার মাথা নিচু করে রইল। পায়ের নখ খুঁটল কিছু সময়। তারপর মুখ তুলে বলল, ছোট বাবু তো দিন তিনেক ফিরেছেন।

দিন তিনেক! অভিমানে লীলার দুটি চোখ জলে ভরে এল। মুখ তুলে নিস্তারের দিকে চাইতে গেলেই ধরা পড়ে যাবে। অবশ্য ধরা পড়বার আর বাকিই বা কী। এমনি অবস্থা বৌয়ের, অথচ কাছে এসে দাঁড়িয়ে খোঁজ নেবারও দরকার মনে করে না মানুষ। হঠাৎ আসল কথাটা মনে পড়ে গেল লীলার, বাবা কেমন আছেন নিস্তার ?

তিনি আর নেই বৌরানী। ছোটবাবু যাবার কিছুক্ষণ পরেই, নিস্তার কথা শেষ না করেই আঁচল দিয়ে দুটো চোখ চেপে ধরল।

বাবা নেই, খুব অস্পষ্টভাবে লীলা কথাগুলো উচ্চারণ করল। শরীরের অবস্থা এখনও কাহিল। সামলে উঠতে পারে নি এখনও। শরীর ভাল থাকলেও চিৎকার করে লীলা কোনদিনই কেঁদে উঠতে পারত না। এ স্বভাবই ওর নয়। ছেলেবেলা থেকে শেষ দেখা পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাগুলো দ্রুত আবর্তিত হল লীলার মনের পর্দায়। মাকে খুব অস্পষ্ট মনে পড়ে, ঘষা কাঁচের ভিতর দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখার মতো আবছা, ধোঁয়াটে। কিন্তু সারা জীবন জুড়ে বাপের দীর্ঘ কাঠামো। প্রসারিত দুটি হাত দিয়ে লীলাকে আঁকড়ে ধরে ছিলেন। দুঃখ-যন্ত্রণা-বেদনার আওতা থেকে সযত্নে সরিয়ে রেখেছিলেন মেয়েকে। কোন দিক থেকে সামান্য একটু আঁচড়ও লাগতে দেন নি তার গায়ে।

বিদায়ের দিনের কথাটাও মনে পড়ল লীলার। অন্দরমহলের চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে লীলার দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, আর হয়তো দেখা হবে না মা।

কেন এমন কথা বলছ বাবা ?

বয়েস হয়ে আসছে মা। বেশ বুঝতে পারছি তৈরি থাকতে হবে। দেহের তো তৈরির বালাই নেই, মনকেই ঠিক করে রাখতে হবে। ডাক আসার বুঝি আর দেরি নেই।

লীলার বুকের মধ্যে একটা তীব্র ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠেছিল। চোখের জলে সব কিছু ঝাপসা। খুব নিচু গলায় বলেছিল, না, না, তুমি থাকবে চিরদিন। কথাটা বলে ফেলেই আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেছিল।

পাগলী, ভবতোষবাবু ম্লান হেসেছিলেন, এ পৃথিবীটাই বুঝি থাকবে চিরদিন! তারপর হাসি থামিয়ে বলেছিলেন, সেই পুরনো বুকের ব্যথাটা আবার চাড়া দিয়ে উঠেছে। যাবার হাতছানি। এবার আর নিস্তার নেই।

সব দিক ভেবে মনকে শক্ত করে নিয়েছিল লীলা। প্রাণান্ত যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে মুক্তি পাওয়াই তো বাঞ্ছনীয়।

পাশাপাশি আর একটা কথা মনে হতেই কিন্তু ভারি কৌতুকবোধ হল লীলার।

এই দুঃসংবাদ দেবার ভয়েই বুঝি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন শেখরনাথ। লীলার মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস খুঁজে পাচ্ছেন না! শেখরনাথকে ভারি ছেলেমানুষ মনে হল। পরিণত বয়সে সমস্ত কর্তব্য শেষ করেই লীলার বাপ চোখ বুজেছেন। শোকের ব্যাপার সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই নিয়ে কান্নাকাটি হৈ-চৈ করতে কেমন বাধো-বাধো লাগল। তবু বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল, ফুঁপিয়ে কাঁদতে গিয়েই লীলা থেমে গেল। কোলের কাছে শোয়া মেয়েটি ককিয়ে কেঁদে উঠল। দুটো হাত মুঠো করে পরিত্রাহি চিৎকার। নিজের উদ্গত অশ্রু লীলা আঁচল চাপা দিল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে লীলা কথা বলল। তখনো পা মুড়ে নিস্তার চুপচাপ বসে আছে। লীলা ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলল, আজ বাবুকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে নিস্তার। ব'লো, বাবা মারা যাবার খবর আমি পেয়েছি।

ওমা, নিস্তার গালে আঙুল ছোঁয়াল, বাবু কি হেথায় আছেন যে আসতে বলব। বাবু ফিরেই তার পরের দিন গেছেন শহরে। পেল্লায় মামলা বেধেছে যে।

মামলা?

হ্যাঁ, বসতবাটি নিয়ে। পাওনাদার ছাড়বে কেন, সুদে আসলে কম টাকা জমেছে! তিন পুরুষের ধার, শোধ করা সোজা কথা!

এত দেনা কেমন করে হল নিস্তার? লীলা খুব শান্ত গলায় বলল। নিস্তারকে নয়, যেন নিজেকেই বলছে কথাগুলো। সত্যি হদিস পায় না লীলা। মাত্রা ছাড়িয়ে এরকমভাবে বাঁচার কি মানে হয় মানুষের। তিন পুরুষ ধরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করে তিলে তিলে

রিক্ততার গরল পান করার একি সর্বনাশা মোহ! মল্লিক-বাড়ির সোনালী দিনগুলো দেখে নি, কিন্তু তবু ঝিমিয়ে আসা ঐশ্বর্য্যের অপরা দেখে কিছুটা ঠাওর করতে পারে বৈকি! বিগত যুগের ঝিকিমিকি আলো এখনো মাঝে মাঝে উঁকি দেয়। সামর্থ্য নেই, কিন্তু মেজাজ রয়েছে। উপায়ের চেয়ে অপব্যয়ের নেশা প্রবল।

উঠি বৌরানী, আপনার খাবার যোগাড় দেখিগে। নিস্তার আঁচল গুছিয়ে উঠে পড়ল।

শেখরনাথ ফিরলেন দিন দশেক পরে। দুপুর বেলা মেয়েকে কোলের কাছে নিয়ে লীলা চুপচাপ শুয়ে ছিল। আবোল-তাবোল চিন্তা। ভাবনার জট ছাড়ানই দায়। হঠাৎ বৈঠকখানায় শেখরনাথের গলার আওয়াজ শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল। মনে হল কতদিন যেন শোনে নি এ গলা, কত যুগ।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হতেই কাপড় ঠিক করে লীলা জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। কিছুতেই কথা বলবে না, কাছে এসে দাঁড়ালেও নয়। মানুষকে এমন একটা অবস্থার মধ্যে ফেলে যে লোক দূরে সরে দাঁড়াতে পারে তার ওপর আবার দরদ কিসের! কিসের অনুরাগ!

খুট করে কড়ার শব্দ হওয়া পর্যন্ত লীলা জোর করে মুখ ফিরিয়ে রইল, কিন্তু দরজায় আওয়াজ হতেই ঘুরে দাঁড়াল। ঘুরে দাঁড়িয়েই অবাক হয়ে গেল। একি চেহারা হয়েছে শেখরনাথের! সারা মুখে তামাটে আভা, উস্কোখুস্কো চুল, চোয়ালের দুটো হাড় বেশ ঠেলে উঠেছে। কাঁধের চাদরটা খাটের পাশে রেখে শেখরনাথ সামনের চেয়ারে ছেড়ে দিলেন নিজেকে।

কি গো, শরীর খারাপ নাকি? লীলা গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

না, বড় ঘোরাঘুরি গেছে ক-দিন, শেখরনাথ হাত দিয়ে নিজের চুলের রাশ মুঠো করে ধরলেন। মুখ ফিরিয়ে বললেন, তারপর তোমার খবর কী?

লীলা উত্তর দেবার আগেই শেখরনাথের মনে পড়ে গেল। আসল খবরের খোঁজ নেওয়াই তো বাকি! সেতু রচিত হয়েছে দুজনের মাঝখানে, তাদের রক্ত মাংসে গড়া আর মমতা-ছোঁয়ান নতুন সত্তা।

শেখরনাথ উঠে খাটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। একদৃষ্টে দেখলেন ঘুমন্ত মেয়ের দিকে, তারপর দুহাতে সন্তর্পণে কাদার তাল কোলে তুলে নিলেন।

দেখেছ, অবিকল তোমার মতন। ঠিক যেন ছোট তুমি।

আহা হা, লীলা চোখ ঘুরিয়ে উত্তর দিল, অত ছোট যেন দেখেছ আমায় তুমি।

দেখি নি, বুঝি! লীলার কথার উত্তর দিলেন বটে শেখরনাথ, কিন্তু মেয়ের দিক থেকে চোখ ফেরালেন না।

লীলা আরো সরে এসে দাঁড়াল, কপালটা কিন্তু ঠিক তোমার মতন। লক্ষ্য করেছ?

এক নিমেষে শেখরনাথের মুখের সমস্ত রক্ত বুঝি শুষে নিল কেউ। ছাইয়ের মতন বিবর্ণ দুটি গাল। দুটো চোখ কুঁচকে ছোট হয়ে এল।

না, না, শেখরনাথ সজোরে মাথা নাড়লেন, আমার মতন কপাল হয়ে দরকার নেই কারুর। এমন কপাল শত্রুরও যেন না হয়।

দু-এক মিনিট পরিপূর্ণ স্তব্ধতা। কিছু একটা বলা দরকার, কিন্তু কি যে বলবে লীলা ভেবে ঠিক করে উঠতে পারল না। একি কথা বলছেন শেখরনাথ। মেয়ের কপালের গড়ন বাপের মতন হয়েছে বলেই ভাগ্যও যে তাঁর মতন হবে এ কেমন কথা। আর খারাপই বা কি ভাগ্য। নদীতে তো জোয়ার আছে, ভাঁটা আছে। সব সময় মানুষের অবস্থা কি সমান থাকে কখনও!

লীলা কিছু বলবার আগেই শেখরনাথ পকেট থেকে ব্যাগ বের করলেন। একশ টাকার নোট টেনে নিয়ে হাসলেন লীলার দিকে চেয়ে, কিগো, মার হাতে দেব, না মেয়ের হাতে?

মেয়ের হাতেই দাও না। লীলাও মুচকি হাসল।

সাবধানে মেয়ের হাতটা ধরে নোটটা গুঁজে দিতে গিয়েই শেখরনাথ থেমে গেলেন, এ বংশে কাগজের টুকরো দিয়ে সন্তানের মুখ দেখা এই প্রথম।

লীলা চুপচাপ জানলার ধারে এগিয়ে গেল। হাত দিয়ে আস্তে খুলে দিল জানলার পাল্লা।

কত বদলে যাচ্ছে পৃথিবী। পশুপতিনাথের মন্দিরটা কুঁকড়ে যেন ছোট হয়ে গিয়েছে। ঠিক তার পিছনে বিরাট কারখানার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। কালো দুটো চিমনি আকাশের দিকে হাত উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। চকচকে নতুন টিনের দিকে চোখ তুলে চাওয়াই দায়। কারখানার পটভূমিতে সারা ভরতপুর গ্রামটাই ছোট হয়ে এসেছে। গাছপালা মানুষজন সবাই।

বেশ মনে আছে লীলার, শহর থেকে মোটরে ঘুরপথে একদল মানুষ মল্লিক-বাড়ির ফটকের সামনে এসে নামল একদিন। অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা-চালাল শেখরনাথের সঙ্গে। তারপর ফিতে নিয়ে মাপজোপ শুরু হল। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখেছিল লীলা। সেদিনও রোদে ফিতেগুলো এমনি চকচক করে উঠেছিল, বেশীক্ষণ চেয়ে থাকা যায় নি। তারপর ইট কাঠ চুণ শুরকির হোলিখেলা, সবুজ মাটি ঢাকা পড়ে গেল সে স্তূপের আড়ালে। শেখরনাথের হাতের করকরে ওই একশ টাকার নোটটা হয়তো তাদেরই দেওয়া। সোনার বদলে কাগজ! ভরতপুরের সবুজমাটী সোনা ছাড়া আর কি!

কি দেখছ? শেখরনাথ পাশে এসে দাঁড়ালেন।

কিসের কারখানা হবে গো ওটা? লীলা আঙুল দিয়ে দেখাল।

দি ভরতপুর ইঞ্জিনিয়ারীং সিণ্ডিকেট। সারা ভরতপুর হয়তো ওদেরই হবে একদিন।

সারা ভরতপুর?

হুঁ, শেখরনাথ আলগা হাসলেন। ঠোঁটের দুটো কোণ সামান্য একটু কোঁচকাল। হাসি ঠিক নয়, দুখের মিশেল রয়েছে তাতে। দেখে অন্ততঃ লীলার তাই মনে হল।

আমাদের বসতবাটির অর্ধেকটাও চলে গেল ওদের হাতে, কতকটা সেই রকম লেখাপড়াই শহরে গিয়ে করে এলাম। বিপদ ঘনিয়ে এলে অর্ধেক ত্যাগ করাই তো বিজ্ঞের কাজ, কী বল? শেখরনাথ আর একবার হাসবার চেষ্টা করলেন, শুকনো হাসি, নিষ্প্রাণ।

অনেক আগের কথা, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা লীলার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠল। একেবারে কোণের দিকে কাঠের আলমারি ছিল একটা। বাসনকোসন রাখা হত, ছেঁড়া জামাকাপড়ও। লীলার ঠাকুরমার আমলের। হঠাৎ একদিন মড়মড় করে আলমারির দুটো পাল্লা ভেঙে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। একেবারে আচমকা। পরে নজরে পড়ল ঘুণে কুরে কুরে ঝরঝরে করে দিয়েছিল পাল্লা দুটো। বাইরে থেকে কিছু বোঝবার উপায় ছিল না, দিব্যি শক্ত মজবুত। ঠিক তেমনিই বুঝি হবে একদিন। আচমকা খসে পড়বে এ বাড়ির খিলেন আর ভারী কার্নিশ, তারপর আস্তে আস্তে ঝরে

পড়বে জরাজীর্ণ চুণের প্রলেপ মাখান ইটের পাঁজরা, নাটমন্দির, পুজোর দালান, অন্দরমহল, সব ধসে ধসে পড়বে আস্তে আস্তে। প্রাচীর চুরমার হয়ে প্রান্তরে পরিণত হবে। আবরু রাখতে শুধু বুঝি ঘোমটাই টেনে দিতে হবে সেদিন, তেলচিটে ময়লা শতছিন্ন কাপড়ের ঘোমটা!

নিজেকে সামলে লীলা কথাটা পালটে নিল। শেখরনাথের একটা হাত নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলল, বাবার সঙ্গে দেখাও হয় নি তোমার, না গো? তুমি যাবার আগেই, লীলার গলার আওয়াজ ধরে এল। চোখ দুটিও জলে চকচক করে উঠল।

শেখরনাথ মুখ তুলে একবার লীলার দিকে চাইলেন, তারপর ধীর গলায় বললেন, আমি যাবার পরেও ঘণ্টাদুয়েক বেঁচে ছিলেন, কিন্তু কথাবার্তা কিছু বলতে পারেন নি।

আঁচলটা চেপে লীলা জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বলল, এবার একবার যাওয়া দরকার। জমিজমাগুলোর একটা বন্দোবস্ত করতে হবে।

তার দরকার হবে না, শেখরনাথ লীলার পাশ থেকে সরে এলেন।

দরকার হবে না? কেন?

তোমার বাবা সমস্ত জমি কুলিকামিনদের মধ্যেই ভাগ করে দিয়েছেন। পাকা দলিল। ওলোট-পালোট হবার উপায় নেই।

লীলা ঘুরে দাঁড়াল। শেখরনাথের দুটো চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি। নিচের ঠোঁটটা সজোরে চেপে ধরেছেন। হয় তো ভয়, পাছে কঠিন কথা বেরিয়ে পড়ে।

জমি ভাগ করে দিয়েছেন কুলিদের মধ্যে! অবশ্য এরকম যে করবেন সেটা অনেক আগেই লীলা জানত। এ নিয়ে বাপ আর মেয়েতে কথাও হয়েছে অনেকবার। লীলার একটা সুরাহা হলে আর তো কেউ রইল না। যারা ঘাম আর রক্ত দিয়ে সোনা ফলাবার চেষ্টা করছে মাটিতে, মাটি তো তাদেরই। এ তাদের অধিকার, এ থেকে বঞ্চিত করা অন্যায়, পাপ। লীলাও মেনে নিয়েছিল এ যুক্তি। কিন্তু ভেঙ্গে পড়া জমিদারীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে এরকম একটা ইচ্ছাও হয় বৈকি। অতটা জমি, ফলন্ত গাছের সার, এমনি সময়ে হাতে এলে অনেকটা সাশ্রয় হত। শেখরনাথের দুটি চোখের দীপ্তিতে সেই ইচ্ছাই রূপ নিয়েছিল, এ

বুঝতে লীলার একটুও অসুবিধা হল না। জমির দুর্বার মোহে সেদিনের লীলা হয়ত টলত না, কিন্তু আজ মনে হল অতটা জমি যদি ভরতপুরের আওতায় এসে পড়ত তবে হয়ত আজকের এ সর্বনাশের কিছুটা ঠেকান যেত। সামান্য কিছুটা। আরো কয়েকটা বছর পিছিয়ে যেত এ ভাঙন। চোখের জল নয়, লীলা বুকের নিশ্বাস চাপল অনেক কষ্টে।

মাসখানেক পরে।

সন্ধ্যার ঝোঁকে লীলা ছাদে পায়চারি করছিল। শেখরনাথ আবার শহরে গেছেন। বাড়ির দলিল বোধ হয় পাকাপাকি ভাবেই হাত বদল করবে। অন্তত আধাআধি ভাবে তো বটেই। সিণ্ডিকেটের দত্তসাহেব এর মধ্যেই একবার এসে নজর বুলিয়ে গেছেন বাইরের দিকে। চণ্ডীমণ্ডপ আর নাটমন্দিরের ভোল বদলে অফিস রুমে পরিণত করতে কি পরিমাণ মাল মশলা দরকার তারই একটা হিসেব নিকেশ করতেই হয়তো। শেখরনাথের মুখে কালবোশেখীর মেঘ-থমথম আকাশের ছায়া। ভরতপুরের জমিদারীর শেষ মালিক। ফুঁ দিয়ে প্রদীপের আলো নিভিয়ে দেওয়ার মতন এমনি করে সাত পুরুষের গড়া ঐশ্বর্য ভেঙে পড়বে, এটা বিশ্বাস করতেই কষ্ট হয়। কত রাতে ঘুম ভেঙে চমকে বিছানার ওপর উঠে বসে লীলা শুনেছে শেখরনাথের অস্ফুট কাতরোক্তি। জমিদারীই শুধু নয়, একটা একটা করে যেন ওঁর পাঁজরও ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

কি হয়েছে গো? দু-এক রাতে লীলা জিজ্ঞাসাও করে ফেলেছে।

না, কিছু না। শেখরনাথ পাশ ফিরে শুয়ে পড়েছিলেন।

পায়চারি থামিয়ে আল্‌সের ওপর ভর দিয়ে লীলা একদৃষ্টে অস্ত যাওয়া সূর্যের দিকে চেয়ে ছিল। জমাট রক্তের রং-ছড়ান মেঘের স্তূপ, গাছে পাতায় রংয়ের ছিটে, নিভে যাওয়ার কী সমারোহ!

পিছনে পায়ের আওয়াজ পেয়ে লীলা মুখ ফেরাল। সতী এসে কাছে দাঁড়িয়েছে।

কি করছ একলাটি?

কিছু না, এমনি দাঁড়িয়ে আছি।

আমরা না হয় মুখু-সুখ্যু মানুষ, বোঝার শক্তি কম, কিন্তু তুমি কেন এ কাজ

করলে ভাই? বরফের মত ঠাণ্ডা আওয়াজ গলার। লীলার সারা গা শিরশির করে উঠল।

কী করেছি দিদি? লীলা ফিরে দাঁড়াল।

ঠাকুরপোকে আবার কেন শহরে যেতে দিলে? আবছা অন্ধকারে মানুষের কাঠামোটা শুধু চোখে ঠেকে। অস্পষ্ট একটা ছায়া। তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। সব মিলিয়ে একটা অশরীরী ইশারা।

কদিন থেকে উকিলের বাড়ি যাব যাব বলছিলেন, কি সব মকদ্দমার ব্যাপারে।

মামলা মকদ্দমা বেধেছে তো আজ নয় বৌরানী, তোমার আমার বয়েসের চেয়ে এ মামলা পুরোনো, কিন্তু শহরে যাবার এত ঘটা তো ছিল না কোনদিন।

লীলা আরো কাছে সরে এল। এ মানুষটাকে কেমন ভয় ভয় করে তার। নির্লিপ্ত আর নিরাসক্তিতে জড়ানো অদ্ভুত জীবনযাত্রা, কিন্তু তীক্ষ্ণ দুটি দৃষ্টি দিয়ে সব যেন দেখতে পায়। বর্তমানকে পার হয়ে অন্ধকার ভবিষ্যতও।

শহরে গেলে কী হয়েছে? লীলার গলার আওয়াজে কাতরতার প্রলেপ।

শহরে রুনি বাইজীরা আছে। খুব আস্তে উচ্চারিত হল কথাগুলো। অল্প বাতাস লাগা নারকেল গাছের পাতার মতন মৃদু কম্পনের আভাস।

রুনি বাইজীরা। লীলা দম নিল।

হ্যাঁ, আমার সর্বনাশ করেছে, এবার তোমার করবে।

সূর্য নেমে গেছে কারখানার পিছনে। আকাশে ম্লান রক্তাভা। অন্ধকার জমাট হয়ে আসছে ক্রমশ। কিন্তু অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করছে দুটি চোখ। কটাক্ষ নেই, অদ্ভুত সে দৃষ্টি। লীলা সে দৃষ্টির সামনে কেঁপে উঠল। কথা নয় যেন দৈববাণী। অনাগত দিনের অমঙ্গলের ছায়াপাত। ভাঙন-ধরা মহলের নিষ্পেষিত সত্তাই বুঝি মুখর হয়ে উঠেছে। লীলা ছাদের ওপর বসে পড়ল।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না দিদি।

আগে থেকে কিছু বোঝাও যায় না বৌরানী। যখন বুঝতে পারি তখন আর করবার কিছু থাকে না। ঢেউয়ের ধাক্কায় পাড় ধসে পড়ে জলে। তার চিহ্নও থাকে না। সতী লীলার পাশে পা মুড়ে বসল।

লীলা আর সামলাতে পারল না নিজেকে। সতীর দুটো হাত চেপে ধরল।

আবেগ-তরল কণ্ঠে বলল, তুমি সব খুলে বল দিদি। হেঁয়ালি আমি বুঝতে পারছি না। আমি একটুও ভয় পাব না, সর্বনাশের চেহারার সঙ্গে খুব বেশী পরিচয় আমার নেই, কিন্তু আমি খুব শক্ত মেয়ে দিদি, ভয় আমি পাব না।

রুনি বাইজীর আসল নাম জানি না ভাই, শুনেছি বাঙালীর ঘরের মেয়ে। ছেলেবেলা থেকে ফৈজাবাদে মানুষ। ও তল্লাটে একডাকে সবাই ওকে চেনে। গানের গলা চমৎকার, কিন্তু তার চেয়েও চমৎকার তার রূপ। পুরুষ পোড়াবার অজস্র উপকরণ তার প্রতি অঙ্গে। একবার চাইলে চোখ ফেরান যায় না।

তুমি কী করে দেখলে?

সে রূপের ঢেউ উজান বেয়ে ঘরের আঙিনায় ঢুকেছিল যে ভাই। তাই দেখেছি। ভেসে যাওয়া পোড়োবাড়ির চালের ওপর বসে যে-ভাবে লোক বন্যার রূপ দেখে সেই চোখে দেখেছি।

এ বাড়িতে এসেছিল?

হ্যাঁ, এসেছিল। মহাষ্টমীর দিন থেকে মুজরো ছিল এ বাড়িতে। তিন-দিন গানবাজনা হয়েছিল। অবশ্য রুনি বাইজীকে ঘিরেই জমজমাট আসর। এ তিনদিন বাড়ির কর্তারা অন্দরেই আসতেন না। চিকের আড়ালে বসে আমি দেখেছি ভাই। সে রূপের তুলনা হয় না।

তারপর? ভূতের গল্প শুনছে এমনভাবে কথা বলল লীলা।

তারপর সর্বনাশ হল। আগুন ঘরের মটকায় এসে ঠেকল। কিছুতেই ঠেকান গেল না।

বুঝতে পারল না লীলা। সতীর কথা বুঝতে মাঝে মাঝে ভারি অসুবিধা হয়। এমন সব হেঁয়ালী ভরা কথা।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না। লীলা স্পষ্ট স্বীকার করল।

খুব ম্লান হাসল সতী। ভোরের শুকতারার মতো ফ্যাকাসে জলুস। হাসি যেন অশ্রুর শরিক, বেদনার অংশীদার। থেমে থেমে আস্তে আস্তে বলল, মাঝ-রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। গানের আসর থেমে গেছে, কিন্তু হৈ-হল্লা থামে নি। কাচের গ্লাসের ঠুনঠুন আওয়াজ, বাতাসকে চিরে প্রমত্ত চিৎকার। বিছানায় চুপচাপ বসে রইলাম, ঘুম এল না। ভাবলাম, একবার দেখে আসি অবস্থাটা। উঠে সিঁড়ি দিয়ে কিছুটা নেমেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

দু-হাতে আঁচল বুকের ওপর মুঠি করে সতী উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে

মুখ তুলে বসে রইল। চেতনা নেই। কয়েক বছর আগেকার এক মর্মভেদী দৃশ্য যেন আবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে চোখের সামনে। আকাশের সুনীল পটভূমিকায় রক্তের আঁচড়ে কোন অদৃশ্য শিল্পীর করুণ আলেখ্য ধীরে ধীরে রূপায়িত হয়ে চলেছে।

দিদি, লীলা দুটো হাত দিয়ে ঝাঁকানি দিল, এমন করে থামলে কেন?

না থামিনি, থামলে আমাদের চলে না, খুব অস্ফুট গলা, কান পেতে তবে শুনতে হয় প্রত্যেকটি শব্দ।

কিন্তু কী দেখলে বল? লীলার কণ্ঠে উদ্বেগের ছোঁয়াচ।

কিংখাবের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে পুরু গালিচার ওপর পা ছড়িয়ে রুনি বাইজী। সামনের রুপোর থালায় স্তূপীকৃত ফুলের মালা। ভক্তদের উপহার। একটা হাত দিয়ে তানপুরোর তারগুলো ছুঁয়ে চলেছে। মিষ্টি সুরের ঝঙ্কার। প্রসারিত দুটি পায়ের ওপর মাথা রেখে চুপ করে পড়ে আছেন এ-বাড়ির বড় ছেলে। চেতনা নেই, সাড় নেই, নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার ভঙ্গী, রূপের দেউলে আত্মনিবেদন।

এ-বাড়ির বড় ছেলে? লীলা মৃদু গলায় বলল। বুঝতে-পারা ব্যাপারটাকে আরো স্পষ্ট করে তুলতে চায়। পাড়ের কাছ-ঘেঁষা নৌকোর রশি ধরে টেনে শক্ত মাটির ওপর তোলার চেষ্টা।

হ্যাঁ, আমার স্বামী দেবতা। সুর আর সুরার নেশায় মশগুল হয়ে মল্লিক বাড়ির বংশধর বিলাসিনীর পায়ের তলায় শুধু নিজেকেই নয়, এ-বাড়ির আভিজাত্য ঐতিহ্য সম্ভ্রম সব বিলিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু এ-সব কথা তখন মনে পড়ে নি ভাই, এখন পড়ছে। তখন শুধু একটি মাত্র কথা বিদ্যুতের মতন মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল, এ পৃথিবীতে আমার সব চেয়ে নিজের জিনিসকে ছিনিয়ে নিচ্ছে আমারই মতন এক নারী। মান অপমান লজ্জা সব সহ্য হয়, সব ভুলে যেতে পারি আমরা, কিন্তু পরাজয় কিছুতেই মন থেকে মুছতে পারি না, হাজার চেষ্টাতেও নয়।

সতীকে এক সঙ্গে এতগুলো কথা বলতে এর আগে আর কোনদিন শোনে নি লীলা। মানুষজনকে পাশ কাটিয়ে গেছে কেবল, কথার উত্তরে স্বল্প কথা বলেছে, কিংবা বিষাদ ম্লান হাসি। তার বেশী নয়। আশ্চর্য লাগল লীলার। এত কথা ছিল বলার, বুকের মধ্যে এত ব্যথা ছিল জমানো!

তারপর? লীলার গলা আরো মৃদু।

তারপর তিল তিল করে নিচে নামার কাহিনী। মহালে খাজনা আদায়ের নাম করে বাইরে বাইরে রাত কাটানো। শুধু প্রজাদের বুকের রক্তমাখান খাজনাই নয়, আরো অনেক কিছু রূপের আঁচে ছাই হয়ে গেল।

তুমি কিছু বল নি কেন দিদি? কেন বাধা দেবার চেষ্টা কর নি? লীলা বুঝতে পারল ভিজে ভিজে ঠেকছে চোখের পাতা। গলার কাছে শক্ত মতন কি একটা আটকে রয়েছে। কথা বলা যায় না, কথা চাপাও যায় না বুঝি!

সতী আবার ম্লান হাসল।

পা জড়িয়ে ধরে সারা রাত গুমরে গুমরে কেঁদেছি কিন্তু পারি নি। সিন্দুক থেকে একটা একটা করে জড়োয়া গয়না তুলে দিয়েছি, বাড়ির লোক জানত শহরে বিরাট এক ব্যবসার পত্তন হচ্ছে, তাই টাকার দরকায়। আমার বাপের বাড়ির দেওয়া গয়না, তাই আর বেশী কথা ওঠে নি। কিন্তু আমি তো জানতাম ভাই সে সব কী কাজে লাগছে।

বুক কাঁপিয়ে নিশ্বাস পড়ল। লীলারও বুক কেঁপে উঠল। মনে হল এই অমঙ্গলের সঙ্গে বুঝি অলক্ষ্যে ওর নিজের অমঙ্গলও জড়ান রয়েছে। আজ আর তেমন জমজমাট নয় কিছু। মল্লিক-বাড়ির কঙ্কাল পড়ে আছে, শুধু আভিজাত্যের খোলস। মুঠো মুঠো সোনা ছড়াবার দিন আর নেই। কিন্তু মুঠো মুঠো প্রাণ, তা তো ছড়ান যেতে পারে। সব চেয়ে কাছের মানুষ লীলার ভালবাসার আওতা থেকে আস্তে আস্তে যদি সরে দাঁড়ায়। দু হাত অঞ্জলি বদ্ধ করে দাঁড়ায় অন্য কোন নারীর সান্নিধ্যে! বুকে তীর-বেঁধা পাখির মতো লীলা ছটফট করে উঠল। না, কখনই নয়, শেখরনাথ তেমন মানুষ নন।

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল। সতী দাঁড়িয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে লীলাও দাঁড়িয়ে উঠল, ওঁর শহরে যাওয়ার বিষয়ে আপত্তি করলে কেন দিদি?

আঁচল দিয়ে নিজের দুটো চোখ মুছে নিয়ে সতী ফিরে দাঁড়াল, নায়েব মশাই কাল দেখা করে গেলেন।

নায়েব মশাই?

হ্যাঁ, সন্ধ্যার ঝোঁকে দরকারী দলিল নেবার জন্যে এসেছিলেন, যাবার সময় ভারী গলায় বলে গেলেন, এ বাড়িতে কালো বেড়ালের হাড় পোঁতা আছে এ বাড়ির সব কিছু শেষ হতে আর দেরি নেই।

এ কথা কেন বললেন, দিদি ?

আমিও নায়েব মশাইকে সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলাম। উনি বললেন, মুন্না বাইজী এসেছে শহরে, ছোটবাবু উকীল বাড়িতে না গিয়ে সেখানেই পড়ে আছেন দিনরাত। আমি এ সব কিছু ভাল বুঝছি না।

মুন্না বাইজীর বাড়িতে পড়ে আছেন দিনরাত, লীলার গলার আওয়াজ যেন বন্ধ হয়ে এল। অনেক কষ্টে ছাদের কার্নিশ ধরে টাল সামলাল। কি অন্ধকার নেমে আসছে চোখের সামনে। শুধু রাত্রির অন্ধকারই নয়, জমাট কালো পর্দা নেমে আসছে সামনের দিনগুলোর ওপর। একাকার করে দিচ্ছে সমস্ত কিছু।

কি হবে দিদি ? আমি কি করবো ?

জানি না ভাই, শুধু এইটুকু বলতে পারি প্রাণ দিয়েও এ সর্বনাশ ঠেকাতে হবে, নইলে সব ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার হয়ে যাবে। পায়ের তলায় চোরাবালির নিচে সব নিশ্চিহ্ন।

সতী আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

॥ চার ॥

বসতবাটির অর্ধেকটাই নয়, বারো আনারও বেশী। দত্ত সাহেব নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করলেন। দেয়াল তুলে ভিতরের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হল। দি ভরতপুর ইঞ্জিনিয়ারীং সিণ্ডিকেট আর মল্লিক-বাড়ির মাঝখানে পাকা গাঁথুনী। মাসখানেকের মধ্যেই চণ্ডীমণ্ডপ আর নাটমন্দিরের চেহারা বদলে গেল। খিলেনের কাজ মিস্ত্রিদের কর্নিকের ঘায়ে ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ল মাটিতে, গোল গোল থামগুলোও গুঁড়িয়ে গেল। একেবারে হাল ফ্যাসানের অফিস ঘর। বড় বড় আলমারী বসান হল দেয়াল জুড়ে। কাঁচ-টাকা টেবিলের সার। বার্নিশ-চকচকে চেয়ার। ইঞ্জিনিয়ারীং সিণ্ডিকেটের চেহারা শুধু ইঁটকাঠের মধ্যেই আবদ্ধ রইল না, ছড়িয়ে পড়ল সিঁড়ির ধাপে ধাপে, বাগানের ঘাসে। সবুজ রং করা টবে বিলিতি পামের চারা, বাগান কুপিয়ে মরসুমী ফুলের বীজ। ফ্ল্যানেলের প্যাণ্ট আর পাতলা জাম্পার গায়ে

দত্তসায়েব ঘুরে ঘুরে সব দেখলেন। মুখে বাঁকানো পাইপ, মাথায় চকোলেট রংয়ের ফেল্ট।

সবই হল, শুধু অফিসঘরের পাশ দিয়ে রইল ছোট একটা শড়ক। অন্দর-মহল থেকে বাইরে যাবার বাড়তি রাস্তা। নয়তো সদরে যেতে হলে খিড়কীপুকুর ঘুরে তবে যেতে হয়। অনেকটা পথ। শুধু শড়কই নয়, ওটা যেন কিছুটা ভবিষ্যতের আশ্বাস। আবার যদি কোন দিন অবস্থা ফেরে মল্লিক-বাড়ির, সিণ্ডিকেটের বলয়গ্রাস থেকে মুক্ত করতে পারে নিজের আভিজাত্য, সম্ভ্রম, ওদের আওতা থেকে ছিনিয়ে এনে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে মল্লিক-বাড়ির হারানো সম্পদ, হারানো ঐতিহ্য! সেই ভবিষ্যতের স্বর্ণগর্ভ দিনের দিকে চেয়েই এই শড়ক রইল সম্ভাবনার সূত্র হিসেবে। নয়তো, শ-খানেক ইঁট গেঁথে অনায়াসেই এ ফাটল বন্ধ করে দেওয়া যেত। কার কোথায় কোন ঘুরপথ দিয়ে আনাগোনা করতে হবে, অত ভাবলে ব্যবসায়ী মানুষের চলে না।

দত্তসাহেব কথাটা একবার তুলেওছিলেন, কিন্তু নায়েব জনার্দন বেমালুম চেপে গেছে, থাক্ হুজুর, এটা আর বন্ধ করে কাজ নেই। সামনে এই একফালি বাগান। বাড়ির মেয়েরা একটু ঘোরাফেরা করতে পারবেন, নিশ্বাস নিতে পারবেন, এটুকু আর ইঁট দিয়ে বুজিয়ে দরকার নেই।

পা ফাঁক করে দত্তসাহেব প্রচুর ধোঁয়া ছেড়েছিলেন। কালো কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ার রাশ। ঠোঁট দিয়ে পাইপের কোণটা চেপে বলেছিলেন, ও, ঘোরাফেরা করবেন বাগানে? তা বেশ তো! আমি মিস্ত্রিদের বলে দিচ্ছি, ওটুকু বন্ধ করার আর দরকার নেই।

জনার্দন হেঁট হয়ে নমস্কার করেছিল। আর কথা বলে নি।

বাড়ির মেয়ে বলতে শুধু দুজন। সতী আর লীলা। পিসি অবস্থা বুঝে তীর্থে যাবার ছুতোয় বাড়ি ছেড়েছেন। মানে মানে যাওয়াই ভাল। এরপরে আরো কি দেখতে হয়, ঠিক আছে! পুরোনো ঝি নিস্তার। এ বাড়ির খেয়ে-পরে মানুষ। শত দুঃখে অনটনে এ ভিটে ছাড়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। মাইনের বালাই নেই, দুবেলা দুমুঠো খাওয়া পেলেই যথেষ্ট।

জনার্দন বলেছিল বটে, কিন্তু বাগানে পায়চারি করার জন্য মেয়েদের কেউই ও শড়কের ধারে কাছে ঘেঁসে নি। শুধু সাইনবোর্ড টাঙাবার সময় পা টিপে

টিপে নিস্তার উঁকি দিয়ে দেখে এসেছিল। সামনের রাস্তা মোটরে বোঝাই। বড় বড় লোহার পেরেক ঠুকে সাইনবোর্ড টাঙান নয়, রীতিমত পাথরের ফলকে লেখা সিণ্ডিকেটের নাম। তার ওপর রঙিন সিল্কের কাপড় ঢাকা। এস, ডি, ও, সায়েব এসেছেন দশ মাইল দূর থেকে। ফুলের মালা গলায় দিয়ে এগিয়ে এসে দড়িতে শুধু হাত ছোঁয়ালেন, আর সরসর করে সরে গেল সিল্কের আবরণ। প্রস্তর ফলক উন্মোচিত হল। হাততালির আওয়াজে কান পাতা যায় না। উঁকি দিয়ে এইটুকু দেখেই নিস্তার ছুটে বাড়ির ভিতরে চলে এল।

বৌরানী, শিগগির দেখবেন আসুন, বাইরে কি কাণ্ড হচ্ছে। নিস্তার চৌকাঠে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

ছাদের সিঁড়ির চাতালে দুই জা বসেছিল পাশাপাশি। সতীর হাতে বই, লীলার হাতে পশমের তাল। বিরাট বাড়ির আয়তন সীমিত হয়ে এসেছে গোটা চারেক ঘরে। পুরোনো ভারী ভারী আসবাব অনেক সরে গিয়েছে। পুরোনো ঝি চাকরও। সুখদুঃখে মেশান আগেকার দিনগুলোর কথাই হচ্ছিল দু জায়ে, নিস্তারের কথায় দুজনেই চমকে উঠল।

প্রথমে লীলাই কথা বলল, কি কাণ্ড হচ্ছে বাইরে?

নিস্তার ছোট চোখ দুটো বিস্ফারিত করল, সারা রাস্তা মোটরে গিজগিজ করছে। সায়েবসুবো এসেছে একগাদা। মালা, গন্ধজল, একবার ছাদের এদিকেই আসুন না।

সতী হাসল। খুব মৃদু গলায় বলল, এই সেদিনের কথা ভাই, বোধ হয় তোমার বিয়ের বছর চারেক আগে, নাটমন্দিরে কীর্তনের বন্দোবস্ত হয়েছিল। কালী কীর্তন। সারা গাঁ ভেঙে পড়েছিল। কেশব ঠাকুর বিখ্যাত কীর্তনীয়া। বয়স ষাটের কাছাকাছি, কি বাঁধুনী শরীরের! যেমন শক্ত শরীর, তেমনি মিষ্টি গলা। চিকের আড়ালে বসে শুনতে শুনতে চোখ ভিজে উঠত, গাল বেয়ে জল পড়ত গড়িয়ে। পশু পক্ষীও যেন স্থির হয়ে শুনত কেশব ঠাকুরের গান। তিন দিন তিন রাত ধরে একটানা চলেছিল কীর্তন। আহা, তেমন জিনিস জীবনে শুনি নি। সতী আঁচলে দু চোখ মুছল, তারপর নিশ্বাস ফেলে বলল, আজ বুঝি সেই নাটমন্দিরে অনেক সায়েবসুবো এসেছে নিস্তার?

হঠাৎ বাইরে থেকে গানের সুর ভেসে এল। হালকা গানের সুর, কিন্তু মিষ্টি। বহু শত বছর ধরে প্রিয়ার পথ চাওয়ার অবসান। প্রিয়া এসেছে ঝরা

কিংশুক মাড়িয়ে বনের পথ ধরে। কিন্তু শুধু কি বনেরই পথ ধরে, মনের নয়? প্রিয়ার পদধ্বনি কেবল কি ঝাউগাছের স্পন্দনে, হিয়ার পরতে পরতেও তো তারই আগমনীর সুর!

রেকর্ডে গান শুরু হয়েছে। হয়তো আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য। লীলা আর সতী দুজনেই ছাদের এ কোণে এসে দাঁড়াল। পা টিপে টিপে। ছাদের কোণটা অন্ধকার, কিন্তু সিণ্ডিকেটের সামনে চোখ-ধাঁধানো আলোর সমারোহ। বেশীক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না। ওরা যাবার সংগে সংগেই এ গান শেষ হয়ে গেল। রেকর্ডে জলতরংগ শুরু হয়েছে। বাগানে টেবিল পাতা, অনেকগুলো। টেবিল ঘিরে চেয়ারের রাশ। একটি চেয়ারও খালি নেই। দত্তসায়েব নিজেও বসেছেন কোণের চেয়ারে, বোধ হয় এস, ডি, ও, সায়েবকে পাশে নিয়ে। খাওয়া-দাওয়ার বিরাট আয়োজন। তকমা আঁটা চাপরাশী ঘুরছে খাবারের ট্রে হাতে।

অনেকক্ষণ ধরে দুজনে ঝুঁকে ঝুঁকে দেখল। রেকর্ডে গানের পর গান চলেছে। ভরতপুরের আকাশে বাতাসে আনন্দের হিল্লোল। রূপান্তরের উল্লাস। বেড়ায় বাইরে অগণিত প্রজা দাঁড়িয়েছে জোট বেঁধে। ভরতপুরের জমিদারবাড়ির সামনে নয়, ইঞ্জিনিয়ারীং সিণ্ডিকেটের আয়োজনে আকৃষ্ট হয়ে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে। বহ্নির মোহাবিষ্ট অসংখ্য পতঙ্গের মতন। কোদালের বদলে নতুন হাতিয়ার। অসমতল মাটির ঢেলা মাড়িয়ে মাঠের বুকে ছুটোছুটি আর নয়, দি ভরতপুর ইঞ্জিনিয়ারীং সিণ্ডিকেটের ফারনেসের মুখোমুখি দাঁড়ান। মাটির তাল নিয়ে খেলার শেষ, এবার নতুন খেলার শুরু লোহার তাল নিয়ে। ইতিমধ্যে গ্রামের মধ্যে ঢুকে বাড়ি বাড়ি খবর দিয়েছে সিণ্ডিকেটের লোকেরা। মাস গেলে করকরে ত্রিশ টাকা। জোয়ান মর্দই শুধু নয়, শক্ত সমর্থ মেয়ে-মানুষেরও কাজ রয়েছে। কারখানায় এসে নাম লেখালেই হল।

কি একটা রসিকতায় মুখ তুলে উচ্চহাস্য করতে গিয়েই দত্তসায়েব থেমে গেলেন। সার্চলাইটের তীব্র আলো এসে পড়েছে ছাদের আলিসার ওপরে। লীলা একেবারে কোণ ঘেঁষে অন্ধকারে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু সতীর মুখের ওপর এসে পড়েছে আলো। কোথাও সামান্য অস্পষ্টতা নেই।

দত্ত সায়েব আর চোখ নামালেন না। একদৃষ্টে চেয়ে দেখলেন, আলিসার ওপরে রুক্ষ চুলের গোছার মাঝখানে ফুটন্ত ফুলের মতন একটি মুখ। আয়ত দুটি

চোখ। সীমন্তের বর্ণহীনতাও নজর এড়াল না। এ বাড়ির বড়ো বৌয়ের কথা কানাঘুষা শুনেছিলেন এধার ওধার। আজ চোখে দেখলেন। সত্যি, দেখবার মতনই।

সতীর খেয়ালই নেই। একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে নিচের সাজান আসরের দিকে। হঠাৎ লীলার চোখে পড়ল। সার্চলাইটের উজ্জ্বল আলোয় দত্ত সায়েবের চোখের মণিদুটোয় অস্বাভাবিক দীপ্তি। পলকহীন দৃষ্টিতে ওপরের দিকে চেয়ে রয়েছেন।

দিদি, লীলা আস্তে ঠেলা দিল।

সাড়া নেই। ভারি চমৎকার মীরার ভজন শুরু হয়েছে রেকর্ডে। গিরিধারী গোপাল, মীরার পীতম গ্রহণ করেছেন মীরাকে। বাধা নেই, ব্যবধানও নয়। পরিপূর্ণ রূপে পাওয়া। নিজেকে মিশিয়ে দেওয়া দয়িতের সঙ্গে।

আর একবার লীলা পিঠ ধরে নাড়া দিতেই সতীর টনক নড়ল, কি বৌরানী ?

সরে এস ওদিক থেকে, নিচের লোকগুলো চেয়ে রয়েছে।

চেয়ে রয়েছে ? সতী নিচের দিকে চোখ ফেরাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। তখনও একভাবে চেয়ে রয়েছেন দত্তসাহেব। পরিবেশ ভুলে।

দু হাতে আঁচলটা বুকের সামনে জড় করে সতী অন্ধকারের আওতায় সরে এল। লোকটা কে বল তো বৌরানী, কি বিশ্রী চাউনি।

চাউনিটা যে খুবই বিশ্রী সেটা লীলার নজর এড়ায় নি। এ দৃষ্টির একটা মানেই শুধু হয়। এর অর্থ বুঝতে মেয়েদের একটুও দেরি হয় না।

উনিই দত্ত সাহেব, সিণ্ডিকেটের মালিক। লীলা খুব আস্তে আস্তে কথা-গুলো উচ্চারণ করল।

মালিক! বিড়বিড় করে বলেই সতী আর দাঁড়াল না। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল।

কিন্তু পাথরের মূর্তির মতন নিস্পন্দ হয়ে লীলা ছাদে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। শুধু মল্লিকবাড়ির জমি আর বসতবাটি কুক্ষিগত করেই বুঝি এরা ক্ষান্ত হবে না, লুব্ধ হাত বাড়াবে মানুষগুলোর দিকেই। কিন্তু ভুল করেছে এরা! ঝকঝকে রূপোর টাকায় জায়গা-জমি সবই হাত বদল হয়, মানুষকে ভোলান যায় না।

কিংবা কিছুই বুঝি জোর করে বলা যায় না। ভাঙন ধরেছে এ বাড়িতে। সব কিছু ভেঙে ভেঙে পড়তেপারে।

এ সব ভাবতেও লীলার ভাল লাগল না। পশমগুলো জড় করে নিচে নেমে এল।

বাইরের আওয়াজ নিচের ঘরে অনেক কম। পুরু দেওয়াল ভেদ করে শুধু অস্পষ্ট রেশ ভেসে আসছে। নিজের ঘরের কাছ বরাবর গিয়েই লীলা থমকে দাঁড়াল।

ঘর অন্ধকার, ভারী পর্দাটা কালো যবনিকার মতন সামনে ঝুলছে। বেহালার করুণ আওয়াজ গুমরে গুমরে উঠছে কান্নার মতন। গোলমাল হয়ে গেল লীলার। শেখরনাথ শহরে গেছেন। ফিরতে দেরি হবে। বাইরের রেকর্ডের শব্দ এত দূরে আসার তো কথা নয়।

টেবিলের পাশ দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে লীলা দাঁড়িয়ে পড়ল। একেবারে জানলার দিকে রাখা কৌচটার ওপর শেখরনাথ। এদিক থেকে শুধু বিশৃঙ্খল চুলের রাশ দেখা যাচ্ছে। বাইরের গ্যাসের আলোর কিছুটা জানলার শার্সির ওপর এসে পড়েছে। তারই খানিকটা দীপ্তি প্রতিফলিত হয়েছে ঘরের দেয়ালে। আবছা আলোয় বেহালার ছড়টা চিক-চিক করে উঠল।

বাজনা নয়, লীলার মনে হল এ বাড়ির আত্মা দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে আর্তনাদ করছে। সারা বাড়িতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে স্বরের করুণ মূর্ছনা। শুধু এ বাড়ির ভিতরেই নয়, ভরতপুরের আকাশে বাতাসে একই চাপা কান্নার স্বর। বাইরের উল্লাস চাপা পড়ে গেছে বেদনাহত এই আর্তনাদের অন্তরালে।

অনেকক্ষণ খাটের বাজুতে হাত রেখে লীলা দাঁড়িয়ে রইল। থামবার কোন লক্ষণ নেই। অনন্ত যুগ ধরে বুঝি কান্নার ধারা এমনিভাবে ঝরে পড়বে।

বাতিদানে বাতি বসিয়ে দিতেই শেখরনাথ বেহালা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সোজা চাইলেন লীলার দিকে। দুটো চোখ রক্তের মতন লাল। দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা চেপে বললেন, কতক্ষণ?

অনেকক্ষণ। দাঁড়িয়ে তোমার বেহালা শুনছিলাম।

হুঁ, শেখরনাথ বেহালা আর ছড় বিছানার ওপর রেখে দিলেন।

এত করুণ স্বর তুমি আর বাজিও না গো। বুকটা কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে।

ওঠে বুঝি! শেখরনাথ আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন, বাইরে আনন্দের তো কিছু কমতি নেই, সেখানে গিয়ে জুটলেই পারতে। খাওয়া দাওয়া হৈ হুল্লোড় সবই চলেছে পুরো মাত্রায়। আজ অন্তত আমার হাতে করুণ সুর ছাড়া আর কিছু প্রত্যাশা করতে পার না। ধ্বসে পড়া ভিটের উপর দাঁড়িয়ে, জীবনের সব কিছু হারিয়ে তোমাকে বসন্ত-বাহার শোনাব, এটা নিশ্চয় আশা করনি?

এ কথার লীলা কোন উত্তর দিল না। আঁচল দিয়ে চোখের কোণ দুটো মুছে নিয়ে বলল, কখন এলে? আমরা ছাদে ছিলাম, দেখতে পেলাম না তো তোমায়?

শেখরনাথ মুচকি হাসলেন, পাগল, সিণ্ডিকেটের ওই আলোর বন্যার মধ্যে দিয়ে মল্লিকবাড়ির দেউলে বংশধর কখনও বাড়ি ঢুকতে পারে? আমি এসেছি খিড়কী পুকুরের পাশ দিয়ে।

শহরের কাজ মিটে গেল? লীলা আরো এগিয়ে এল। একেবারে শেখর-নাথের পাশাপাশি।

শহরের কাজ কি এত সহজে মেটে। গ্রামের কাজ বরং শেষ হয়ে আসছে, শহরের কাজের তো শুরু। শেখরনাথ কথার সঙ্গে হেসে উঠতেই লীলা চমকে উঠল।

এমন একটা সন্দেহ ঘরে ঢোকার সঙ্গেই হয়েছিল। বাতাসে উগ্র সুরার গন্ধ। শেখরনাথের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সন্দেহের সামান্য অবকাশও রইল না। নেশায় চুর হয়ে এসেছেন শেখরনাথ। ব্যথা ভোলবার জন্য এ ছাড়া বুঝি আর অন্য উপায় ছিল না।

খাটের ওপর থেকে মেয়েকে তুলে নিয়ে লীলা আস্তে আস্তে বাইরে চলে এল। আর একটি কথাও না বলে।

পরের দিন দুপুরের দিকে জনার্দন ঘোষাল এসে দাঁড়াল। জমিদারি লাটে উঠেছে, ছিটে ফোঁটারও খোঁজ পাওয়া যাবে না, কিন্তু নায়েবের সাজের চটক একটুও বদলায়নি। তেমনি বাবরী চুলের যত্ন, গোঁফের ফাঁকে ফাঁকে পাকা চুলের আভাস, কিন্তু তোয়াজের অন্ত নেই। আধ ময়লা সিল্কের চাদরটা কোমরে জড়ান।

দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে বলল, ডেকেছেন ছোটবাবু?

শেখরনাথ খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে বসেছিলেন, গা নাড়া দিয়ে উঠে বসে বললেন, হুঁ, আমার অবস্থা তো বুঝতেই পারছ। শুধু যে ডালটায় বসে আছি সেটাই সম্বল। তুমি কি ঠিক করলে?

কি করব বলুন ছোটবাবু? এ ভাবে বসিয়ে বসিয়ে কাঁহাতক আর পুষবেন আমাকে? ভাবছি দেশেই চলে যাই, দিন কাল যদি ফেরে আবার, তলব করবেন, পায়ের গোড়ায় এসে বসব।

দিন কাল! শেখরনাথ অন্যদিকে চোখ ফেরালেন। ঘরের কোণে কোণে মাকড়সার জাল, চুলের মতন হাজার ফাটল, দেওয়ালে রঙের প্রলেপ ফিকে। সমস্ত মৌজা হাত বদল করেছে, বসতবাটীর প্রায় সবটাই। আবার ঘুরবে চাকা! মল্লিক-বাড়ির ঝলমলে দিন কালো মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি দেবে! শেখরনাথ মুচকি হাসলেন। এ স্তোকবাক্যে অন্তত তাঁকে ভোলান যাবে না। উঠে দাঁড়িয়ে আলমারীর পাল্লা খুলে এক গোছা নোট বের করলেন। অনেক-গুলো সোনার জিনিস খুইয়ে এ টাকা হাতে এসেছে। জনার্দনের দিকে নোটগুলো এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই নাও, মল্লিক-বাড়ির কাছে তোমার পাওনা অনেক। কিছুই দিতে পারিনি। এগুলো রেখে দাও।

শেখরনাথ আর দাঁড়ালেন না। শেষের দিকে তাঁর গলার আওয়াজ ভারী হয়ে এল। জানলার গরাদ ধরে তিনি বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন।

জনার্দন নোটগুলো কোমরে বেঁধে আবার ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল, তারপর উঠে ঘরের দিকে পা বাড়াল।

মেয়েকে নিয়ে লীলা রান্নাঘরের চৌকাঠের কাছে বসেছিল। জনার্দন হাঁটু মুড়ে প্রণাম করল।

আমি দেশেই চললাম বৌরানী।

দেশে? লীলা এক হাত দিয়ে মাথার ঘোমটা একটু টেনে দিল।

হ্যাঁ, আপনার কাছে একটা নিবেদন আছে।

আমার কাছে?

নোটের গোছা বের করে জনার্দন লীলার পায়ের কাছে রাখল। অজ পাড়াগাঁয়ে আমার দেশ, এত টাকাকড়ি নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়। আপনার কাছে গচ্ছিত থাক, যখন দরকার হবে নিয়ে যাব।

কিসের টাকা বলুন তো? না জিজ্ঞাসা করে লীলা পারল না।

জনার্দন ম্লান হাসল। কোমরের চাদর খুলে কপাল আর ঘাড় মুছে নিল, তারপর বলল, আমার মল্লিক-বাড়ির পাওনা ছোটবাবু মিটিয়ে দিলেন।

কিন্তু আমি এত টাকা কোথায় রাখব?

আপনিই রাখুন, নয়তো এটাকা আবার ছোটবাবুর কাছেই নিয়ে যেতে হয়। তা হলে ফেরত পাবার আর কোন আশা থাকে না বৌরানী।

কিছুক্ষণ কি ভাবল লীলা, তারপর নোটের গোছা তুলে নিয়ে নিজের আঁচলে বাঁধল। মেয়েকে শুইয়ে রেখে জনার্দনের কাছে এসে দাঁড়াল।

আপনার সঙ্গে একটা দরকারী কথা আছে।

জনার্দন দাঁড়িয়ে উঠল।

পিছনের দরজা দিয়ে দুজনে খিড়কী পুকুরের কাছ বরাবর এল। বাঁধানো ঘাটের চাতাল। লাল সিমেন্ট দেওয়া। চাঁদিনীরাতে মানুষজনের চোখ বাঁচিয়ে শেখরনাথ আর লীলা এখানে এসে বসেছে পাশাপাশি। হেনা আর কনকচাঁপার উগ্র সুরভি, চাঁদের আলোয় ইনিয়ে বিনিয়ে এলোমেলো আলাপ। জাল বোনা, জাল ছেঁড়া আবোল-তাবোল কথার। কোথা দিয়ে রাত কেটে ভোরের শুকতারা দেখা দিত খেয়ালই হত না। বাড়ির লোকজনের জেগে ওঠার আওয়াজে হাত ধরাধরি করে পালিয়ে আসত দুজনে। আজও চাঁদিনী-রাত আসে, কনকচাঁপার মরাডালেও ফুল ফোটে দু একটা, কিন্তু মানুষের পুরানো মন আর ফিরে আসে না। সারা রাত ধরে পাগলামী করার মত মনের অবস্থাও বুঝি আর নেই। পুকুরের পানা-ছাওয়া জলের দিকে চেয়ে লীলা নিশ্বাস ফেলল।

কি কথা আছে বলছিলেন বৌরানী, জনার্দন মনে করিয়ে দিল।

ও, হ্যাঁ, লীলার সম্বিত ফিরে এল, আপনি তো এ বাড়ির সবই জানেন। আমার স্বামীকে বাঁচাবার পথ বলে দিন।

অনেকক্ষণ জনার্দন চুপচাপ চেয়ে রইল দূরের গাছপালার দিকে। দুটো চোখ কুঁচকে কি ভাবল। এক সময়ে লীলার দিকে ফিরে বলল, সবই জানি বৌরানী, কিন্তু আমি কি বুদ্ধি দেব বলুন তো। চিরদিন গায়ের জোরে লাঠি ঘুরিয়ে হুজুরের হুকুম তামিল করে এসেছি। জমি দখল করেছি, পরের ঘরে আগুন লাগিয়েছি, কিন্তু নিজের ঘরে আগুন লাগলে কি করতে হবে, তা কোন-দিন ভাবিনি। ভাবলেও যে কিছু কিনারা করতে পারব, এমন ভরসা কম।

তবে আমার এটুকু মনে হয়েছে যে এ বাড়িতে আর যেন আপনাদের থাকা চলে না। মান যাওয়া জান যাওয়ারই সামিল বৌরানী। ছোটবাবু আর বড় বৌরানীকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যান। নতুন করে জীবনের শুরু, পুরোনো সব কিছু ফেলে দিয়ে।

জনার্দন আর দাঁড়াল না। নিচু হয়ে প্রণাম করে হন্‌হন্‌ করে মেঠো পথ ধরল।

চাতালে হেলান দিয়ে লীলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। বাঁশঝাড়ের পিছনে জনার্দন মিলিয়ে গেল। কে জানে, লোকটা হয়তো আর কোনদিনই ফিরে আসবে না। মল্লিক-বাড়ির ঐশ্বর্য আর সম্পদ তিল তিল করে গড়ে তোলার কাজে যে সহায় ছিল, আজ ভেঙে পড়ার দিনে সে আর থাকতে চায় না। সর্বনাশা ভাঙনের রূপ বুঝি আর দেখতে চায় না নিজের চোখে।

নতুন করে জীবনের শুরু! পুরানো দিনের কাদা আর পাঁক মুছে পরিপূর্ণ জীবনের আস্বাদ নতুন পরিবেশে। মুন্না বাইজী, দত্ত সাহেব, সুরার মদির নেশার আওতা থেকে অনেক অনেক দূরে।

কিন্তু কোথাও পালিয়ে যাবার কথাটাই বলে গেল জনার্দন, নতুন দেশের কোন হদিশ দিয়ে গেল না, নতুন জীবনের ইঙ্গিতও নয়।

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে লীলা বাড়ীর দিকে পা ফেরাল।

দুপুরের দিকে একটু তন্দ্রার মতন এসেছিল লীলার। শেখরনাথ আজ কদিন বাড়ীছাড়া। হঠাৎ কথার আওয়াজে তন্দ্রা ভেঙে গেল। বিছানা ছেড়ে উঠে মনে হল শব্দ আসছে বড় জায়ের ঘরের দিক থেকে। পায়ে পায়ে হেঁটে চৌকাঠের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

মেঝেয় মাদুর পাতা। চওড়া কালো পাড় শাড়ী আঁটসাঁট করে পরা, হাত কাটা ব্লাউজ, সরু চিকচিকে হারের আভাস গলার খাঁজে, কালো চুলের রাশ এলো খোঁপার ধরনে জড়ান। মেয়েটির মুখ এদিক থেকে দেখা যাচ্ছে না। হাত মুখ নেড়ে অনর্গল কথা বলে চলেছে।

লীলা দাঁড়াতেই সতী হাত নেড়ে ডাকল, এসো বৌরানী।

লীলা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

এবারে স্পষ্ট দেখা গেল মেয়েটির মুখ। টানা দুটি চোখ, পাতলা ঠোঁট, শ্যামল রঙ। হঠাৎ চোখে লাগার মত মেয়ে।

কে দিদি ? লীলা ভ্রূ দুটো তুলল।

দত্ত সায়েব নতুন স্কুল বসাচ্ছেন তারই মাস্টারনী, সতী থেমে থেমে বলল।

দু এক মিনিট। কথাগুলো মনে মনে লীলা একবার আউড়ে নিল।

দত্ত সাহেবের স্কুলের মাস্টারনী মল্লিক-বাড়ির অন্তঃপুরে কেন ? স্কুলে ভরতি হবে এমন কেউ তো নেই। তবে ?

লীলার ইতস্তত ভাব মেয়েটির বোধ হয় নজর এড়াল না। কুণ্ঠিত গলায় বলল, আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। পাঁচিলের ওপারেই রয়েছি। একেবারেই একলাটি—

বেশ করেছেন, সতীর গলার আওয়াজে উৎসাহের আমেজ, আপনাদের স্কুল আরম্ভ হতে দেরি হবে বোধ হয় ?

না, খুব দেরি নয়। কিছু অদল-বদল করা হচ্ছে। বসত বাড়ি ভেঙে স্কুলবাড়ি তো ! মাসখানেকের মধ্যেই বোধ হয় কাজ আরম্ভ করতে পারব। একটু থামল মেয়েটি। সতী আর লীলার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কি দেখল তারপর হঠাৎ বলল, একদিন পায়ের ধুলো দেবেন না ওদিকে ? নতুন বন্দোবস্ত দেখবেন।

নতুন বন্দোবস্ত ! বাপ পিতামহের ভিটের নব রূপান্তর ! অনেক দূর থেকে ছেলেমেয়ের দল আসবে পড়তে। কলরবে ছাদ কাঁপিয়ে তুলবে। প্রথম প্রথম হয়তো সবাই বলবে মল্লিক-বাড়ির স্কুল। তারপর একটু একটু করে জানবে প্রতিষ্ঠাতার নাম। মল্লিক-বাড়ির কেউ নয় কিন্তু ভরতপুরের আধা-বখরাদার।

লীলা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, খেয়াল হতে শুনল দত্তসায়েবের প্রশস্তি চলেছে। মহানুভব, উদার, শুধু তাই নয়, অমায়িকও ! পরদুঃখে কাতর, পরহিতে উন্মুখ। ভাটের মুখে রাজার কীর্তি-বন্দনার মত।

লীলা উঠে দাঁড়াল।

কি, উঠলে যে বৌরানী ? সতী জিজ্ঞাসা করল।

খুকু বোধ হয় উঠেছে। কান্নার আওয়াজ পেলাম। লীলা চৌকাঠ পার হয়ে এদিকে চলে এল। খুকু ওঠে নি, কিন্তু উঠে চলে আসার আর কোন ছুতো চট করে লীলার মনে এল না। বসে বসে দত্ত সায়েবের স্তুতি শোনার চেয়ে জানলার গরাদে মাথা রেখে বাইরের দিকে চেয়ে সময় কাটানও

ঢের ভাল। কিন্তু তাতেও কি নিস্তার আছে? ঝুড়ি বোঝাই মাটি নিয়ে সার সার চলেছে মজুরানীর দল। গাইতি আর শাবলের শব্দ ভেসে আসছে। ইঞ্জিনিয়ারীং সিণ্ডিকেটের কাজ চলেছে জোর দমে। এখানেও দত্তসায়েবের দীর্ঘায়ত ছায়া।

দিন দুয়েক। ভোর ভোর জানলা দিয়ে বাইরে চেয়েই লীলা অবাক হয়ে গেল। সড়কের ওপর, একেবারে পাশাপাশি। দত্ত সায়েবের পরনে দামী স্যুট। সবুজ টাইয়ের ওপরে হীরা বসানো পিন রোদে চক চক করে উঠছে। ঐশ্বর্য্যের দ্যুতি। চোখ ঝলসানো। পাশেই কোমরে হাত রেখে শেখরনাথ। অবিন্যস্ত চুলের রাশ। বয়সের চেয়ে আরো জীর্ণ চেহারা। শেষ খেয়া ছেড়ে দেবার পর ঘাটে পৌঁছান যাত্রীর মতন মুখের ভাব। পিছনে চাইবার মতন যেমন কিছু নেই, সামনের সব কিছুও তেমনি গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। দত্তসাহেবই বলে চলেছেন, উত্তরে শেখরনাথ শুধু মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছেন।

একটু আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল লীলা। দত্তসায়েবের চাউনি একটুও ভাল লাগে না। নির্লজ্জ কটাক্ষ। চোখের যেন পলক পড়তে চায় না। আড়াল থেকেই দেখতে পেল শেখরনাথ ফটক দিয়ে ঢুকছেন। উদাস চোখের দৃষ্টি।

ঘরের মধ্যে ঢুকে শেখরনাথ খাটের ওপর গিয়ে বসলেন। কোঁচার খুঁটে মুখ মুছে লীলার দিকে চোখ তুলে চাইলেন, আমাকে বিকেলের দিকে আবার শহরে যেতে হবে।

শহরে? আপাদমস্তক কেঁপে উঠল লীলার। শহরে কেন? অদৃশ্য এক হাতের ইশারায় এগিয়ে যায় মানুষ। নূপুরের নিক্কনে, মিঠে গানের সুরে তিল তিল করে অবলুপ্তি।

একটু থামলেন শেখরনাথ। কি ভাবলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, মিঃ দত্ত একটা বড় রকমের আয়োজন করছেন। তারই বন্দোবস্ত।

জলসা! জলসার আয়োজন করবেন ভরতপুরের নতুন অধীশ্বর আর তারই বন্দোবস্ত করবে হৃতসর্বস্ব দেউলে শেখরনাথ! পিতৃপিতামহের সম্পত্তিটুকু হাতে তুলে দিয়েও বুঝি শেষ হয় নি, ভৃত্যের মতন হুকুমও তামিল করতে হবে। নত মস্তকে আদেশ পালন।

মিঃ দত্তর পয়সার তো অভাব নেই, লোকজনেরও কমতি নেই কিছু। বন্দোবস্ত তোমাকেই করতে হবে, এ কেমন কথা ?

মৃদু হাসলেন শেখরনাথ। ম্লান হাসির ঝিলিক।

পয়সাকড়ি আর মানুষজন থাকলেই কি সব হয় লীলা !

অনেকদিন পরে শেখরনাথ নাম ধরে ডাকলেন। আগের সে আবেগ আর নেই, মানুষটাও কত বদলে গেছে, তবু সারা শরীর শিউরে উঠল লীলার ! মনে হল মানুষটা কখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। রুক্ষ ধূ ধূ দিনগুলো পার হয়ে আবার ফিরে গিয়েছে সবুজ মরূদ্যানে।

সত্যিই তাই। পয়সা আর মানুষই বুঝি সব নয় দুনিয়ায়। পাইক বরকন্দাজে ঠাস-বোঝাই ভরতপুরের এমন অবস্থাই বা হবে কেন তা হলে ? মৌজার পর মৌজা নিলামে উঠে বসতবাটির ভিতরই বা ফোঁপরা করে দেবে কেন ! পাগলা নদীর মতন মানুষের জীবনেও বুঝি বন্যা আসে। চুরমার করে দেয় সব কিছু। সাজান বাগান তচনচ। জীবনের সব কিছু দিয়েও সে উন্মত্ত স্রোত ঠেকান যায় না। মানুষজন টাকা-কড়ি সব নিশ্চিহ্ন।

বড় বড় গাইয়েরা সব আসবে বুঝি ? লীলা আলগোছে প্রশ্ন করল। কথার পিঠে কথা বলা। চুপচাপ থাকলে এখনই শেখরনাথ উঠে যাবেন বাইরে, নয়তো তাকিয়ায় হেলান দিয়ে চোখ বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকবেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অতীত জীবনের রোমন্থন কিংবা ভবিষ্যতের ঝিলিমিলি রচনা। কে জানে। জানতে লীলা কোনদিনই চায় নি। সে শুধু চেয়েছে মানুষটা চোখের সামনে থাক। বুকের কাছে না হোক অন্ততঃ হাতের কাছে।

দেখি, কাদের যোগাড় করতে পারি। শেখরনাথ যে বেশ অন্যমনস্ক, উত্তরেই তা মালুম হয়, যেমন চিনি ঢালবে তেমনি মিষ্টি হবে সরবৎ। তা ছাড়া অনেকে আছেন, পায়ের কাছে মোহর ঢেলে দিলেও বাইরে যেতে চান না। তাদের নরম করার ওষুধ আমার জানা। মল্লিক-বাড়িতেও তো জলসা বড় কম হয় নি। শেষের দিকে গলাটা ধরে এল শেখরনাথের, ঢোঁক গিলে নিজেকে সামলে নিলেন।

তার চেয়ে চল আমরা কোথাও চলে যাই, এগিয়ে এল লীলা, শেখরনাথের কাছাকাছি, ভরতপুর আমার আর একটুও ভাল লাগছে না।

শেখরনাথ মুখ তুললেন। বাইরের জানলা দিয়ে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

বুঝি বা নতুন ভরতপুরের দিকেই। ভাঙাগড়া চলেছে। ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলা হচ্ছে মল্লিকবংশের সামান্যতম স্মৃতি। পরিবর্তে নতুন মানুষের কীর্তিকলাপ সুরু হয়েছে। সামন্ততন্ত্রের শ্মশানের ওপর বণিকসভ্যতার সৌধ। কলকারখানার নতুন ঝকঝকে চিমনির আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে পুরানো দিনের মন্দিরের জীর্ণ কাঠামো। জমিদার বাড়িতে সার দিয়ে দাঁড়াত যে সব কর্মঠ মানুষ, আজ তারা কাতার দিয়ে দাঁড়ায় দি ভরতপুর ইঞ্জিনিয়ারিং সিণ্ডিকেটের দরজায়।

ভরতপুর কি শেখরনাথেরই ভাল লাগছে? ভরতপুরের সঙ্গে লীলার আর কতটুকু সম্বন্ধ? ঘোমটায় মুখ ঢেকে এই তো সেদিন পা দিয়েছে এ দেশের মাটিতে। আর শেখরনাথের বহু পুরুষের স্মৃতি জড়ান এর মাটি। সম্ভ্রমের মুকুট পরেছিলেন যে মাটিতে দাঁড়িয়ে, সম্পদ আর আভিজাত্যের রথ ছুটিয়েছিলেন, আজ সেখানেই কেঁচোর মতন জীবন যাপন করতে হচ্ছে। জলে যাওয়া দেশলাইয়ের কাঠির মতন নিষ্প্রভ, হৃততেজ। ইচ্ছা থাকলেও আর কোন দিন জ্বলে উঠতে পারবেন না।

কোথায় যাবে? শেখরনাথ উঠে দাঁড়ালেন। জানলার পাল্লা ধরে আবার বাইরে ফেরালেন দৃষ্টি।

যেখানে হোক, ভরতপুরের আওতা ছেড়ে যে কোন জায়গায়, লীলা বিড়বিড় করে বলল। ভরতপুরের আওতা ছেড়েই নয়, মুন্না বাইজীর বিষাক্ত সান্নিধ্য ছেড়েও। অবশ্য এ কথা মুখ ফুটে শেখরনাথকে বলা তো চলে না।

যেদিকে দুচোখ যায়, কেমন? কথার সঙ্গে সঙ্গে শেখরনাথ হাসলেন, নাকি যেদিকে মন চায়?

যেদিকে মন চায়! লীলার বুকটা আবার ধক্ করে উঠল। সারা মুখে ছাইয়ের পাংশু আভা। শেখরনাথের মন আর লীলার মন কি একই জিনিস চায়? একই লক্ষ্য দুজনের! বিয়ের পরে লীলার তাই মনে হয়েছিল। আলাদা সত্তা বুঝি নেই। ধ্যান ধারণা, রুচি অভিরুচি সব এক। কিন্তু আজ আর সে কথা লীলা বলতে পারে না জোর করে। তিলে তিলে দুজনের মাঝখানে এক প্রাচীর গড়ে উঠেছে। দুজনেরই অলক্ষ্যে। এ প্রাচীর বিরোধের নয়, মনান্তরেরও নয়, এ প্রাচীর অস্পষ্টতার। কাছের মানুষ ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে।

আরো এগিয়ে এল লীলা। শেখরনাথের খুব কাছে। একবার ইচ্ছা

হল, হাত দিয়ে শেখরনাথের এলোমেলো চুলের রাশ ঠিক করে দেয়। আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেয় কপালের ওপর জমে থাকা বিন্দু বিন্দু ঘাম। আদর যত্ন সেবায় আবার মানুষটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

পুরুষ মানুষের এ ভাবে ভেঙ্গে পড়লে কখন চলে! জমিদারি নিয়ে সব মানুষ জন্মায় না। টাকা পয়সা নিয়ে ছিনিমিনি খেলারও সুযোগ হয় না সকলের, কিন্তু তাই বলে হাল ছেড়ে এমন ভাবে বসে থাকে কেউ? শক্ত সবল পুরুষ, নিজের ভাগ্য নিজে গড়বে। সম্পদে যেমন, বিপদেও তেমনি, কিছুতে টলবে না। ভাগ্য বিপর্যয়ে ভয় পায় না লীলা। লালপাড় শাড়ীর আঁচল কোমরে জড়িয়ে সারা সংসারের কাজ নেবে মাথায় তুলে। কোন অসুবিধা হবে না। ভারি তো ক-টা লোকের সংসার। লীলার অসুবিধা হয়তো হবে না, অসুবিধা হবে শেখরনাথের। প্রজা শায়েস্তা করা হাতে কেরানীর কলম ধরবেন, তাও কখন হয়?

চিন্তার জাল ছিঁড়ে কুটি-কুটি। বাইরে প্রথমে একটু কাশির শব্দ তারপর গলার আওয়াজ, ছোট হুজুর আছেন?

এইটুকুই এখনও সম্বল। জমিদারী হাতছাড়া হয়েছে বটে, কিন্তু ওই সম্বোধনটুকু ঘুচে যায়নি সেই সঙ্গে। পথে ঘাটে লোকেরা এখনও ডাকে এই ভাবে, দণ্ডবৎ করে প্রথ ছেড়ে দাঁড়ায়।

কে? শেখরনাথ জানলা থেকে সরে এসে দাঁড়ালেন।

আজ্ঞে আমি তুলসী।

তুলসী! দত্ত সায়েবের খাস পেয়াদা। শহর থেকে সঙ্গে এসেছে।

পর্দা ঠেলে শেখরনাথ বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। ফিসফাস কথাবার্তা। তারপর দুজনেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে ফটকের পিছনে উধাও।

লীলা জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। শেখরনাথ জোর পায়ে এগিয়ে চলেছেন, পিছনে তুলসী। বাঁকের মুখে মোড় ঘুরতেই আর দেখা গেল না।

নিশ্বাস চেপে লীলা মুখ ফেরাল।

দরজার ওপরেই সতী দাঁড়িয়ে। একটা হাত দরজার পাল্লায় রাখা।

লীলা ফিরতেই মুচকি হাসল, ঠাকুরপো এসেই আবার বেরোল যে!

নীড় ভাঙা পাখি নীল আকাশে ডানা মেলে বেড়াতেই ভালবাসে। মাটি মানেই তো মায়া।

তোমার ওসব হেঁয়ালী বুঝি না বৌরানী। শিকলকাটা টিয়ে অথচ বাঁধবার কোন আয়োজন করছ না।

লীলা হাসল। সতীর দিকে এগিয়ে এল দু পা।

মন না বেঁধে শুধু পায়ে শিকল বেঁধে আর কি লাভ বল। ফাঁক পেলেই আবার পালাবে। লঘুছন্দে শুরু করলেও শেষদিকে লীলার গলার আওয়াজ বেশ ভারী হয়ে এল। চোখের কোণে জলের চিকচিকে ফোঁটা। মুখ ঘুরিয়ে আঁচল দিয়ে মুছে নিল চোখদুটো।

সকালে দুবার খুঁজে গেছি তোমাকে। দেখলাম ঠাকুরপোর সঙ্গে গল্প করছ।

গল্পই বটে! ঘরের কথা শোনবার কানই আছে যেন মানুষটার। কেবল উড়ু-উড়ু। ভাল করে লীলার মুখের দিকে চেয়েও কথা বলে না।

ভারি চমৎকার বন্দোবস্ত কিন্তু।

বন্দোবস্ত! কিসের! লীলা ভ্রূ কোঁচকাল।

ওই ওদের স্কুল। একটু জড়তা, সামান্য ইতস্তত ভাব। নিজের পরাজয়-কাহিনী বর্ণনার মতন দত্তসায়েবের স্কুলের কথা বলার মধ্যেও কোথায় যেন লজ্জা লুকোন রয়েছে।

গিয়েছিলে বুঝি?

হ্যাঁ, আজ সকালে গীতা এসেছিল। তার সঙ্গেই দেখে এলাম।

বুঝতে অসুবিধা হয় নি লীলার, তবু একবার জিজ্ঞাসা না করেও পারল না, গীতা কে দিদি?

সেই যে মেয়েটি এসেছিল সেদিন। ওই স্কুলের মাস্টারনী। সতী আরো এগিয়ে এল। খাটের কাছে। চোখে মুখে খুশীর চকচকে আমেজ। স্কুল ওর সত্যিই ভাল লেগেছে।

সেই কথাই সতী বলল। একটানা, একটু না থেমে।

ভারি চমৎকার কিন্তু। ছোট ছোট একপাল ছেলেমেয়েদের দল। পড়ার কি ঘটা। মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে কেউ নামতা পড়ছে, কেউ ছড়া। দত্ত সায়েবের বুঝি হুকুম কোন মাস্টার বেত হাতে করে ক্লাশে আসতে পারবে না। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে লেখাপড়া শেখাতে হবে। মার তো নয়ই, ধমক নয়, কড়া কথা পর্যন্ত নয়। লেখাপড়া ছাড়াও কাঠের কাজ, মাটির কাজ, মেয়েদের

সেলাই-ফোঁড়াই এসবের বন্দোবস্তও হবে। আরো নাকি মাস্টার আসবে শহর থেকে। গীতা বলছিল।

কথার মাঝখানে খেয়াল হল সতীর, খাটের বাজুতে হাত রেখে লীলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। এসবের একটি বর্ণ যে কানে ঢুকেছে, চোখমুখের চেহারায় তা বোঝা গেল না।

কি শরীর খারাপ নাকি? সতীর আচমকা প্রশ্নে লীলা মুখ ফেরাল। ছলছল ছুটি চোখ, ম্লান নিস্তেজ দৃষ্টি।

স্কুলের কথা ভাল লাগছে শুনতে?

লাগছে দিদি, কিন্তু যখনই মনে হচ্ছে মল্লিকবংশের ছেলেরা যেদিকটা উপেক্ষা করেছে, সেই দিকটা থেকেই নতুন মালিকরা শুরু করেছে তখনই যেন সব কিছু বিস্বাদ লাগছে। আমোদ-প্রমোদেই কেবল ডুবে রইল মানুষগুলো, প্রজা সে তো শুধু দেবে, পরিবর্তে তাদেরও কিছু চাইবার থাকতে পারে, এ কথা কেউ ভেবে দেখে নি।

এলোমেলো কথার জট। মাঝে মাঝে হেঁয়ালীর মতন। বুঝতে ভারি অসুবিধা হয় সতীর। কিন্তু আজ সত্যিই তার ভাল লেগেছে একপাল কচি কচি ছেলেমেয়েদের মাঝখানে ঘুরে বেড়াতে।

আসবার সময় গীতা দরজা অবধি এগিয়ে এসেছে। বলেছে, আসবেন মাঝে মাঝে। মতামত দেবেন। এদেশ আপনাদের, দেশের ছেলেমেয়ের যাতে ভাল হয়, দেখা আপনাদের কর্তব্য।

ভারি আশ্চর্য লেগেছিল সতীর। ওর মতামত! তার আবার দাম আছে নাকি! পাঁচিলঘেরা তিনমহলা বাড়ি। ঘোমটা ঢাকা দিয়ে পাল্কী চড়ে ঢুকেছিল বাড়ির মধ্যে। পালাপার্বণ ছাড়া বাইরে আসার সুযোগই হয় নি। দামী নানারঙের শাড়ী জড়িয়েছে দেহে, জড়োয়া গয়নার রাশ অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে, স্বচ্ছলতার পালে ভর দিয়ে সুখের দাঁড় বেয়ে চলা। তারপর দুর্যোগের কালবৈশাখীতে সব ওলোটপালোট। শুধু জাঁকজমক, শাড়ী গয়নাই নয়, কাছের মানুষটাও সরে গেল। সম্পদে যেমন নয়, বিপদেও তেমনি কেউ এগিয়ে আসে নি ওর মতামত নিতে। জমিদার-বাড়ির রেওয়াজও এ নয়। বাড়ির বৌ তো শাড়ী আর অলঙ্কারের পুঁটলী। দেহ আছে এই পর্যন্ত, মন আছে কিনা সে খোঁজ নেবার প্রয়োজন হয় নি। হাটে কেনা রঙে-চঙে মাটির পুতুল। ঘরের

শোভা ছাড়া আর কি! ওদেরও কিছু বলার থাকতে পারে, এ প্রায় অবিশ্বাস্য।

এতদিন পরে ওর মতামত চাইল মানুষ এইটুকুই আশ্চর্যের।

বাইরে জুতোর শব্দ হতেই সতী সরে গেল। শেখরনাথের পায়ের আওয়াজ। ঘরে ঢুকেই এক গাল হাসি, কি ব্যাপার! তখন থেকে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছ?

সে কথার উত্তর দিল না লীলা। মাথায় ঘোমটা তুলে দিল।

বেলা দুপুর গড়িয়ে এল। স্নান নেই, খাওয়া নেই কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ বল তো?

শেখরনাথ বসে পড়লেন খাটের ওপর। জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে হাসলেন ফিক করে, যাই বল তোমাদের দত্তসায়েব বেশ দিলদরিয়া লোক! কলিজা আছে বটে!

আমাদের দত্ত সায়েব?

ওই হল, তোমাদের, আমাদের সবাইয়ের। হুকুম দিলেন, বাছা বাছা ওস্তাদ সব এনে জড়ো কর। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।

শুনতে আর ভাল লাগে না লীলার। একঘেয়ে। বিতৃষ্ণা আসে। সুর আর সুরায় আকণ্ঠ ডুবে আছে মানুষটা। চেতনা নেই। পায়ের তলায় মাটি ধসে ধসে পড়ছে তবুও নয়।

লীলা আর সতী এদিকের ঘরে বসেছিল। খুকু আর একটু বড় হলেই তাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে স্কুলে পাঠাবে পড়তে, সতী তারই জল্পনা-কল্পনা করছে। হাত ধরে নিয়ে যাবে, যতক্ষণ খুকু স্কুলে থাকবে তার পাশে চুপচাপ বসে থাকবে, তারপর ছুটির ঘণ্টা পড়লেই বাড়ি নিয়ে আসবে।

হাত বাড়িয়ে সতী নিস্তারের কোল থেকে খুকুকে তুলে নিল। একমাথা ঝাঁকড়া চুলের রাশ, টানা দুটি চোখ, মোমের পুতুলটি। বুকের মধ্যে তাকে জাপটে আদরে সোহাগে বিব্রত করে তুলল।

ওই দেখুন বৌরানী, কাজল সারা গালে লেপটে গেল। আমি কিন্তু আর সাজাতে পারব না বলে দিচ্ছি। নিস্তার আপত্তির সুর তুলল।

সতী আঁচল দিয়ে খুকুর মুখ মুছিয়ে কি একটা উত্তর দিতে গিয়েই বাধা পেল। মোটরের হর্ণ। ব্রেক কষার যান্ত্রিক আর্তনাদ।

নিস্তারই প্রথমে দাঁড়িয়ে উঠল। বন্ধ জানলার খড়খড়ি ফাঁক করে উঁকি-ঝুঁকি দিল। এক নজরে দেখেই মুখ ফেরাল, ওই যে বৌরানী, দত্তসায়েবের নতুন গাড়ি। আলতাপানা রং, আর কি জেল্লা!

সতী আর লীলা দুজনেই উঠল। নিস্তারের পিছন দিয়ে দেখল চোখ কুঁচকে। মোটরের দরজা খুলে উর্দি পরা ড্রাইভার নেমে আসছে। পাকানো গোঁফ, লম্বা চওড়া জোয়ান চেহারা। একটু এগিয়েই দুটো পা জোড় করে কপালে হাত ঠেকিয়ে সশব্দে সেলাম। আর এগোল না। সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

এগিয়ে এলেন শেখরনাথ। সারাটা দুপুর ঘুমিয়েছেন। অবিন্যস্ত চুলের রাশ। আকব্জি সিল্কের জামা। কোঁচা মাটিতে লুটোচ্ছে। পায়ে সবুজ নাগরা।

সামনা-সামনি দাঁড়াতেই ড্রাইভার পকেট হাতড়ে চিঠি বের করে শেখরনাথের হাতে দিল। ছোট্ট চিরকুট, একবার চোখ বুলিয়েই শেখরনাথ ফিরে এলেন বাড়ির দিকে। লীলা আগেই দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, শেখরনাথ কাছে যেতেই বলল, কি ব্যাপার!

আলনা থেকে জামাটা দাও তো, শেখরনাথ সিঁড়ির চাতালে পা দিয়ে দাঁড়ালেন, দত্তসায়েব এত্তেলা পাঠিয়েছেন শুনে আসি।

লীলা বিরক্তিতে ভ্রূ দুটো কোঁচকাল, এত্তেলা পাঠালেই বুঝি ছুটতে হবে? ভরতপুর কিনে নিয়েছেন বলে, সেখানকার মানুষজনকেও হাতের মুঠোয় করে ফেলেছেন? কথায় কথায় সার দিয়ে দাঁড়াতে হবে সামনে?

শেখরনাথ মুখ তুললেন। বিকেলের রোদের কিছুটা চুলের ভাঁজে ভাঁজে, কিছুটা চোখের তারায়। কান দুটো লাল হয়ে উঠল। রোদের ছোঁয়ায় কিনা বোঝা গেল না। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা চেপে আস্তে আস্তে বললেন, তাই তো মনে হচ্ছে। আজ সকালে দেখলাম চণ্ডীডাঙার চাষীরা দাঁড়িয়েছে হাত জোড় করে। লাঙল ফেলে কোদাল ধরবে সব। তারই আর্জি। মাতঙ্গী নদীতে বাঁধ দেবার বন্দোবস্ত হচ্ছে। মজুর চাই, জোয়ান কুলিকামিনের দল, তাই সব দল বেঁধে এসেছে ঘরবাড়ি ছেড়ে। আজ আর খাজনা মকুব চায় না ওরা, কাজ চায়। দত্তসায়েবের পায়ের কাছে সার দিয়ে তাই দাঁড়িয়েছে। আমিও তাদের প্রায় পাশাপাশিই গিয়ে দাঁড়ালাম। ভরতপুরের ছোট হুজুর!

শেখরনাথ হেসে ওঠবার আগেই লীলা তাড়াতাড়ি জামাটা তুলে দিল তাঁর হাতে। শেখরনাথের খেদোক্তি সহ্য হয়, কিছু পরিমাণে শোকের আবেগও, কিন্তু তাঁর হাসি শুনলেই লীলার সারা গা শিউরে ওঠে। ফাঁকা ঘরে বাদুড়ের ডানা ঝাপটানর মতন, একটা অমঙ্গলের আভাস। হাসির ফাঁকে ফাঁকে যেন জমানো কান্না উজাড় করে দেওয়া!

শেখরনাথ শহরে বেরলেন দিন তিনেক পর। এ কদিন স্নান করবার, খাবার সময় ছিল না। ডাকের পর ডাক দত্তসায়েবের কাছ থেকে। চিরকুট নিয়ে তুলসীর আনাগোনা। সকাল বিকেল দত্তসায়েবের কাছে ছুটোছুটি, সারা দুপুর বসে হিসাব-নিকাশ। গাইয়ে আর তবলচিদের নামের লিষ্ট, বাইজীদের ঠিকানা, বড় বড় হোমরা-চোমরা লোকদের পাত্তা। মল্লিক-বাড়ির বাঁধান খাতা। এসব খবরে ঠাসবোঝাই। তাই থেকে শেখরনাথ টুকে নিলেন।

দূরে দাঁড়িয়ে লীলা সব দেখল! এসব ব্যাপারে আর জ্ঞান থাকে না মানুষটার। বোধ হয় মর্যাদাবোধও তলিয়ে যায় অতলে। নয়তো দত্তসায়েবের জলসার আয়োজনে এমন করে কোমর বেঁধে কেউ লাগতে পারে!

যাবার দিন সকালে লীলার ডাক পড়ল। সাজগোজ শেষ। জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে শেখরনাথ মুখ তুলে চাইলেন, এই যে শোন। আমার ফিরতে এবার হয়তো দেরি হবে। ঘোরাঘুরির ব্যাপার। দিনদশেকও হতে পারে আবার মাসখানেকও লেগে যেতে পারে। কিছু ঠিক নেই। টাকাগুলো রেখে দাও।

শেখরনাথের মুখের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে লীলা বিছানার দিকে চোখ ফেরাল। এক গোছা নোট। লাল সুতো দিয়ে জড়ানো।

নাও, তুলে নাও। দু-শ টাকা আছে। মাসখানেক চলে যাবার পক্ষে যথেষ্ট, কি বল? শেখরনাথ হাসির চেষ্টা করলেন।

কথার কোন উত্তর দিল না লীলা। নিচু হয়ে নোটের গোছা তুলে নিয়ে আঁচলে বাঁধল। তারপর খুব আস্তে বলল, হঠাৎ যদি দরকার পড়ে তোমায় কোথায় খবর পাঠাব?

ফিতে বাঁধা শেষ করে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন শেখরনাথ, লীলার কথায় চমকে মুখ তুললেন, হঠাৎ দরকার হবে? কেন?

মানুষের দরকারের কথা কিছু বলা যায়?

তা হয়তো যায় না, কিন্তু দরকারের সময় চাইলেই ঠিক জিনিসের খোঁজ পাওয়া যাবে এই বা কেমন কথা! ভাঙনের মুখে লীলার বাপের জমিজমা হাতে এলে সর্বনাশের কিছুটা হয়তো ঠেকান যেত কিন্তু তা তো হয় নি। জামাইকে পথে বসিয়ে কুলিকামিনদের মধ্যে জমিজমা বিলির ব্যবস্থা হল। কিন্তু ঠিকানার কি ঠিক আছে শেখরনাথের? হয়ত লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত ছুটতে হবে, সাসারাম থেকে বেনারস। বাইরে শেখরনাথের খবর আজো নিশ্চয় পৌঁছায় নি। ওস্তাদ আর বাইজীদের কাছে এখনও শেখরনাথ ভরতপুরের বিধাতা। গানের আসরে দামী রেশমের রুমালে বাঁধা টাকার তোড়া রূপোর থালায় পড়ে তাঁরই দৌলতে। আঙুলের ইসারায় মাঝপথে গান থেমে যায়, তবলচী বদল হয়। অবস্থা পালটানর খবর এখনও দেশের বাইরে বাইরে ছড়ায় নি। আসল মুক্তোর বদলে ঝুটো মুক্তোর বাহার, তালি দেওয়া অঙ্গাবরণ, যাত্রার নকল রাজার মতন টিনের তলোয়ার ঘোরাবেন শেখরনাথ। আসর মাত করতে পারবেন কিনা ঈশ্বর জানেন!

আমি কলকাতায় পৌঁছে চিঠি দেব। তাতেই ঠিকানা পাবে। কখন কোথায় থাকি ঠিক তো নেই। খুব দরকার পড়লে কলকাতার ঠিকানাতেই চিঠি লিখ। আমি খবর পাব।

কথা শেষ করে শেখরনাথ উঠে দাঁড়ালেন। গলায় আঁচল জড়িয়ে লীলা হেঁট হয়ে প্রণাম করল। মনে হল যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় পায়ে মাথা ছুঁইয়ে রইল। জলে-ভরা চোখদুটো মুছে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল অনেকক্ষণ পরে।

শেখরনাথ সোজাসুজি চাইলেন লীলার দিকে। হেসে বললেন, কি ব্যাপার?

ব্যাপার যে কিছু নয়, সে কথা বলতে গিয়ে ঝরঝর করে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল লীলার দুগাল বেয়ে। জল লুকোবার কোন চেষ্টাই করল না লীলা। আঁচল দিয়ে মোছার সামান্য প্রয়াসও নয়।

তোমার সেবায় আমি তুষ্ট। বর প্রার্থনা কর, শেখরনাথের মুখে হাসির আভাস।

শেখরনাথই আবার কথা বললেন। গরদের চাদরটা গায়ে জড়াতে জড়াতে।

খুকুকে একবার নিয়ে এস তো।

খুকুকে! সত্যিই তো, খুকুর কথা লীলার একটুও মনে নেই। প্রেম দিয়ে যাঁকে বাঁধার আশা কম, স্নেহের পাকে পাকে তাঁকে জড়ান কি সম্ভব! চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি!

খুকু পাশের ঘরেই ছিল। নিস্তারের কোলে। লীলা তুলে নিয়ে এল। জেগে থাকলেও বাপের কোলে যাবার বায়না ধরত এমন নয়। বাপের সঙ্গে আর কতটুকু আলাপ। দিনের মধ্যে কতক্ষণের জন্যই বা দেখতে পায়?

শেখরনাথ নিরীক্ষণ করে দেখলেন মেয়েকে। সন্তর্পণে ঘুমন্ত মেয়ের গালে চুমো খেয়ে বললেন, তোমার মেয়ে বয়সকালে সত্যি সুন্দরী হবে।

তোমার মেয়ে বুঝি নয়? লীলা আস্তে বলল।

আমারও, না? শেখরনাথ হাসলেন। আরো একটা কি বলতে গিয়েই থেমে গেলেন। লাল রঙের মোটর রাস্তার ওপর। ড্রাইভার নেমে দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে।

তোমার বোধ হয় ট্রেনের সময় হয়ে এল, লীলা সরে এসে দাঁড়াল জানলার ধারে।

না আজ আর ট্রেন ধরবার ঝামেলা নেই। একেবারে টানা মোটরে। তবু চলি, দেরি করে লাভ নেই। শেখরনাথ পর্দা সরিয়ে এগিয়ে গেলেন।

লীলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। জিনিসপত্র উঠল গাড়িতে। শেখরনাথ কোঁচা সামলে ভিতরে গিয়ে বসলেন। ড্রাইভার দরজা বন্ধ করে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। তারপরে আচমকা গর্জন। এক মুঠো ধুলোর ঘূর্ণি আর কিছু দেখা গেল না।

॥ পাঁচ ॥

সপ্তাহখানেকের মধ্যে লীলা অস্থির হয়ে পড়ল। জানলার কাছে ঘোরা-ফেরা। পাগড়ী মাথায় পিয়ন দেখলেই ছুটে গেল সিঁড়ির কাছ বরাবর। দরজার পাল্লা দুটো অল্প ফাঁক করে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখল। না, বাড়ি মাড়াল না পিয়ন। পাঁচিলের ধার ঘেঁষে দত্তসায়েবের অফিসে গিয়ে ঢুকল।

আশ্চর্য মানুষ তো। প্রতিশ্রুতির পরমায়ু বুঝি চৌকাঠ পর্যন্ত। কলকাতায় পৌঁছে চিঠি দেবে এমনই এক মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে সরে গেল সামনে থেকে। সারেঙ্গীর মিঠে স্বর আর তবলার বোলের শব্দে ফেলে আসা একটা মানুষের অসহায় কাকুতিও ডুবে গেল নিশ্চিহ্ন হয়ে।

জানলার গরাদ থেকে মাথাটা আস্তে তুলে লীলা নিস্তারের দিকে চেয়ে ক্লান্ত গলায় বলল, তুই একটা কাজ করতে পারিস নিস্তার ?

কি বৌরানী ?

দত্তসায়েবের অফিসে গিয়ে একবার খোঁজ নিতে পারিস কোন খবর এসেছে কিনা ?

তা কেন পারব না, ঘুমন্ত খুকুকে সাবধানে নিস্তার খাটের ওপর শুইয়ে দিল, তুলসীকে জিজ্ঞাসা করলেই খবর এনে দেবে। এখনই যাব একবার ?

সন্ধ্যার ঝোঁকে গিয়ে আর দরকার নেই, কালই বরং যাস। লীলা সরে এল জানলার ধার থেকে।

বৌরানী, ঘরের বাইরে সতী এসে দাঁড়াল।

কি দিদি ?

ঠাকুরপোর কোন খবর আসে নি ? চৌকাঠ ডিঙিয়ে সতী ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। লীলার পাশাপাশি।

না দিদি, ভাবছি নিস্তারকে কাল সকালে একবার দত্তসায়েবের অফিসে পাঠাব।

আঁচলের খুঁট আঙুলে জড়িয়ে কিছুক্ষণ সতী চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, এরা সবাই একরকমের। বাইরে গেলে আর পিছনের কথা মনে থাকে না। কোন ঠিকানাও দিয়ে যায় নি ?

লীলা ঘাড় নাড়ল, না। বলে গেছে চিঠিতেই ঠিকানা দিয়ে দেবে। কলকাতার ঠিকানা।

একটু অপেক্ষা করল সতী। খুকুর মশারি ফেলে দিয়ে নিস্তার বাইরে চলে গেল। আবছা অন্ধকার। দেয়ালগিরি আছে, ঝকমকে ঝাড় লণ্ঠন, কিন্তু ওসব আর জ্বালান হয় না। মাঝারী গোছের পেট্রোম্যাক্স কেনা হয়েছে। হীরু বাগ্‌দী সন্ধ্যার ঝোঁকে সেটাই জ্বালিয়ে দিয়ে যায়।

নিস্তার বেরিয়ে যেতেই সতী লীলার আরো কাছ ঘেঁসে বসল। প্রায় গায়ে গায়ে ছোঁয়াছুঁয়ি। স্বল্প হেসে বলল, কলকাতার ঠিকানা? সে তো কোন বাইজীর আস্তানা কিংবা তবলচীদের আড্ডা। সেখানে চিঠি হয়তো দেওয়া যায় বৌরানী, কিন্তু তার উত্তর পাওয়া যায় না।

কি জানি, লীলা খুব কষ্টে উচ্চারণ করল কথাগুলো, আমাকে তো যাবার সময় এই কথাই বলে গেল। তা হলে কি হবে দিদি। কথার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আর লীলা সামলাতে পারল না। অঝোর ধারায় গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। সত্যি কি হবে তা হলে? মানুষটা সরে যাওয়া মানে, সব কিছু সরে যাওয়া। কি নিয়ে লীলা বাঁচবে? কাকে নিয়ে?

পশুপতিনাথকে ডাকো ভাই, তিনি ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই।

কথা কানে যেতেই লীলা জানলা দিয়ে চোখ ফেরাল। সত্যিই যার কেউ নেই, তার তো পশুপতিনাথ রয়েছেন। ভরতপুরের মঙ্গল অমঙ্গলের প্রহরী। বন্যায়, দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে দলে দলে ভরতপুরের মানুষ ছুটেছে তাঁর মন্দিরে। আবালবৃদ্ধবণিতা, কোন বিচার নেই, ভেদাভেদ নেই। শক্ত পাথরের সিঁড়িতে মাথা কুটেছে মানুষ, দিনের পর দিন হত্যা দিয়েছে। মৃত্যু-ভয় সরিয়ে তিনি বরাভয় দিয়েছেন। তিন পুরুষ ধরে।

জানলা দিয়ে চেয়েই লীলা চমকে উঠল। পশুপতিনাথের মন্দির আর দেখা যায় না। দি ভরতপুর ইঞ্জিনিয়ারীং সিণ্ডিকেটের দু নম্বর কারখানা শুরু হয়েছে। দু তলা সমান উচু ষ্টিলের ফ্রেম। ইঁটের স্তূপ জড় হয়েছে। ঢেউ টিনের পাহাড়। মল্লিক-বাড়ি আর মন্দিরের মাঝখানে দত্তসায়েবের নতুন বাণিজ্যিক প্রচেষ্টা। তবু লীলা গলায় আঁচল দিয়ে সেই দিকে চেয়েই হাত জোড় করল।

এর চেয়ে ঠাকুরপো এখানেই কোন একটা কাজে লেগে গেলে পারত। চারদিকে কল কারখানা কত কি গড়ে উঠছে। সতীর গলা।

এ কথা লীলাও ভেবেছে। অনেকবার। কিন্তু ঠুনকো ইজ্জৎ আর ফাঁপা আভিজাত্য। সারাজীবন এই দুটো আঁকড়ে ধরে থাকবে মানুষ। তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাবে তবু নেমে আসবে না রাংতা-মোড়া মিথ্যা সিংহাসন থেকে। কি ভাববে ভরতপুরের প্রজা। দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা, সাতটা গাঁয়ের মালিক কলকারখানায় কলম পিষবে? তাকিয়া ঠেস দিয়ে আলবোলায় মুখ

ঠেকিয়ে জীবনটা অম্বুরী তামাকের মতন ছাই করে দেবে সেও ভাল, তবু প্রজাদের সঙ্গে মিশে বলিষ্ঠভাবে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করবে না। জীবন সম্বন্ধে এ হীন ধারণা, অলীক স্বপ্নের ঘোর কবে কাটবে মানুষের। দালান সৌধ সব হস্তান্তর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মালিকও ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে পড়বে মাটির ওপর, শেষ দিন পর্যন্ত ঝুটো মুক্তোর অলঙ্কার জড়িয়ে থাকবে! তাতেই ইজ্জৎ বাঁচবে প্রজাদের সামনে। সবাই বলবে, মাথা নিচু করেন নি হুজুর। মরদের মতন শেষ হয়ে গিয়েছেন।

মরদের মত শেষ হওয়া। বারবিলাসিনীর পদপ্রান্তে নিজেকে লুটিয়ে দেওয়া। সুরার ফেনিল উচ্ছ্বাসের স্রোতে নিজের ক্ষয়ে আসা দেহটাকে ভাসিয়ে দেওয়াটাই বুঝি পৌরুষ!

মা!

আচমকা ভারী গলার আওয়াজে চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল লীলার। হাত দিয়ে মাথার ঘোমটা একটু টেনে ঠিক হয়ে বসল।

কে?

আমি হীরু।

হীরু বাগ্দী। আলো জ্বালাতে এসেছে। আগে ছোট হুজুরের শিকারের সঙ্গী ছিল। বাইরে যাবার নাম শুনলেই নেচে উঠত। বন্দুক পরিষ্কার থেকে শুরু করে বল্লম টাঙ্গী সব ঠিকঠাক করে একেবারে তৈরী। বয়স হয়েছে আজকাল, তা ছাড়া হুজুরের শিকারের নেশা আর নেই। ওর বাপ বিদেশী বাগ্দীও শেষ বয়সে এই আলো জ্বালার কাজ করেছে। তখন অবশ্য সময় করে উঠতে পারত না। মহলে মহলে বেলোয়ারী কাঁচের ঝাড় লণ্ঠন, দেয়ালে দেয়ালগিরি, তা ছাড়া গেটের দুপাশেও বাতি জ্বালাতে হত। এক জোড়া পরী। হাতে মশালের ধরণের আলো। কাঁচের ঢাকনা খুলে আগুন ছোঁয়ালেই দপ করে জ্বলে উঠত। সে গেট আছে, পরীরাও রয়েছে, কিন্তু হাতের মশালগুলো চিড় খেয়ে গেছে, একটার কাঁচও চৌচির। ঠিক থাকলেও বাতি জ্বালাবার প্রয়োজন হত না। মল্লিক-বাড়ির আলোই নিভে গিয়েছে। এদিকে মানুষ আর মুখও ফেরায় না। হীরু বাগ্দীর কাজ এখন অনেক কম। এদিকে গোটা তিনেক পেট্রোম্যাক্স, দত্ত সাহেবের ওদিকে গোটা আষ্টেক। আর মাস দুয়েকের মধ্যে এ কাজও থাকবে না। দি ভরতপুর

ইঞ্জিনিয়ারীং সিণ্ডিকেট চালু হলেই বিজলী বাতি এসে পড়বে। হাঙ্গামা নেই, কল টিপলেই আলোয় আলো।

এস, বাতি জ্বালিয়ে যাও। সতী আর লীলা দুজনেই সরে সরে বসল। হীরু বাগ্দীর যাওয়ার পথ করে দিল।

ঘরে ঢুকেই হীরু হাত বাড়িয়ে দিল লীলার দিকে, ছোট হুজুরের একটা চিঠি এয়েছে মা। নতুন সায়েব দিলেন।

চিঠিটা লীলার হাতে দিয়েই হীরুর মনে পড়ল, চিঠি তো দিল কিন্তু এই অন্ধকারে মানুষ পড়বে কি করে চিঠির ভাষা। ঘন জঙ্গলে জন্তু জানোয়ারের চোখ জ্বলজ্বল করে তা অনেকবার হীরু দেখেছে, কিন্তু মানুষের বেলা তো তা নয়।

দাঁড়ান মা, বাতিটা আগে জ্বালিয়ে দি।

চিঠিটা হাতে আসতেই লীলার বুক কেঁপে উঠল। শুধু বুকই নয়, সারা শরীর। ভালো থাকে যেন শেখরনাথ। চিঠির খবর যেন ভাল হয়।

আগের দিন হলে আলো জ্বালতে দু মিনিট লাগত। লম্বা মশালটা একবার ঠেকিয়ে দিলেই হত। দপ করে জ্বলে উঠত। মেঝেয় সর্ষে পড়লে কুড়িয়ে নেওয়া যেত এমন আলো। আজকাল কিন্তু তা নয়। হাঁটু মুড়ে বসে হীরুকে পাম্প করতে হয় মিনিট দশেক। তারপর সোঁ সোঁ আওয়াজ। নীলচে আলোর ঝিলিক। একটু একটু করে আলো জ্বলে ওঠে।

চিঠিটা হাতে নিয়ে লীলা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। এত সাধনা করতে হয় সামান্য একটু আলোর ফুলকির জন্য।

অস্বস্তি যেন শুধু একলা লীলারই নয়। পাশে বসে সতীও হাঁপিয়ে উঠল। চিঠি লীলাই পড়বে কিন্তু তবু মানুষটার খবর তো পাওয়া যাবে।

আলো জ্বলে উঠতেই লীলা বাতির কাছে সরে এল। নামেই চিঠি। লাইন ছয় সাত। সম্বোধনের বালাই নেই। কলকাতায় পৌঁছে কাজে জড়িয়ে পড়েছিলেন, স্নান খাওয়ারই সময় ছিল না, থিতিয়ে জিরিয়ে চিঠি লেখা তো দূরের কথা। এ চিঠি লীলার হাতে পৌঁছবার আগেই শেখরনাথ কাশী রওনা হয়ে পড়বেন। বেনারসী বাইকে যেমন করে হোক পাকড়াতে হবে। তার ঠুংরী ছাড়া আসর কানা। তাকে আনতে না পারলে মুখ দেখান যাবে না দত্ত সায়েবের কাছে। বাড়ি ফিরতে শেখরনাথের আরো মাস খানেক। হঠাৎ

পয়সা-কড়ির দরকার পড়লে দত্তসায়েবকে জানালেই চলবে। ফিরে এসে শেখরনাথ হিসেব মিটিয়ে দেবেন।

ব্যস্। চিঠি শেষ। ঠিকানার নাম গন্ধ নেই কোথাও। জমিদারী সেরেস্তার নায়েবের চিঠির মতন। শুকনো কাজের কথা। মানুষজনের কুশল প্রশ্ন নয়, নিজের মঙ্গল অমঙ্গলের সংবাদও নয়। মনকে বোঝাল লীলা, না থাক সে সব। তবু তো মানুষটার খবর রয়েছে! কিন্তু আরো দু-এক ছত্রও তো লেখা যেত। লীলার কথা, অন্তত তাও না হোক, খুকু কেমন আছে সে খোঁজটুকু।

চিঠিটা কোলের ওপর রেখে লীলা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে।

কি ব্যাপার বৌরানী? খবর ভাল তো? সতী জিজ্ঞাসা করল। উদ্বেগ-আকুল স্বর।

এ কথার কোন উত্তর দিল না লীলা, কেবল কোল থেকে চিঠিটা তুলে নিয়ে সতীর হাতে দিল।

স্ত্রীকে লেখা চিঠি তাই হাতে তুলে দিলেও সতী একটু ইতস্তত করল। কিন্তু কিন্তু ভাব। কি লিখেছে মুখেই বলুক লীলা। ঠাকুরপোর খোঁজখবর। ভালই আছে বোধ হয়।

সতী আবার জিজ্ঞাসা করল, পড়ব চিঠিটা?

এত দুঃখেও লীলার হাসি এল। চিঠিটা পড়তে বুঝি সঙ্কোচ হচ্ছে সতীর। হায় রে, স্বামীর হৃদয় মেলে দেওয়া চিঠিই বটে!

পড়বার জন্যই তো দিলাম দিদি।

সতী ঘাড় হেঁট করে পড়ল চিঠিটা। একবার, দুবার, তারপর চিঠিটা ফেরত দিয়ে বলল, কোথাও ঠিকানা দেওয়া নেই। উত্তর যে দেবে এমন উপায় রাখে নি।

ঠিকানা দিয়েও তো লাভ ছিল না দিদি, তোমার ঠাকুরপো তো এক জায়গায় বসে থাকবে না। এমন একটা বিরাট কাজের ভার, চুপচাপ কলকাতায় বসে থাকলে চলে?

সতী কোন উত্তর দিল না। সব কথার বুঝি উত্তরও থাকে না। বাইরের নিঃসীম অন্ধকারে অনাগত দিনের অমঙ্গলের ছায়া। মন্থর বাতাসেও তারই আমেজ। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। পুরনো দিনের রং-চটা দৃশ্য সতীর চোখের

সামনে ভেসে উঠল। ঝলমলে ওড়না আর রঙিন কাঁচুলী আঁটা রুনি বাইজি। নৃত্যগীত আর মদিরার অফুরন্ত প্রবাহ। দুর্বার স্রোতে সব কিছু ভেসে চলেছে। কে খোঁজ রাখে চরের কিনারে দাঁড়ান দুটি নারীর বুক ফাটা আর্তনাদের।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। বাইরে থেকে নিস্তারের গলা পাওয়া গেল। কার সঙ্গে যেন কথা বলছে।

সতী উঠে দাঁড়াবার আগেই পর্দা নড়ে উঠল। নিস্তার এসে দাঁড়াল।

কি রে কার সঙ্গে কথা বলছিলি ?

মাস্টারনী এসেছেন, দেখা করতে চান আপনাদের সঙ্গে।

মাস্টারনী! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল সতীর। দত্তসায়েবের স্কুলের মাস্টারনী গীতা। এমন অসময়ে আবার দেখা করতে এলেন যে।

এমন সময়ে? কি চায় ?

তা কিছু বলেন নি বড় বৌরানী, কেবল, দেখা করতে চান।

বেশ পাঠিয়ে দে এখানে। লীলাই কথা বলল। তবু তো কিছুটা সময় কাটবে। একঘেয়ে সময়ের যেন আর অন্ত নেই। দিনের পর দিন একটানা। কোন বৈচিত্র্য নেই জীবনে, নতুন কিছু নয়। কেবল সর্বনাশের জন্য রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা। কবে এই একঘেয়েমীরও নিঃশেষে সমাধি হবে। সব কিছুর অবসান।

নিস্তার বেরিয়ে যাবার একটু পরেই গীতা এসে দাঁড়াল। হাত তুলে নমস্কার করল দুজনকে। হেসে বলল, একটু বিরক্ত করতে এলাম আপনাদের।

সতী হাসল, মানুষের বাড়ি মানুষ এলে বিরক্ত হয় নাকি কেউ। কি ব্যাপার বলুন তো ?

গীতা এগিয়ে এল দুজনের কাছাকাছি। হাতের ব্যাগ খুলে সাদা একটা কার্ড বের করে সামনে রেখে বলল, কাল আমাদের নতুন স্কুল খোলা হবে। বেলা পাঁচটায়। সিণ্ডিকেটের বেলা এসেছিলেন এস, ডি ও সায়েব, এবার আসছেন শহরের কলেজের প্রিন্সিপাল। খাস ইংরেজ। দত্তসায়েবের নিবেদন আপনারা যাবেন দয়া করে।

এমন ব্যাপারে অন্তঃপুরিকারা যাবে কি করতে? আরো দু-একবার কোন মেলার সময় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসেছিলেন প্রদর্শনী খুলতে, শেখরনাথ গিয়েছিলেন

ঘোড়ায় চেপে। কিন্তু লীলা আর সতীর যাবার কথা কেউ ভাবে নি। মিটিংয়ে যাবে পুরুষরা। বিশ রকম লোকের ভিড়ে বাড়ির বৌ যাবে কেন!

আপত্তির কারণটা গীতা বোধ হয় বুঝল। লীলার দিকে চেয়ে বলল, মেয়েদের চিকের বন্দোবস্ত আছে। তা ছাড়া এ তো বাড়ির পাশে। এক দেয়াল, এক বাড়ি বললেও হয়। দয়া করে যদি পায়ের ধুলো দেন, আমরা বিশেষ কৃতার্থ হব। দত্তসায়েব বার বার আমায় বলে দিয়েছেন। শেখরনাথবাবু থাকলে, সায়েব নিজেই আসতেন নিমন্ত্রণ করতে।

শেখরনাথবাবু! চমকে উঠল লীলা। ছোট হুজুর, ছোট বাবু, বাছাই করা সম্বোধন! নাম ধরে পুরোহিত আর পিসি ছাড়া আর কাউকে লীলা ডাকতে শোনে নি। কিন্তু গীতা তো আর প্রজা নয় ছোট হুজুরের। বাকি খাজনা মকুব করার আবেদন নিয়েও এসে দাঁড়ায় নি। হাতজোড় করে ইনিয়ে বিনিয়ে কেনই বা বলবে কথা।

সাড় হতে লীলা শুনল সতী বলছে, মেয়েদের আলাদা বন্দোবস্ত থাকলে তো অসুবিধা নেই। আমরা যাবার চেষ্টা করব।

বিকালের দিকে আমি নিতে আসব আপনাদের। এই ধরুন পৌনে পাঁচটা নাগাদ। কথার শেষে আবার হাতজোড় করল গীতা, চৌকাঠ পার হ'তে হ'তে বলল, ওই কথাই রইল কিন্তু। তৈরী হয়ে থাকবেন।

দুপুর পর্য্যন্ত লীলা মন একরকম ঠিক করেই ফেলেছিল। যাবে না, হাজার চিকের বন্দোবস্ত থাক, থাক মেয়েদের আলাদা ব্যবস্থা। এ সভায় যোগ দেওয়ার পিছনে কোথায় একটা অসম্মানের কাঁটা বিঁধে রয়েছে, অপমানের কালি। মল্লিক-বাড়ির বৌরা দেখুক এসে কি করে ভরতপুরের নিঃশেষিত প্রাণ-শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করতে হয়। দেনার দায়ে যে মৌজার পর মৌজা পরহস্তগত, কিভাবে সদ্গতি করতে হয় তার। শিক্ষায়, শ্রমে নতুন ভরতপুর গড়ে উঠবে, নতুন মানুষ। সোনার কাঠি হাতে পেয়েও মল্লিকবংশ দিনের পর দিন যেখানে প্রাণসঞ্চার করতে পারেন নি, নতুন মালিকেরা সেখানে নতুন জীবন এনেছেন, কর্মশক্তির অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা। স্কুল, দি ভরতপুর ইঞ্জিনীয়ারিং সিণ্ডিকেট, মহামায়া তাঁত শিল্পালয় তো এই সবেরই প্রকাশ।

বিকাল গড়াতেই লীলা মত বদলাল। ভবিষ্যৎ অজানা। ভরতপুরেই সারাটা জীবন কাটবে। নতুন জায়গায় নতুনভাবে কখনও ঘর বাঁধতে পারবে

এমন আশা কম। হয়তো এক সময়ে দত্তসায়েবদেরই কোন ঘরের ভাড়া গুনতে হবে। বসতবাটীর এ অংশটুকু ঝড়ের মুখে কুটোর মতন কোথায় উড়ে যাবে একদিন। কাজেই মিলে মিশে থাকাই ভাল। দত্ত সায়েবদের যে প্রচেষ্টাটুকু মানুষের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত তাতে যোগদান করতে বাধা থাকা উচিত নয়।

সতী প্রায় বিকাল থেকেই তৈরী। কেবল গীতা আসার অপেক্ষা। লীলার ঘরে ঢুকেই সতী অবাক। চুপচাপ কি একটা বই নিয়ে লীলা বসে আছে। আলুথালু চুল, অসংবৃত পোশাক। অথচ সময়ও তো আর হাতে নেই।

এ কি বৌরানী, এখনও সাজগোজ কর নি।

বই মুড়ে লীলা উঠে পড়ল। পরনের আগোছাল শাড়িটা হাত দিয়ে ঠিক করতে করতে বলল, সাজগোজ আর কি করব, এই তো বাড়ির পাশে।

সতী এগিয়ে এসে লীলার খুব কাছে দাঁড়াল। একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করল লীলাকে, তারপর বলল, যতো কাছেই হোক, সাদামাটা ভাবে তোমার যাওয়া চলে না!

আশ্চর্য হয়ে গেল লীলা। কেন এরা বোঝে না। ঝলমলে পোশাক আর মহার্ঘ্য অলঙ্কারে মানুষের বাইরের রূপটাই হয়তো প্রকাশ পায় কিন্তু তার হারানো সম্ভ্রম আর মর্যাদাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। মল্লিকবাড়ির ছোট বৌরানী! সেজেগুজে পাটরানীর আসনে বসেছেন। কি রূপের জেল্লা, কি পোশাকের বাহার। ভরতপুরের প্রজারা নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত। কিন্তু সে দৃষ্টি নিছক ঝকঝকে আভরণের জন্যই নয়, অঙ্গাভরণের সঙ্গে জড়িত ছিল মল্লিকবাড়ির আভিজাত্য। আজ ভরতপুরের মাটির সঙ্গে মিশেছে মল্লিক-বাড়ির সম্ভ্রম! হৃতগৌরব মানুষের সাজ-পোশাক আজ শুধু লজ্জারই দ্যোতক, অমর্যাদার নিশানা।

খুব সেজেগুজে যাওয়াটাই কি ঠিক হবে দিদি, আগের দিনের মতন? তীক্ষ্ণ গলার স্বর লীলার। সে আওয়াজে সতী চমকে উঠল। একটু পরেই সতী সামলে নিল নিজেকে, আস্তে বলল, অবস্থা পড়তির মুখে কিন্তু বৌরানী সারা গাঁ ঝেঁটিয়ে প্রজারা এসে জড়ো হবে, তাদের সামনে খেলো পোশাকে যাওয়াটা কি ঠিক?

বেঠিকই বা কোন হিসেবে দিদি? আগে উৎসবের কেন্দ্র ছিল মল্লিক-বাড়ি,

তাই সে বাড়ির সম্পদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেদেরও সাজতে হত, আজকের উৎসব কিন্তু দত্তসায়েবের নতুন শিক্ষায়তনকে ঘিরে, মল্লিক-বাড়ির নামগন্ধও সেখানে নেই। অন্য প্রজাদের মতন আমরা তো আজ শুধু দর্শক। অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে থাকা উচিত আমাদের। অপমানের কালি তো রয়েইছে দিদি, আবার মণিমুক্তার কাঁটা জড়াব কোন লজ্জায়।

সতী আর কথা বাড়াল না। চুপচাপ বসে রইল খাটের কোণে। পরতে গিয়েও কি ভেবে লীলা একেবারে সাধারণ শাড়ী অঙ্গে জড়াতে পারল না। দুধ-সাদা শাড়ি, জরির-কাজ-করা, তাই পরল। সেই রংয়েরই ব্লাউজ। গলায় দু ছড়া মুক্তার মালা দোলাল, দু কানে মুক্তার ইয়ারিং। মণিবন্ধে জড়োয়া চুড়ি। শুচি শুভ্র পোশাক। মুখে পাউডারের হালকা প্রলেপ বুলিয়ে এ ঘরে আসতেই সতীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। সতীর দু চোখের দৃষ্টিতে প্রশংসার ছিটে। শোবার ঘরে দেয়াল-আয়নায় নিজেকে দেখেছে লীলা, যাচাই করেছে। মন ভেঙে পড়েছে, সুখ নেই অন্তরে, কিন্তু একটু ভাঙন ধরে নি দেহে। প্রথম যৌবনের কূল-ছাপিয়ে-ওঠা রূপের ঢেউ আজ শান্ত, সমাহিত। কানায় কানায় পূর্ণ। স্রোতের ভয় নেই, নিশ্চিন্তে বুঝি অবগাহন করা যায়। এ রূপ দাহ জাগায় না মনে, কালবোশেখীর বিদ্যুৎ-দীপ্তি-স্ফুরিত সৌন্দর্য নয়, আষাঢ়ের টলটলে মেঘের স্তবক। ঝঞ্ঝা আনে না, আনে বর্ষণ।

তোমার রূপের তুলনা নেই বৌরানী। সতী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

খোঁপা সামলে সাবধানে মাথায় ঘোমটা দিতে দিতে লীলা আড়চোখে সতীর দিকে চেয়ে দেখল। মুচকি হেসে বলল, এমন রূপ সত্যি তুমি কারুর দেখ নি দিদি?

না, কারুর নয়, সতী ঘাড় নাড়ল।

রুনি বাইজীরও নয়?

আচমকা ভুমিকম্পে ঘরের মেঝে চৌচির হয়ে ফেটে গেলেও বোধ হয় এমন করে সতী নিজেকে বিপন্ন মনে করত না। সারা মুখের রক্ত উধাও। পাংশু আভা। কাগজের মতন সাদা দু ঠোঁটের রং। একি মর্মান্তিক রসিকতা। তুলনা করার বুঝি আর লোক পেল না লীলা। মিনিট কয়েক, তারপর আস্তে আস্তে সতী ঘোর কাটিয়ে উঠল। বলল, না বৌরানী, রুনি বাইজীরও নয়।

তা হলে ভয় কিসের দিদি? এমন করে কুঁকড়ে রয়েছি কেন আমরা? লীলা সতীর আরো কাছে এগিয়ে এল। একেবারে গা ঘেঁষে।

উত্তর দিতে গিয়েই সতী থেমে গেল। দরজার কাছে গীতা এসে দাঁড়িয়েছে।

চলুন, সময় হয়ে গেছে।

মাঝখানে এক ফালি বাগান। তারপরই ছোট্ট সড়ক। মল্লিক-বাড়ির অন্তঃপুর আর দি ভরতপুর ইঞ্জিনিয়ারিং সিণ্ডিকেটের মধ্যে যোগসূত্র। রাস্তাটুকু পার হয়েই দুজনে হকচকিয়ে গেল। গতবারের মতন গানবাজনার আয়োজন নেই, হৈ হল্লা চীৎকার নয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে দু পাশে। মেয়েদের পরনে বাসন্তী রংয়ের শাড়ি, ছেলেদের সাদা জামা-ধুতি! চেয়ার-টেবিল নয়, হলজোড়া জাজিম। প্রায় লোকে পূর্ণ। বাঁ দিকটা চিক-ফেলা।

এ পাশ দিয়ে ঘুরে চিকের মধ্যে ঢুকেই দু বৌ অবাক। সামনের দিকে ভেলভেটের লাল তাকিয়া। সেখানে কাউকে বসতে দেওয়া হয় নি। ভিড় পিছনের দিকে। লোক সরিয়ে গীতা ওদের দুজনকে একেবারে সামনে নিয়ে এল। দুটো তাকিয়া এগিয়ে দিয়ে হেসে বলল, বসুন আপনারা।

তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসা মাত্র দুটি মেয়ে এল। একজনের হাতে রুপোর থালায় স্তূপীকৃত পান, রাংতা-মোড়া, আর একজনের হাতে সুগন্ধি আতরদান।

মিনিট কয়েক, তারপরেই বাইরে মোটরের হর্ন। লোকেদের মধ্যে একটা আলোড়ন। পিছনে ফিরে ফিরে অনেকেই দেখতে লাগল। দীর্ঘাকৃতি এক সায়েব, আগুনের মত রং, মাথার চুল বকের পালকের মত সাদা, লম্বা চাপকান পরা, সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে এলেন। ঋজু বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ঠিক তাঁর পিছনেই দত্ত সায়েব। আজ আর বিলিতী পোশাক নেই অঙ্গে। গরদের পাঞ্জাবি, কোঁচানো ফরাসডাঙা ধুতি, গলায় মালার ধরণে গরদের চাদর জড়ানো। পথ করে সায়েবকে নিয়ে বেদীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। ছোট্ট একটি মেয়ে এগিয়ে এসে ফুলের মালা পরিয়ে দিল সায়েবের গলায়। হাততালির শব্দ। ভিড়ের মধ্য থেকে ভট্টাচার্য মশাই উঠে এলেন। মল্লিক বংশের কুল-পুরোহিত

বংশপরম্পায়। লীলার মনে পড়ল বিয়ের সময় ইনিই বরকনেকে নিয়ে হল ঘরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন পূর্বপুরুষদের তৈলচিত্রগুলোর সামনে। শেখরনাথের কৃতী পূর্বতন পুরুষদের আলেখ্য ছিল এই হল ঘরেই।

যখন খেয়াল হল লীলার, তখন ভট্টাচার্য মশাই সুমধুর ছন্দে মঙ্গলাচরণ শুরু করেছেন। সংস্কৃত ভাষায়। গ্রামের কল্যাণ হোক, কল্যাণ হোক গ্রামবাসীদের। মঙ্গলময় দেবতা প্রতিষ্ঠিত হোন আজকের এই অনুষ্ঠানে। তারপর দত্ত সায়েব দু-চার কথা বললেন। এই শিক্ষায়তনের উদ্দেশ্য আর আদর্শ সম্বন্ধে। সবশেষে সভাপতির ভাষণ শুরু হল ইংরেজী ভাষায়।

এতক্ষণ অন্যদিকে চোখ ফেরাবার অবকাশ পায় নি লীলা, এবার চোখ ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখল। আশে পাশে তাকিয়া ঠেস দিয়ে আরো দু-একটি মহিলা এসে বসেছেন। দামী শাড়ি আর মহমূল্য অলঙ্কার। আগে এঁদের দেখেছে বলে লীলা মনে করতে পারল না। এঁদের মধ্যে হয়তো আছেন ম্যাজিষ্ট্রেট গৃহিনী কিংবা এস ডি ও সায়েবের জায়া। সহর থেকে আসা হোমরা চোমরা লোকদের পরিবার।

চিকের মধ্যে দিয়ে বাইরের দিকে চোখ ফিরিয়েই লীলা দেখল দত্ত সায়েব এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। দৃষ্টির লক্ষ্য সতী। চোখ ঘুরিয়ে লীলা সতীকে দেখল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই সতীর! একটা হাতে গালে ঠেকিয়ে সামনের দিকে চেয়ে রয়েছে। আসরের সামনে এক পাল ছোট ছেলেমেয়ে যেখানে ভিড় করেছে, ঠেলাঠেলি করছে, দৃষ্টি সে দিকে।

কিছু বলবে বৌরানী?

চল এবার উঠি। ইংরেজী বক্তৃতা এক বর্ণ তো বুঝতে পারছি না মিছামিছি বসে লাভ কি!

না, বসে আর লাভ কি, সতী আমতা আমতা করল। দেখো বৌরানী, ছোট ছেলেমেয়েগুলো কি দুষ্টুমিই করছে। কচি কচি হাত দিয়ে কেবল ঠেলাঠেলি আর ধাক্কাধাক্কি। খুকুকে এনে ওদের মাঝখানে বসিয়ে দিলে বেশ মজা হত না।

লীলা হাসল। অতৃপ্ত কামনা, অপূর্ণ জীবনের স্বাদ। কি পেয়েছে সতী! কতটুকু! অবদমিত যৌবনের উদগ্র কামনা। শুরুতেই শেষ। সীমন্তের সিঁদুর মোছাই তো নয়, জীবন থেকে সব কিছু রং আর রসও নিঃশেষে মুছে ফেলা।

ব্রহ্মচারিণীর জীবন। বিবর্ণ অতীত আর অন্ধকার ভবিষ্যত, এই তো জীবনের পরিধি।

কিন্তু সর্বনাশের সীমা নেই। সামাজিক বাধা-নিষেধের বেড়া তো রয়েছেই আরো রয়েছে রক্তলোভী শ্বাপদের দল। ছলে বলে কৌশলে কুক্ষিগত করার অপচেষ্টা। প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে শিকারকে আয়ত্তে আনা।

আবার লীলা চিকের বাইরে চেয়ে দেখল। দত্ত সায়েবের দৃষ্টি অন্যদিকে। মনোযোগ দিয়ে বক্তৃতা শোনার ভান করছেন। কিন্তু এ শুধু সাময়িক। আবার ঘুরে ফিরে চিকের অন্তরালেই দৃষ্টি চালনা করবেন। সে রাতের কথাও লীলা ভোলে নি। দি ভরতপুর ইঞ্জিনিয়ারিং সিণ্ডিকেটের উৎসবের দিন। নির্নিমেষ চাউনি, মানুষটার কামনার উলঙ্গ রূপই ফুটে উঠেছিল দু চোখের দৃষ্টিতে। জমিজমা আর বসতবাটী পার হয়ে অন্তঃপুরে পড়েছে দত্ত সায়েবের দৃষ্টি। কর্মী পুরুষ, কোন কাজই অসম্পূর্ণ রাখেন না।

চল, উঠি দিদি, আর ভাল লাগছে না। কথার সঙ্গে সঙ্গে লীলা উঠে দাঁড়াল। ভিড় কাটিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল। পিছন পিছন সতী।

চাতালের কাছে গীতার সঙ্গে দেখা। আর একটি ভদ্র মহিলার সঙ্গে কথা বলছিল ওদের দেখে সামনে এসে দাঁড়াল, একি, এরি মধ্যে চলে যাচ্ছেন? একটু মিষ্টি মুখ করে যেতে হবে।

লীলা বলল, আজ আর দেরী করতে পারব না। খুকুকে ঘুম পাড়িয়ে এসেছি। উঠে আমাকে না দেখতে পেলে কান্নাকাটি শুরু করবে।

গীতা সঙ্গে সঙ্গে দু-এক পা এগোল। সিঁড়ির কাছ বরাবর এসে বলল, কেমন লাগল বলুন?

এবার সতী উত্তর দিল, খুব ভাল লাগল। একটা কাজের মতন কাজ করছেন আপনারা। কচি কচি ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা এখানে এর আগে আর হয় নি। মহৎ প্রচেষ্টা।

গীতা হাসল। প্রশংসার স্বরটুকু ভাল লাগবারই কথা, বিশেষ করে শিক্ষায়তনের উদ্বোধন উৎসবে।

বাগানে পা দিয়েই দুজনে অবাক।

হারু বাগ্দী দাঁড়িয়ে আছে সড়কের মাঝখানে। মাথায় আগের দিনের মতন রঙীন কাপড়ের ঝালর, নীল কোর্তা জরদ রংএর ফুল বসান। পায়ে তালি

মারা নাগরা। পরনের কাপড়ও অটুট নয়। হাতে বাঁশের তেল-চুকচুকে লাঠি। ওদের দেখেই লাঠি কাঁধে করে এগিয়ে চলল। আগের কালের মতন ঠিক যেমন ভাবে মল্লিক বংশের পুরনারীদের নিয়ে পাল্কীতে পৌঁছে দিত। চারজন বরকন্দাজের সঙ্গে হীরুও থাকত। বাবুর খাস পেয়াদা।

চোখ ভরে দেখল লীলা। পুরোনো দিনের সমারোহের রিক্ত অবশেষ বিবর্ণ ঝালর, শতচ্ছিন্ন পরিচ্ছদ তবু ঋজু চলার ভঙ্গী, দৃপ্ত পদক্ষেপ। মল্লিক বংশের হারিয়ে যাওয়া বর্ণ-মলিন এক দৃশ্যকে রূপ দেবার প্রচেষ্টা।

ঠিক বুঝল লীলা, কারুর নির্দেশ নয়, এমন একটা সুযোগ হেলায় হারাতে চায় নি হীরু। নিজেই সেজেগুজে এসে দাঁড়িয়েছে অপেক্ষায়। মাত্র আট ফুট সড়কের ব্যবধান। দেহরক্ষীর কোনই প্রয়োজন নেই, কিন্তু দূরত্বই কি সব! মল্লিক-বাড়ির মেয়েরা বিনা রক্ষীতে এক পা কখন যেতে পারে!

সবই তো নিশ্চিহ্ন। অতীতের জাঁকজমক, আনন্দ, উৎসব সব শেষ। কিন্তু হীরু তো এখনও শেষ হয় নি। অনেক বছরের নিমক খেয়েছে, অনেক দিন কাটিয়েছে মল্লিকবাড়ির স্নেহচ্ছায়ায়। কিছু যে ভোলে নি তা তার আজকের চলাফেরায় প্রমাণিত হল।

বাধা দিতে গিয়েও লীলা পারল না। নিজে সেজে যখন যেতে পেরেছে দত্ত সায়েবের উৎসবে তখন হীরুর আর অপরাধ কি। দুজনের পোশাকের মধ্যে মিল রয়েছে যে, হয়তো দুজনের চিন্তাধারার মধ্যেও।

ছয়

পরের দিনই আবার গীতা এসে হাজির। সতীর কাছে। কষ্ট করে তারা আগের দিন দুজনে যে উৎসবে গিয়েছিলেন সেজন্য দত্তসায়েবের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আগাগোড়া ব্যাপারটা কেমন লেগেছে তাই খবর নিতে গীতা এসেছে। এমন একটা কাজে ভুলত্রুটি তো হয়ই। সেগুলো যেন নিজগুণে ক্ষমা করেন।

লীলা কোণের দিকে চুপচাপ বসে ছিল। সকাল থেকে মেয়েটার জ্বরের মত হয়েছে। অনবরত কান্না। মাকে ছেড়ে আর কারো কাছে থাকবে না।

নিস্তার অনেক চেষ্টা করেছে ঘুম পাড়াবার। পারে নি। এইমাত্র মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে লীলা এ ঘরে এসে বসেছে। বিকেলের দিকেও যদি জ্বর না ছাড়ে তা হলে নিস্তারকে দিয়ে একবার কালীনাথ ডাক্তারকে খবর পাঠাবে।

গীতার কথায় মুখ তুলে একবার চাইল। উৎসাহের অন্ত নেই দত্ত সায়েবের, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবর নেবার আগ্রহ। বিরাট কর্মপ্রচেষ্টা। শুধু ভরতপুর ঝেঁটিয়েই নয়, বাইরে থেকেও প্রচুর লোক এসে জমেছিল। শিক্ষা বিস্তারের মহৎ আয়োজনে দত্তসায়েবের কল্যাণ কামনা করে। সকলের কাছেই কি দত্তসায়েব দূতী পাঠিয়েছেন এই ভাবে! না এই দূতীগিরির বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। দু হাতে সম্পদের কণা ছিটিয়ে দিয়েছেন এধারে ওধারে, বসে বসে দেখছেন কেমন করে লোকে খুঁটে খুঁটে সে কণা মুখে তোলে। পরিতৃপ্তির নিশ্বাসের পাশাপাশি কিছুটা ঈর্ষার উদ্গার। সোনার কাঠি মল্লিক বংশের হাতেও তো ছিল, এক-আধ দিন নয়, বছরের পর বছর। কিন্তু কোথাও প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা হয় নি। সম্পদ ব্যয়িত হয়েছে সামন্ততন্ত্রের লালসার পুষ্টি সাধনে। ব্যক্তিগত ভোগে আর বিলাসে। সে সোনার কাঠি আজ হস্তান্তরিত। ব্যক্তিগত স্বার্থের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়ানো জাতির স্বার্থও। শিল্পে, বাণিজ্যে, লোকশিক্ষায় প্রাণশক্তির স্ফুরণ। এই মহা-যজ্ঞে মল্লিক-বাড়ির কোন অংশ নেই। দর্শকের দূরবীন চোখে শুধু নিস্পন্দভাবে আলোড়নটুকু দেখার পালা। মল্লিক বংশের অন্তঃপুরবাসিনীদের কাছে তারই সংবাদ নিতে পাঠিয়েছেন দত্তসায়েব। যে রত্ন হেলায় তাঁরা ছুঁড়ে ফেলেছেন পথের ধুলোয়, তারই ছোঁয়ায় অজগর-শক্তির বিকাশ সাধন সম্ভব হচ্ছে। এই সত্যটুকু যে উপলব্ধি করেছে সেইটুকু স্বীকার করুক। দত্তসায়েবের কাছে ও স্বীকৃতিটুকুরও দাম অনেক।

আপনাদের দত্তসাহেব সকলের কাছে বুঝি এমনি লোক পাঠাচ্ছেন? লীলা হঠাৎই জিজ্ঞাসা করে ফেলল।

কথাটার পিছনে হয়তো ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ হুল ছিল, কিন্তু সেদিকটা গীতা সম্পূর্ণ-রূপে উপেক্ষা করল। হেসে বলল, সকলের কাছে লোক পাঠানো তো সম্ভব নয়। তবে কাছাকাছি যাঁরা তাঁদের মতামত নিচ্ছেন বৈ কি। দত্তসাহেব বলেন, এরকম একটা প্রচেষ্টায় পাঁচজনের মত নিতে হয়। শুধু একলার মতে কিছু করতে গেলে সেটা স্থায়ী হয় না।

কথাগুলো গীতা হয়তো সোজাভাবেই বলেছে। কিন্তু কোথায় একটা খোঁচ ছিল। লীলার ত্বকে গিয়েই সেটা বিঁধল না, ফোঁটা ফোঁটা রক্তও ঝরল। এতদিন ভরতপুরে শুধু একটা মতই চলে এসেছে, একটা মানুষের ইচ্ছা। কারো দিকে চাইবার প্রয়োজন হয় নি, কারো দুঃখদরদে নজর দেবার অবকাশ নয়। বছরের পর বছর শুধু খাজনা পৌঁছে দেওয়া জমিদারের ভাণ্ডারে। কেমন করে রক্তক্ষরা জীবনের মাধ্যমে সে অর্থ জমা হল তার ইতিহাস জানবার দরকার হয় নি। চুলচেরা হিসাব। হৃদয়ের কারবার নয়, সহানুভূতির মিশেলও না। নিছক নির্মম দান-প্রতিদানের খেলা। অর্থের পরিবর্তে প্রজাস্বত্ব। নয় তো শুধু তর্জনী-চালনার কারসাজি। জনার্দন নায়েবের ইঙ্গিতে বৈশ্বানরের তাণ্ডব নর্তন। ভিটে মাটি খেত খামার আশা আকাঙ্ক্ষা সবই পর্যবসিত কয়েক মুষ্টি ভস্মে।

সতী কথাটার সোজা মানেটাই বুঝল। বলল ঠিক কথাই তো। যে কোন কাজই দশে মিলে করা উচিত বই কি। আপনাদের স্কুলের ব্যাপারটা সত্যিই আমার খুব ভাল লেগেছে। কাজের মত কাজ আপনারা করছেন! এরাই তো দেশের ভবিষ্যৎ। এদের ঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারলে তবেই তো দেশের সত্যিকারের মঙ্গল হবে। এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে সতী হাঁপাতে লাগল। এগুলো ওর মনেরও কথা। একটু মিথ্যার ভেজাল নেই। কাল রাত্রেও শুয়ে শুয়ে ভেবেছে। যদি লেখাপড়া শিখত সতী। অন্তত ছোটদের শেখাবার মতনও কিছু, তা হলে দত্তসায়েবের স্কুলেই ভর্তি হয়ে যেত। একপাল ছেলেমেয়েদের নিয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিত।

মাঝে মাঝে সুযোগ পেলেই চলে যাবেন। এই তো ঘরের পাশে। শুধু লেখাপড়া ছাড়া মাটির খেলনা, কাঠের কাজ, তাঁত চালানো নানা রকম শেখানো হবে। আপনাদের ভালোই লাগবে। গীতা সতীর দিকে চেয়ে বলল।

যাব নিশ্চয়ই যাব।

গীতা হঠাৎ লীলার দিকে মুখ ফেরাল। চেয়ে চেয়ে দেখে বলল, আপনার চেহারা যেন শুকনো শুকনো লাগছে। শরীর খারাপ নাকি?

মেয়েটার জ্বর হয়েছে সকাল থেকে। খুব আস্তে লীলা উত্তর দিল। প্রায় ফিসফিসিয়ে।

জ্বর? আপনি যদি বলেন তো ডাক্তার চৌধুরীকে খবর দিতে পারি। আমাদের চ্যারিটেবল ডিস্‌পেন্‌সারিতে বসছেন আজকাল।

আজ থাক। আজকের দিনটা দেখি, কাল যদি দরকার হয়তো কালীনাথ ডাক্তারকে খবর পাঠাব।

কালীনাথ ডাক্তার? ওঃ, ওই ভরতপুর চিকিৎসালয়ের বুড়ো ডাক্তার! গীতার স্বরে কিছুটা অবজ্ঞার ছিটে। এটুকু লীলার কান এড়াল না। গম্ভীর গলায় বলল, হ্যাঁ, কাল তাঁকেই একবার দরকার হলে খবর দেব। মল্লিকবংশের নাড়ীর ধাত তাঁর জানা। নতুন ডাক্তারের চেয়ে এ বাড়ির রোগে অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য।

গীতা আর কথা বাড়াল না। সতীকে বুঝতে তার কোন অসুবিধা হয় না। সোজা প্রশ্নের সোজা উত্তর। মনে এক মুখে এক নয়। কিন্তু বৌরানীকে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। পাড় ভেঙে ভেঙে সবই তো গিয়েছে, শুধু পায়ের তলার মাটিটুকু ভরসা। অথচ দম্ভ একটু কমেনি। অহঙ্কারের রং একটু ফিকে নয়।

গীতা উঠে যাবার পর লীলাও উঠে পড়ল। ঘুমন্ত মেয়ের কাছে একটু গড়িয়ে নেবে। সারা রাত মেয়েটা কেঁদেছে। বার বার লীলারও ঘুম ভেঙে গেছে।

একটু তন্দ্রার দরকার। কিন্তু চোখ বুজলেই বিশ্রী সব চিন্তা। দিনের আলোয় মাথা তুলতে পারে না, রাত্রির জমাট অন্ধকারে অচেতন মনের গুহা থেকে কিলবিলিয়ে বেরিয়ে আসে সরীসৃপের মতন চিন্তার ধারা। ভয়ের রং মেখে কুৎসিত মূর্তির সার। অর্থহীন কল্পনা। সবই শেখরনাথকে ঘিরে।

শিক্ষায়তন, কারখানা, দাতব্য চিকিৎসাগার। ছোটখাট অজস্র কল্যাণকর প্রচেষ্টা দত্তসায়েব শুরু করেছেন। উন্নত মানুষ গড়ার ব্রত। কিন্তু একটা মানুষকে ঘর ছাড়াবার এ প্রয়াস কেন? দেশদেশান্তরে ছোটানো বাইজীর সন্ধানে, তবলচীর খোঁজে। সম্পদ, সম্ভ্রম, আভিজাত্য সবই তো কুক্ষিগত, তবুও কি নিষ্কৃতি নেই!

লীলা এপাশ ওপাশ করল অনেকক্ষণ ধরে। ঘুমন্ত মেয়ের গায়ে হাত রেখে শুয়ে রইল চুপচাপ।

সকালের দিকে জ্বর ছেড়ে গেল খুকুর। লীলা ভেবেছিল কাউকে সঙ্গে নিয়ে একবার পশুপতিনাথের মন্দিরে যাবে। মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম। অনেকক্ষণ ধরে হৃদয়ের কাকুতি জানাবে। নিস্তার নয়, পুরুষ কাউকে নিতে হবে সঙ্গে। এ সব কাজ হীরু বাগ্দীই করে এসেছে চিরকাল। হীরু বাগ্দীকে খবর পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না। দত্তসায়েবদের কাজে বাইরে কোথায় গেছে। একবার লীলার মনে হল নিস্তারকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেই হয়। কিন্তু সাত-পাঁচ ভেবে আর সাহস করল না। যে পথে একদিন সাজানো পাল্কিতে চড়ে বরকন্দাজ নিয়ে গিয়েছে, সে পথে মাটি মাড়িয়ে মাড়িয়ে শুধু এক পরিচারিকাকে নিয়ে যাওয়াটা নানা কারণে সমীচীন নয়। ঠুনকো আভিজাত্য, কিন্তু তাই জড়িয়ে তো থাকতে হবে। অন্তত ভরতপুরে। শেষদিন পর্যন্ত।

জানলার গরাদ চেপে লীলা নিশ্বাস ফেলল। ঘুরে দাঁড়াতেই সতীর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা।

বৌরানী, খুকু তো আজ একটু ভালই আছে, না?

হ্যাঁ দিদি, জ্বরটা আর নেই।

আমি ভাবছি আজকে একবার পাশের স্কুলবাড়িটা ঘুরে আসব। দুপুরের দিকে ওখানে বুঝি মাটির খেলনা গড়তে শেখানো হচ্ছে। পরেশ কুমোর নিজের হাতে শেখাবে। সতী একটু দম নিল, তারপর লীলার দিকে চেয়ে মৃদু গলায় বলল, তুমিও চল না বৌরানী।

আজ তুমি যাও দিদি। আমি না হয় আর একদিন যাব। খুকুর জ্বর ছেড়েছে বটে, কিন্তু শরীরটা দুর্বল। আজ আর ওর কাছছাড়া হব না।

সতী আর দাঁড়াল না। পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে গেল।

পরেশ কুমোর মল্লিক-বাড়ির প্রতিমা গড়ত। বারো মাসে তেরো পার্বণ। বাপ কুঞ্জ কুমোর আর ভাল দেখতে পায় না চোখে। ছানি পড়ে দুটো চোখই নষ্ট। হাত কাঁপে। প্রতিমার ভ্রূ আঁকতে আর পারে না, কিংবা ঠোঁটবাঁকানো হাসি। তুলি নড়ে রং ছিটকে পড়ে। আজকাল বাপের কাজ করে পরেশ। বাপের হাত পেয়েছে। শেষ দিকে মল্লিক-বাড়ির গোটা দুয়েক প্রতিমা তৈরী করেছিল। জগদ্ধাত্রী আর সরস্বতী। ভালই হয়েছিল। মূর্তিতে আধুনিকতার ছোঁয়াচ। ভরতপুরের বুড়োর দলের খুব পছন্দ হয় নি। মুখ ফুটে দু-একজন কথাটা বলেও ফেলেছিল, দেবীভাব নেই মুখ-চোখের গড়নে। কুঞ্জর সঙ্গে

তুলনা হয় না। মাটির তালে কুঞ্জ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করত। মূর্তি যেন কথা বলত।

সেই পরেশকেও দত্তসায়েব স্কুলের মধ্যে নিয়েছেন। কামার, কুমোর, মুটে মজুর সবাইকে ধরা দিতে হবে তাঁর জালে। কারুর রেহাই নেই। ভরতপুরে যে যেটুকু জানে, সব দিতে হবে। অস্পৃশ্যতার দোহাই দিয়ে মল্লিক-বাড়ির এলাকায় যাদের ঢুকতে দেওয়া হত না, শিক্ষাদানের অজুহাতে সে বাড়ির অন্দর মহলে তাদের ঢোকার পরোয়ানা দিয়েছেন দত্তসায়েব।

ঝাঁ ঝাঁ রোদ। জানলাগুলো ভেজিয়ে না দিলে থাকাই দুষ্কর। খুব সাবধানে লীলা জানলার পাল্লাগুলো বন্ধ করে দিল। খাটে উঠে খুকুর পাশে শুতে গিয়েই থেমে গেল। কার পায়ের শব্দ। সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ।

লীলা উঠে বসবার আগেই দরজায় খুট খুট শব্দ।

কে? লীলা গায়ে মাথায় কাপড় ঠিক করে উঠে দাঁড়াল।

আমি হীরু।

হীরু। হীরু বাগ্দী! এমন অসময়ে। লীলার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। ঠিক দুপুর বেলা কি খবর নিয়ে এল হীরু। মানুষটা ভাল আছে তো? কোন বিপদ আপদ হয় নি? নিজের বুকের দ্রুত স্পন্দনের শব্দ লীলা স্পষ্ট শুনতে পেল। দেয়াল ধরে ধরে সন্তর্পণে এগিয়ে গেল।

দরজা খোলার আগে মিনিট দুয়েক কবাটে মাথা দিয়ে নিস্পন্দ হয়ে রইল তারপর সাহস আনল মনে। কিছু না শুনেই এত ভয় পাচ্ছে কেন লীলা। হীরু বাগ্দীর কি বলার আছে, সেটা শুনুক আগে। কেন ভয় পাচ্ছে? ভয়ের থমথমে ছায়া শুধু বসতবাড়িটার ওপরই পক্ষ বিস্তার করে নেই, লীলার জীবনেও কালোডানা মেলে রয়েছে। ঘরপোড়া গরু যে, তাই সিঁদুরে মেঘ দেখলেই চমকে ওঠে। সর্বদাই তটস্থ। চরম বিপদ ওত পেতে রয়েছে ঘরের কানাচে, সুবিধা পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

দরজা খুলতেই হীরু পিছিয়ে দাঁড়াল। এক হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিল। সারা মুখ রোদের তাপে যেন ঝলসে গেছে। পুরু কোর্তা ভিজে জবজবে।

কি খবর হীরু? মন শক্ত করে কথাগুলো বলতে গিয়েও লীলা পারল না। গলার স্বর কেঁপে গেল। কেমন কান্না-জড়ানো।

ছোট হুজুরের খবর ছিল মা। সেইজন্যই ছুটতে ছুটতে এই রোদেই চলে এসেছি। বিকালের দিকে তো সময় পাই না।

ছোট হুজুরের খবর। লীলা ডান হাত প্রসারিত করল, কই দেখি চিঠি।

ঠোঁটের ওপর ঘামের বিন্দু। জিভ দিয়ে মুছে নিল লবণাক্ত স্বাদটুকু। তারপর হীরু খুব আস্তে আস্তে বলল, চিঠি তো নেই মা।

চিঠি নেই। তবে কি সর্বনেশে খবর বয়ে নিয়ে এল হীরু। সেইজন্যই বুঝি টলছিল পা দুটো। বারবার কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। বিপদ যে কিছু একটা হয়েছে এ বিষয়ে লীলার আর কোন সন্দেহ নেই। ভেলাটুকু আশ্রয় করে ভেসে বেড়াচ্ছিল, কালবোশেখীর উদ্দাম ঝাপটায় সেটুকু বুঝি তলিয়ে গেল অতলে।

চিঠি নেই? তবে কি খবর হীরু? আর দু-একটা কথা বলতে গেলেই বুঝি লীলা মেঝের ওপর ছিটকে পড়বে জ্ঞানহারা হয়ে।

ভয় পাবেন না। খবর খারাপ কিছু নয়। হীরু রোদ থেকে সরে চৌকাঠের এপারে দাঁড়াল।

আঃ, লীলা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, বুঝি মুক্তির নিশ্বাসও। চিন্তার বিভীষিকা থেকে মুক্তি।

এতক্ষণে লীলার খেয়াল হল। বলল, ভিতরে এস হীরু। রোদের যা ঝাঁজ। দরজা বন্ধ করে দাও।

দরজা ভেজিয়ে হীরু ঘরের এ পাশে এসে দাঁড়াল। জুতা খুলে রাখল চৌকাঠের এ ধারে।

সায়েবের কাছে ছোট হুজুরের চিঠি এসেছে।

তাই নাকি? সারা ভরতপুরে শেখরনাথের বুঝি কেবল দত্তসায়েবকেই মনে পড়ল। শরীরের কুশল সংবাদ নেবার জন্য আর কোন উদ্বিগ্ন হৃদয় নেই। চিঠির আশায় উদ্‌গ্রীব কোন মানুষের কথাও স্মরণে এল না।

লীলা একটু গম্ভীর গলায় বলল, তোমাদের ছোট হুজুর ভাল আছেন তো হীরু?

ভালই আছেন মা। আমি বাইরের দাওয়ায় বসেছিলাম। সায়েব অফিসঘরে ঢুকে চিঠিপত্রের তাড়া দেখতে দেখতে হঠাৎ আমায় ডেকে বললেন, একবার খাজাঞ্চী মশাইকে খবর দাও তো। আমি ছুটে খাজাঞ্চীকে সঙ্গে নিয়ে

এলাম। সায়েব তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, শেখরনাথবাবু চিঠি লিখেছেন ফৈজাবাদ থেকে। তাঁকে আজকেই শ চারেক টাকা আরো পাঠিয়ে দিন।

ছোট বাবুর নামটা মুখে আনার সঙ্গে সঙ্গে হীরু জিভ কামড়াল। হঠাৎ বলে ফেলেছে। সায়েবের কথাগুলো হুবহু উচ্চারণ করতে গিয়ে এই বিপত্তি, মা যেন দোষ না নেন।

দোষ! দোষ আবার কিসের! পদবীচ্যুত একটা মানুষ, সব কিছু হারিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। হাত পেতে করুণা ভিক্ষা করে চলেছে ভরতপুরের নতুন অধীশ্বরের কাছে। অসম্মানকর বৃত্তির মাধ্যমে নিজেকে লালন পালন। স্ত্রী-পরিজন সব কিছু নিশ্চিহ্ন, পিছনে ফিরে চাইবার মত কেউ যেন কোথাও নেই। এখনও তো তবু নামের সঙ্গে বাবু যোগ করে লোকেরা উচ্চারণ করছে, কিছুদিন পরে তাও হয় তো বলবে না। নতুন ভরতপুর গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পুরণো মানুষ কোথায় তলিয়ে যাবে।

তাই খবরটা শুনে অবধি আপনার কাছে আসবার জন্য ছটফট করছিলাম। কিছুতেই সুযোগ পাচ্ছিলাম না মা। কথা শেষ করে হীরু বুকের ওপর দুটো হাত জোড় করে রইল।

মিনিট দুয়েক। লীলা মনে মনে একটু ভেবে নিল। আগের দিনে এমন একটা সংবাদ নিয়ে এলে দূত পুরস্কৃত হত। এমন আশা করেই বুঝি হীরু দাঁড়িয়ে আছে। প্রভুর কুশল সংবাদ বহন করে এনেছে প্রভুপত্নীর সকাশে। কিছু একটা প্রত্যাশা আছে বৈ কি।

হীরুকে দাঁড়াতে বলে লীলা ভিতরে গেল। আলমারির পাল্লা খুলে ভাবল মিনিট কয়েক, তারপর পাঁচ টাকার একটা নোট নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

এই নাও হীরু। আমার অবস্থা তো তোমার অজানা নয়। এটা রেখে দাও।

প্রসারিত হাতের ওপর নোটটা ছোঁয়াতেই হীরু শিউরে উঠল। নোটটা মেঝের ওপর উড়ে পড়ল।

হীরু বাগ্দী ঘাড় নাড়ল, না মা। এসব আমি চাই নি। টাকা আপনি তুলে রাখুন। কথার সঙ্গে সঙ্গে হীরু নিজেই নিচু হয়ে নোটটা তুলে নিল। তারপর কাগজটা লীলার দিকে এগিয়ে দিল।

লীলা নোট নেবার কোন চেষ্টা করল না। অনুকম্পা! ওর জীবনের ওপরও

সকলের কৃপাকণা বর্ষিত হবে এমনি ভাবে! দেওয়ার অদম্য ইচ্ছার পিছনে ভাণ্ডারের রিক্ততার দিকে এমনি করে কটাক্ষ করবে! কেন? শেখরনাথ ছড়িয়ে ছিটিয়ে খরচ করতে পারেন, মুঠো মুঠো টাকাই নয়, মুঠো মুঠো জীবনও, প্রয়োজন হলে দূরদেশ থেকে প্রসারিত করে দিতে পারেন নিজের ভিক্ষার ঝুলি, তাতে কোন দোষ হয় না। যতো করুণা, সমবেদনার লক্ষ্য হবে বুঝি মল্লিকবংশের অসহায়া বধূ।

লীলা নিজেকে সংযত করে নিল। বলল, টাকা ফিরিয়ে দেওয়া মানে আমাকে অপমান করা হীরু। তোমার টাকার দরকার না থাকে, এ টাকা তুমি যাকে ইচ্ছা বিলিয়ে দিও।

মা, হীরু চমকে উঠল। এ কি কথা। মল্লিক-বাড়ির অপমান। আর সে অপমান করবে হীরু বাগ্দী। তিন পুরুষে এ বাড়ির নেমক খেয়ে। নোটটা নিজের পিরানের পকেটে রেখে দিয়ে হীরু সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল লীলাকে। ঠিক আগের দিনের মতই। তারপর উঠে হাতজোড় করে বলল, অনুমতি করুন মা।

ঠিক আছে হীরু। লীলা মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করল।

হীরু সিঁড়ির চাতাল বেয়ে নেমে মস মস শব্দ করে ফটক পার হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লীলা দেখল। একটা হাত দরজার পাল্লায় রেখে।

হীরু বাগ্দীর ছুটে খবর দেওয়ার পিছনে প্রভুভক্তির নিদর্শন রয়েছে বৈ কি। কিন্তু শুধু কি সেইটুকুই। অপমানের কালি মেশানো নেই, লজ্জার ছিটে!

শেখরনাথের বাড়ির সঙ্গে কোন খোঁজ খবর নেই, চিঠিপত্রের আদান-প্রদানও নয়, সেটা হীরু বাগ্দীরও অবিদিত নেই। তাই দত্ত সায়েবের কাছে ছোট বাবুর খবর পেয়ে ছুটে এসেছে।

আঁচল দিয়ে লীলা চোখ দুটো মুছে নিল। আরো কত বাকি! সারা ভরতপুর হাসবে, আঙুল দিয়ে দেখাবে ওকে। সম্পদ আর আভিজাত্যই শুধু নয়, আপনজনও সরে দাঁড়িয়েছে। পরিত্যক্তা বৌরানীর দুঃখের অন্ত নেই।

ঘুরে দাঁড়িয়েই লীলা থেমে গেল। ঘরের মাঝখানে সতী। অনেকক্ষণ হয়তো এসেছে। চোখের জল ঝরা দেখেছে, জলমোছাও।

কে এসেছিল বৌরানী?

হীরু।

হঠাৎ? কোন খবর ছিল?

হ্যাঁ, দিদি। তোমার ঠাকুরপোর খবর।

সতী হাসল। আহা, যাক, সুমতি হোক মানুষটার। দূরে সরে গিয়েছে কিন্তু সম্পর্কের বাঁধন কাটে নি। যোগাযোগ রাখছে। চিঠির মাধ্যমে বাড়ির খোঁজ-খবর।

কাশী থেকে লিখেছে বুঝি?

না ফৈজাবাদ থেকে!

ফৈজাবাদ!

নামকরা বাইজিরা কি এক জায়গায় জোট বেঁধে থাকে দিদি। তাতে যে পসারের ক্ষতি হয়। এক-এক শহরে এক-একজনের আস্তানা। তাদের ছুঁতে হলে মানুষদেরও ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয়।

এত কথা সতী বুঝল না। বৌরানী পেঁচিয়ে কথা বলতে কেন যে ভালবাসে। যে কথা সহজ মানুষের বুঝতে অসুবিধা, সে কথা বলে লাভ!

ঠাকুরপো ভাল আছে তো? কবে আসছে কিছু লিখেছে? সতী লীলার কাছে এসে দাঁড়াল। সেদিনের মতন যদি হাত বাড়িয়ে চিঠিটা দেয়, নিতে অসুবিধা না হয়।

কিন্তু লীলা চুপচাপ। হাতেও তো নেই চিঠি। আঁচলের খুঁটে বেঁধে রেখেছে এমনি দামী চিঠি। এবারে আর সতীকে দেখানো চলবে না।

পরিহাসের এমন একটা সুযোগ সতী ছাড়ল না। হেসে বলল, এবারে বুঝি বড় চিঠি বৌরানী, অনেক কথায় ঠাসবোঝাই?

একটুখানির জন্য লীলার দুটো চোখ ঝিকমিকিয়ে উঠল। বাইরের রোদের ছোঁয়ায়, না ভিতরের আগুনের স্পর্শে বোঝা গেল না। তারপরই কম্পিত গলায় বলল, কি জানি দিদি, চিঠির মাপও যেমন জানি না, চিঠির ভাষাও নয়। সে সব খবর জানতে হলে দত্তসায়েবের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হয়।

আবার হেঁয়ালি। সতী অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। দুটো হাতে লীলার একটা হাত জাপটে ধরে বলল, দোহাই তোমার বৌরানী, ওসব হেঁয়ালী আমার মাথায় ঢোকে না। আমাকে অল্প কথায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল। তোমার আর ঠাকুরপোর মাঝখানে দত্ত সায়েবের কথা কেন ওঠে।

লীলা এবারে হাসল। সতীর হাত ধরে খাটের ওপর বসিয়ে বলল, চন্দ্রগ্রহণ দেখেছ দিদি। রাহুগ্রাস নয়, বিজ্ঞানের ভাষায় পৃথিবীর ছায়া পড়ে চন্দ্রের দেহে। তেমনি দত্তসায়েবের ছায়া তোমার ঠাকুরপোর শরীরে? আলাদা করে তাকে দেখবার উপায় নেই।

সতী কোন কথা বলল না। দুটো হাত কোলের ওপর জড় করে চুপচাপ বসে রইল। পুরানো কথা মনে পড়ল। প্রথম প্রথম সতীর কথা হেঁয়ালি ঠেকত লীলার কাছে। বুঝতে অসুবিধা হত। রুনি বাইজি আর সর্বনেশে ভাঙনের কথা শুনে অবাক দৃষ্টি মেলে সে শুধু চেয়ে থাকত। কিন্তু চাকা ঘুরে গেছে। মল্লিক-বাড়ির রহস্যের কথা বুঝতে একটুও বাকি নেই লীলার। সতী যেটুকু বুঝেছিল নিজের জীবন দিয়ে তিল তিল করে দুঃখের তাপে গলে, লীলা সহজ বুদ্ধি আর তীক্ষ্ণ বিবেচনা শক্তি দিয়ে তার চেয়েও অনেক বেশী বুঝে ফেলেছে। সতী ঠকেছে, সচেতন হবার আগেই সর্বস্ব খুইয়েছে, কিন্তু লীলা দাঁড়াবে তাল ঠুকে, দুর্ভাগ্যের মুখোমুখি। ওকে ডিঙিয়ে অমঙ্গলের কালো ছায়া যেন ঢুকতে না পারে। সতীর মতন নিঃশব্দে সরে যাওয়া নয়, পায়ে পায়ে এগিয়ে আসা।

তোমার ঠাকুরপো দত্তসায়েবের কাছে চিঠি লিখেছেন টাকা চেয়ে। লীলা থেমে থেমে বলল।

দত্তসায়েবের কাছে?

তা নয় তো তোমার কি ইচ্ছা দিদি টাকা চাইবে আমার কাছে? ভিখারীর কাছে ভিক্ষা!।

সতী একথার কোন উত্তর দিল না।

টাকা দত্তসায়েব পাঠিয়ে দিয়েছেন। হীরু তো তাই বলে গেল।

লীলা খাট থেকে নেমে দাঁড়াল। দু হাত মাথার ওপর তুলে হাই তুলল, তারপর কথা একেবারে পাল্টে ফেলল, স্কুলে গিয়েছিলে দিদি?

হ্যাঁ বৌরানী, ভারি চমৎকার লাগে আমার। যতটুকু ওখানে থাকি সব ভুলে যাই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো সত্যিই দুঃখ ভুলিয়ে দেবার জাদু জানে।

লীলা একদৃষ্টে সতীর দিকে চেয়ে রইল। তবু সতী একটা জায়গার সন্ধান পেয়েছে যেখানে দু দণ্ড গিয়ে বসলে পিছনের সব কিছু ভুলে যায়। ব্যথা বেদনা,

দুঃখ শোক সব। কিন্তু জুড়াবার মতন জায়গা লীলার কোথাও নেই। দত্ত-সায়েবের হাতে গড়া কোন জিনিসের সান্নিধ্যে এলেই বুকে-তীর-বেঁধা পাখির মতন লীলা ছটফট করে। সহ্য করতে পারে না। এমন যদি হত ভরতপুর পার হয়ে দূরে কোথাও চলে যেতে পারত। অনেক দূর। মল্লিকবংশের দীর্ঘশ্বাসে ভারাক্রান্ত বাতাস যেখানে পৌঁছাত না, নতুন মনিবের জয়ধ্বনিও নয়। অতীত মুছে ফেলে নতুন করে জীবনের আরম্ভ! কিন্তু এ স্বপ্ন মনের দিগন্তেই শুধু আঁকা থাকবে। কোন দিনও বুঝি রূপ পাবে না।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কি সুন্দর মাটি দিয়ে খেলনা গড়তে শিখেছে বৌরানী। চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হয় না। খুকুটা তাড়াতাড়ি বড় হলে বাঁচি। ওকে ওই স্কুলে ভর্তি করে দেবো।

টেবিলে হেলান দিয়ে লীলা চুপচাপ দাঁড়াল। খেলনা গড়া শুধু বুঝি দত্ত-সায়েবের স্কুলেই, সারা পৃথিবী জুড়ে তো তারই মহড়া চলেছে। মাটি দিয়ে দিয়ে শুধু পুতুল গড়াই নয়, পুতুল ভেঙে পুতুল গড়ার খেলাও চলেছে। চোখের সামনে এত দৃষ্টান্ত থাকতে, স্কুলবাড়িতে গিয়ে দেখতে হবে!

ঠাকুরপো বোধ হয় শীঘ্রই ফিরে আসবে বৌরানী। সতীর গলা খুব মৃদু।

কে বলল? লীলা টান হয়ে দাঁড়াল।

গীতা বলছিল। আর মাসখানেকের মধ্যেই দত্তসায়েবের দু নম্বর কারখানা খোলা হবে। সেই উপলক্ষেই তো গান-বাজনার আয়োজন। কাজেই ঠাকুরপো বোধ হয় তার আগেই ফিরবে।

কি জানি দিদি।

কিন্তু, কি একটা বলতে গিয়েই সতী থেমে গেল।

কিন্তু কি দিদি?

সতী নিজেকে সামলে নিল। না, কিছু নয়। অন্য একটা কথা মনে পড়ে গেল।

অন্য এক কথা মনে পড়ে গেল! তাই বুঝি! কিন্তু ছলনার এ অভিনয়ের কোন প্রয়োজন ছিল না, লুকোচুরির এ খেলা। একই সুরে বাঁধা যে দু-জনের বুকের বীণা। একই দুঃখের ঝঙ্কার ওঠে হাতের স্বল্প ছোঁয়ায়।

শেখরনাথ তো একা ফিরবেন না। সঙ্গে বাইজীর দল থাকবে, তবলা আর সারেঙ্গী নিয়ে অনুচরবৃন্দ। সংসারে এসে দাঁড়াবার সময় কোথায়। তিলক

কামোদ আর ঠুংরী, তবলা লহরা আর সুরার পিচ্ছিল স্রোতে কাছের মানুষ কোন দূরে সরে যাবে, ঠিক আছে! এই কথাই সতীর মনে এসেছিল। কিন্তু বলতে এত দ্বিধা কেন, কিসের সঙ্কোচ! মল্লিক-বাড়ির বংশধর সম্পদ খুইয়েছে বলে কি ইজ্জতও খোয়াবে? কালনাগ ফণা গুটিয়ে ফিরবে, আত্মগোপন করবে! তা কখনও হয়। অমরনাথ আর শেখরনাথে কোন প্রভেদ নাই। ধমনীতে একই রক্তের ধারা। প্রবৃত্তির গতিও একমুখী।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। কোন কথা নয়। অনেক দূর থেকে লোহা পেটানোর আওয়াজ ভেসে আসছে। মজুর-মজুরনীদের একটানা গানের সুর।

অনেকক্ষণ পরে লীলা কথা বলল, কাল এক কাজ করলে হয় দিদি।

কি, সতী চোখ তুলে চাইল।

ভাবছি একবার পশুপতিনাথের মন্দিরে যাব। তুমি, আমি আর নিস্তার।

আর কেউ যাবে না সঙ্গে? সতী খুব আস্তে জিজ্ঞাসা করল।

যাবার মধ্যে তো এক হীরু বাগ্দী। কিন্তু তার কি সময় হবে? লীলা যেন সতীর কথার কোন উত্তর দিল না। নিজেই বোঝাল নিজেকে।

বলে দেখলে হত, যদি সুবিধা করতে পারে। সঙ্গে পুরুষ মানুষ কেউ না থাকলে সাহস হয় না সতীর। কোন দিন এভাবে একলা যাওয়ার অভ্যাস নেই। আগের দিনের মত পাইক-বরকন্দাজ নাই রইল পাশে, অন্তত একজন অনুচর থাকা উচিত বৈ কি! এ মন্দির মল্লিকবংশের লোকই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পুরোহিতের মাইনে থেকে রক্ষণাবেক্ষণ সব কিছু। মল্লিক-বাড়ির অবস্থা খারাপ হবার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের অবস্থা পড়তির মুখে। সংস্কারের অভাবে ফাটল ধরেছে। আগাছা আর ঘাসের চারা সিঁড়ির ফাঁকে ফাঁকে। পুরোহিত মশাই পাওনার অভাবে দেখাশোনা করতে পারেন না। সকাল বিকাল কোন রকমে আরতিটা করে যান। দায়সারা গোছের। কিছু দিনের মধ্যেই হয়তো সেবার ভারও দত্তসায়েবের দপ্তরে গিয়ে পড়বে। ঝকঝকে তক-তকে হয়ে উঠবে মন্দির। আগাছা উপড়ে নতুন রং ফিরিয়ে চেহারাই পাল্টে যাবে। শুধু কি মন্দিরের চেহারাই, চাতালে গাঁথা পাথরের ফলকের ভাষাও যাবে বদলে। ধারালো ছুরির ফলায় চেঁছে চেঁছে তুলে ফেলা হবে শিবনারায়ণ মল্লিকের নাম। পরিবর্তে হয়তো দত্তসায়েবের পরলোকগতা পুণ্যশ্লোকা গর্ভ-

ধারিণীর নাম বসবে। খুব বেশী দেরি নয়। তার আগেই একবার মন্দিরে যেতে চায় লীলা।

হীরু যখন বাতি জ্বালাতে আসবে তখন বলে দেখলে হয়। লীলাই কথাটা তুলল।

সেই ভাল বৌরানী। আমার তো মনে হয় হীরু ঠিক সঙ্গে যেতে পারবে।

হীরু রাজী। কোন অসুবিধা নেই। তবে এই ঝা-ঝা রোদে না গিয়ে ভোরে গেলেই হয়, কিম্বা রোদের তাপ কমলে একেবারে বিকাল ঘেঁষে।

খুকুকে নিস্তারের কাছে রেখে ভোরে ভোরে বেরিয়ে পড়াই ভাল। কাকপক্ষী জাগবার আগে। তাড়াতাড়ি ফিরেও আসতে পারবে।

দুজনেই গরদ জড়িয়ে নিল। সতী থান, লীলা চওড়া লালপাড়। হীরুও চেহারা পাল্টে ফেলেছে। বরকন্দাজের কোর্তা-কামিজ নয়। স্নান সেরেছে ভোরবেলা। কোঁচার খুঁট গায়ে জড়িয়েছে। নৈবেদ্যর থালা নিয়ে যেতে হবে, তাই খালি পা।

পুরোহিত মশাইকে আগেই খবর পাঠানো হয়েছিল। পূজো সারতে দেরি হল না। গলায় আঁচল দিয়ে লীলা অনেকক্ষণ উপুড় হয়ে রইল চৌকাঠে। সতী চোখ বন্ধ করে পাশে। প্রাণের কাকুতি জানাল। দেবতা অন্তর্যামী। কিছুই তো জানতে বাকি নেই। মালিন্যের এ মেঘ কেটে যাক, মল্লিকবংশের সর্বনাশের গতি রুদ্ধ হোক। পুরনো দিনের আলো-ঝলমল দিন হয়তো আর ফিরে আসবে না। না আসুক। দুর্দিনের মেঘের পাড়ে পাড়ে রূপালী ঝিলিক, সেইটুকুই অন্তত থাক। নিঃসীম অন্ধকারে সব যেন হারিয়ে না যায়। বিগ্রহের সামনে অনেকক্ষণ দুজনে চুপচাপ বসে রইল।

মন্দিরের বাইরে এসে সতী আর লীলা ঘুরে ঘুরে দেখল। অনেকদিন আসে নি। শ্যাওলা ধরেছে চাতালে। মেরামতের অভাবে চুনবালি খসে অনেক জায়গায় ইঁটের পাঁজর। মন্দিরের গা ঘেঁষে অশথের চারা। পুরোহিতকে প্রণাম করে দুজনে পথে এসে দাঁড়াল।

পিছনে শব্দ হতেই সতী আর লীলা সরে পথের ধারে এসে দাঁড়াল। একেবারে ঘাসের ওপর। ধূলোর কুণ্ডলী, তারপর মোটরটা পাশে এসে পড়ল। ব্রেকের কসরত। গাড়ি থামল।

হাফহাতা সার্ট, খাকি প্যাণ্ট, মাথায় শোলার টুপি। দরজা খুলে দত্তসায়েব নামলেন। সতী ঘোমটা নামিয়ে দিল, লীলা পিছন ফিরে দাঁড়াল।

হীরু! দত্তসায়েবের গম্ভীর গলার আওয়াজ।

মোটর দেখেই হীরু এগিয়ে এসেছিল, দত্তসায়েবের ডাকে সামনে এসে দাঁড়াল।

মাথা ঝুঁকিয়ে দণ্ডবৎ। তারপর হাতজোড় বুকের ওপর।

দত্তসায়েব চড়া গলায় ডেকেছিলেন, এবার স্বর নামালেন। আস্তে আস্তে কথা বললেন। উত্তরে হীরু অনেকবার ঘাড় নাড়ল। তারপর পিছিয়ে এসে বৌরানীর সামনে দাঁড়াল।

মা!

লীলা একটু তুলল ঘোমটা। মুখে চোখে বিরক্তি। পথের মাঝখানে মানুষজনকে থামিয়ে কিসের এত কথাবার্তা?

সতীও লীলার আরো কাছে সরে এল। কি ব্যাপার! হীরু বাগ্দী নতুন মনিবের হুকুম না নিয়েই বেরিয়ে পড়েছে বুঝি।

হীরু বাগ্দী মাটি থেকে মুখ তুলল না। বলল, সায়েব বলছেন, মন্দিরে আসার কথা আগে জানালে উনি বন্দোবস্ত করতে পারতেন। মিছিমিছি এতটা পথ আপনারা হেঁটে—

কথার মাঝখানেই হীরু থেমে গেল। লীলার চোখে চোখ পড়ল। বৌরানীর দু চোখে আগুনের ছিটে। সারা মুখ আবীরের মত লাল।

একটু থেমে, ঢোঁক গিলে হীরু কথা শেষ করল, সায়েব বলছেন আপনারা গাড়িতে উঠুন। উনি রাস্তায় অপেক্ষা করছেন। আপনাদের পৌঁছে দিয়ে গাড়ি আবার ফিরে আসবে।

মিনিট দুয়েক। উত্তর দিতে লীলা তার বেশী সময় নিল না। হাত দিয়ে ঘোমটা আলতো তুলে ধরল, তারপর বেশ জোর গলায় বলল, তুমি ওঁকে বলে দাও হীরু, পুজো দিয়ে মল্লিক-বাড়ির বৌরা গাড়ি চড়ে বাড়ি ফেরে না। ফিরতে নেই। খালি পায়ে মাটি মাড়িয়ে ফিরতে হয়। নয় তো গাড়ির ব্যবস্থা আমরাই করতে পারতাম। বাইরের লোককে বলবার প্রয়োজন হত না।

হীরুর আর বলার দরকার হল না। হাত কয়েক দূরে দত্তসায়েব দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকটি কথা কানে গেল। শুধু কানে নয়, মরমেও। আর একটি কথাও নয়।

দত্তসায়েব গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। দরজা বন্ধ করার শব্দ। ইঞ্জিনের গর্জন। মুঠো মুঠো লাল ধুলো। বাঁকের মুখে মোটর অদৃশ্য হয়ে গেল।

চল দিদি। লীলা এগিয়ে গেল।

সতীর মুখের শেষ রক্তবিন্দুও নিশ্চিহ্ন। ফোঁটা ফোঁটা ঘামের মুক্তা। দম নিয়ে বলল, ভাল করেছ বৌরানী। ও মোটরে গিয়ে উঠতে হলে আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যেত। এখনও সারা শরীর কাঁপছে।

লীলা আড় চোখে সতীর দিকে চেয়ে দেখল। তারপর চলতে চলতে বলল, মোটরে উঠলে ইজ্জত বাড়ত কি কমত জানি না দিদি, কিন্তু মনে হল দত্তসায়েবের কৃপার ওপর নির্ভর যতটা কম করা যায়, ততই ভাল।

কথাটা শেষ করেই লীলা থমকে দাঁড়াল। দত্তসায়েবের কৃপার ওপর নির্ভর! মল্লিক-বাড়ির বৌরা নির্ভর না করলেই বুঝি সব কিছুর ইতি। হৃত আভিজাত্য ফিরে আসবে। সম্পদের দম্ভ অটুট। হাত নেড়ে উপেক্ষা করার পাশাপাশি আর একজন যে দাঁড়িয়েছে হাত পেতে। জনার্দন নায়েবের পোশাক অঙ্গে জড়িয়ে প্রভুর কাজের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে দেশ থেকে দেশান্তরে। দত্তসায়েবের জলসায় যাতে অঙ্গহানি না হয়। কোন ত্রুটি না থাকে।

লজ্জা হল লীলার। এতক্ষণে দামী গদিতে হেলান দিয়ে দত্তসায়েব হয়তো মুচকি মুচকি হাসছেন। তারিফ করছেন মল্লিক-বাড়ির বৌরানীর অতি-অভিনয়ের।

॥ সাত ॥

আগেই কাশির শব্দ কানে এসেছিল, এবার পর্দা ঠেলে গীতা এসে দাঁড়াল। এদিকের কোণে লীলা বেহালাটা কোলে নিয়ে বসেছিল। অযত্নে, অবহেলায় কি হয়েছে শখের জিনিসটা! অনেকগুলো তার ছিঁড়ে গুটিয়ে গেছে। মাকড়সার জাল খাঁজে খাঁজে। শাড়ির কোণ দিয়ে লীলা সাবধানে মুছতে লাগল। মাঝে মাঝে হাত লেগে ছেঁড়া তারে স্বরের মূর্ছনা। অব্যক্ত কান্নার মতন। শুধু কাঠ আর তারের সমাবেশই নয়, যন্ত্রটার যেন প্রাণ আছে, বলারও কিছু রয়েছে।

দেয়ালে হেলান দিয়ে সতী বসেছিল। সামনে খোলা রামায়ণ। মন ঠিক

করার জন্য দিন দুয়েক নিয়ে বসেছে। কিন্তু মন ঠিক হবে কি ছাই, এখানেও একই কথা। সীতাহরণ আর অগ্নিপরীক্ষা। মেয়ে হয়ে জন্মালে দুঃখের যেন শেষ থাকে না, কষ্টের অবধি নয়।

চোখাচোখি হতেই গীতা হাত জোড় করে সতীকে নমস্কার করল।

আপনার স্কুলের কি খবর? অনেকদিন যে আসেন নি? সতী হাত দিয়ে বই সরিয়ে রাখল।

খবর ভাল। গীতা এগিয়ে এসে পা মুড়ে বসল। সতীর কাছাকাছি, লীলার দিকে পিছন ফিরে।

শরীরটা তেমন ভাল নেই, তাই যেতে পারি নি, সতী পাতা ভাঁজ করে বইটা তাকের ওপর রাখল, রান্নাবান্নার কাজ কতদূর শিখল ছাত্রীরা?

আজই তো তার পরীক্ষা। গীতা হাসল।

আজ পরীক্ষা? কি রকম?

নন্দনকাননে আজ বনভোজন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাওয়া হবে। তাই তো আপনার কাছে এসেছি।

আমার কাছে?

হ্যাঁ, আমাদের সবাইয়ের ইচ্ছা আপনারাও চলুন। ছাত্রীরা কেমন রান্না শিখল সেটা চাখবার লোক তো চাই। আপনারা কেমন হয়েছে বলবেন, সেই বুঝে আমরা নম্বর দেব।

তাই নাকি? সতী হেসে উঠল। মজা তো মন্দ নয়। একপাল ছেলে মেয়ে নিয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো। তাদের কচি হাতের রান্না চাখা। ভারি মজা।

সতী লীলার দিকে চেয়ে দেখল। একটা ছেঁড়া তার নিয়ে বড়ো বিপদে পড়েছে লীলা। যতবার আটকাতে যাচ্ছে, ততবারই ছিটকে পড়ছে। নাজেহাল। গীতার কথার একবর্ণও কানে গেছে এমন মনে হল না।

সতী কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, বৌরানী!

লীলা দুহাত দিয়ে তারটা চেপে ধরেছে। সন্তর্পণে আটকে দেবার চেষ্টা করছে। মুখ না তুলেই বলল, কি দিদি?

স্কুলের বনভোজনের কথাটা শুনলে?

হ্যাঁ, শুনলাম তো? নন্দনকাননটা কোনদিকে বল তো দিদি?

অনেক আগে একবার সতী গিয়েছিল। ভাল করে মনেও নেই। প্রায় বিয়ের কনে। পিসশাশুড়ীর সঙ্গে পালকি করে গিয়েছিল। একেবারে দক্ষিণ কোণ ঘেঁষে বিরাট বাগান। আগে বুঝি নীলকর সায়েবের কুঠি ছিল বাগানের মাঝখানে। সে কুঠি বহুকাল নিশ্চিহ্ন। হরিদ্বার থেকে কোন সাধু এসে ঘর বেঁধেছিল সেখানে। ত্রিকালজ্ঞ সাধু। ভূত ভবিষ্যৎ নখদর্পণে, বর্তমানের বেলায় একটু গণনা করতে হয়। দশ বিশ ক্রোশ দূর থেকে ছেলে বুড়ো মেয়েতে পথ বোঝাই। রোগী আতুর থেকে ভোগী সুখী।

সতীর কাছে সাধু ধরা পড়ে গিয়েছিল। ফাঁকিবাজ, ভণ্ড। সেদিন অতটা বুঝতে পারে নি। গাল বাজানোর আর ধুনি জ্বালানোর কায়দায় মনে কিছুটা শ্রদ্ধাই জেগেছিল, কিন্তু আজ বুঝতে পেরেছে, সব ভুয়ো।

অনেকক্ষণ ধরে সতীর হাত দেখেছিল সাধু। মাটিতে খড়ি দিয়ে আঁকি-বুকি। তারপর বলেছিল, মা তো রাজরানী। পায়ের বুড়ো আঙুলের ছোঁয়ায় কত লোকের বরাত ফিরে যাবে।

এ সবে কিন্তু পিসি ভোলেন নি। হাঁটু মুড়ে, গলায় আঁচল দিয়ে বসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হ্যাঁ বাবা, বৌমার কপালে সুখ কেমন দেখুন! স্বামী-পুত্র নিয়ে আনন্দে ঘরসংসার করতে পারবে তো?

সাধু সতীর কপালে ভস্মের তিলক আঁকতে আঁকতে বলেছিল, সুখের কিনারা থাকবে না মায়ের। স্বামী তো এক কথায় উঠবে বসবে। বছর ঘুরলেই রাঙা খোকা আসবে কোলে। বুকজুড়োন ধন।

ভক্তিতে গদ গদ হয়ে পিসি প্রণাম করেছিলেন। পায়ের কাছে গিনি রেখে।

বছরও ঘোরেনি। দশ দিক কাল করে দুঃখের আঁধি নেমেছিল। ধুলোর ঝাপটায় সব অস্পষ্ট। সতী একটুও ভোলেনি।

সেই নন্দনকানন। বড় বড় গাছের সার। পাতাবাহারের ঝোপ। সযত্নে পোঁতা দিশী বিলিতী মরসুমী ফুলের গাছ। এই নন্দনকানন সতীর জীবনে সুখের ইসারা এনেছিল। ইসারা নয়, ছলনা।

সতী মনে করার চেষ্টা করল, এখান থেকে মাইল তিনেক বোধ হয়, তাই, না? উত্তরের অপেক্ষায় গীতার দিকে মুখ ফেরাল।

প্রায় মাইল চারেক, গীতা হাতের ভাঁজ করা কাগজ খুলল, মাতঙ্গী নদীর

ধারেই। দত্ত সায়েবের ইচ্ছা ওখানে একটা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করবেন। আশেপাশের গাছপালা না কেটে। উনি বলেন, চার পাশের প্রাকৃতিক শোভা রোগীকে নাকি তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে সাহায্য করে।

ছেঁড়া তারটা অনেক কষ্টে লীলা আটকে এনেছিল, একটু অন্যমনস্ক হতেই আবার খুলে গেল। দত্ত সায়েবের নাম শুনলেই সারা শরীরের রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। নিশ্বাসে যেন আগুনের স্পর্শ। নিজেকে লীলা কিছুতেই সংযত করতে পারে না।

এত দূর? সতী বিস্ময় প্রকাশ করল, ছেলেমেয়েদের এতটা পথ নিয়ে যাবেন কি করে?

তিনটে মোটর বাসের বন্দোবস্ত হয়েছে। মোটরে যেতে আধঘণ্টাও লাগবে না।

মোটরের কথায় সতী গম্ভীর হয়ে গেল। সেদিনের কথা মনে পড়ে গেল। এ-ও দত্ত সায়েবের মোটর। সতীর কি যাওয়া ঠিক হবে?

হীরু বাগদী সঙ্গে থাকবে। এদিক ওদিক কাজ তো কম নেই। তা ছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবের বোনও যাবেন। দু-একটা নিরামিষ রান্না উনিই শিখিয়েছেন কিনা। আপনারা যদি দয়া করে যান, আমরা সবাই খুব খুশী হব।

যাবে বৌরানী? সতী লীলার দিকে চাইল।

বেহালা ঝাড়া মোছার কাজ প্রায় শেষ। বেহালা সরিয়ে লীলা আলমারি সাজানোয় মন দিয়েছে। কতদিন এদিকে নজরও দিতে পারে নি! অবশ্য এমন কিছু রাজকার্যেও ব্যস্ত ছিল না। কিন্তু মানুষের মনই তো সব। মন ঠিক না থাকলে কোনো কাজেই গা লাগে না। সতীর কথায় আলমারির পাল্লা ভেজিয়ে ফিরে দাঁড়াল। দু-এক মিনিট ভাবল। সতীর আকর্ষণ যে কি, তা ওর অজানা নয়। নন্দন কানন নয়, ম্যাজিস্ট্রেটের বোন তো নয়ই, আকর্ষণ একপাল ছোট ছেলেমেয়ে। তাদের বুকে জাপটে, আদর করেই স্বর্গসুখ পাবে। খুকুর ব্যাপারে দেখেছে তো। কাজল পরিয়ে, কপালে টিপ এঁকে, পাউডার মাখিয়ে একদৃষ্টে সতী চেয়ে থাকে তার দিকে। দৃষ্টিতে পলক নেই। খুকুর দিকে চেয়ে থাকে না, বুকের রক্তে অনুভব করে নিজের জীবনে যে ছবি সম্পূর্ণ হল না, রঙের জৌলুষ তো নয়ই, একটি আঁচড়ও পড়ল না, খুকুর মধ্যে বুঝি তার পরিপূর্ণতা খোঁজে! বুভুক্ষু হৃদয়ের সান্ত্বনা।

বারণ করবে ভেবেছিল লীলা, কিন্তু সতীর মুখ দেখে পারল না। বলল, যাবে তো যাও না।

আপনিও চলুন না। গীতা সাহস করে বলে ফেলল।

আলমারির পাল্লায় হাত রেখে লীলা দাঁড়াল। আমোদ আহ্লাদ হৈ হল্লা কোনটাই আমার আসে না। আমি গেলে আপনারা বিব্রত হবেন।

তা হলে আমার যাওয়া কি ঠিক হবে বৌরানী? খুব নিস্তেজ গলা সতীর।

তুমি কেন যাচ্ছ দিদি, তা আমি জানি। একদিকে দুনিয়ার সমস্ত সুখ, ঐশ্বর্য্য, অন্যদিকে ছোট ছেলেমেয়ের পাল, কোন দিকে গিয়ে তুমি বসবে তা তো আমার অজানা নয়।

সতী মাথা নিচু করল। এর চেয়ে সত্য কথা বোধ হয় আর নেই। এখন তো খুব হাতের কাছে খুকু এসেছে। তাকে বুকে চেপে, চটকে অনির্বচনীয় সুখ। এর আগে যখন কেউ ছিল না, সামনে পিছনে অন্ধকারের স্রোত, তখনও একটা শিশুকণ্ঠের কাকলি শোনার জন্য সতীর অদেয় কিছু ছিল না। তখনকার কথা একটিও ভোলে নি সতী।

জন মজুর খাটছে বাগানে। জানলার গরাদ চেপে সতী ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে। নড়বার নাম নেই। আতাগাছের নিচে হৃষ্টপুষ্ট একটি শিশু। মজুরনী ছায়ায় শুইয়ে রেখে কাজ করছে। তেরচা ভাবে রোদের ছটা মুখে এসে পড়তেই শিশুটি কঁকিয়ে কেঁদে উঠল। আশ্চর্য মা তো! একবার চেয়েও দেখল না, এক পা এগিয়ে আসাও নয়, ঝুড়ি-বোঝাই মাটি নিয়ে এধার ওধার করতে লাগল।

এদিক ওদিক চেয়ে সাবধানে সতী বাগানে নেমে এসেছিল। পা টিপে টিপে গিয়ে শিশুটিকে একেবারে কোলের মধ্যে। কালো রং, নিটোল হাতপা। নরম তুলতুলে। বুকের মধ্যে চেপে ধরে আশ আর মেটে না। আদর করার মুখেই বাধা। পিসশাশুড়ী জানলায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

ও কি বৌমা, ছি, ছি, ছোট জাতের ছেলেকে ওই রকম বুকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছ। যাও, যাও নামিয়ে রেখে স্নান করে এস।

ছেলেটাকে নামিয়ে রেখেছিল, স্নানের ঘরেও ঢুকেছিল, কিন্তু সতী স্নান করে নি। জলের ধারায় স্পর্শ মুছে যাবে যে।

গীতা অধীর হয়ে উঠল, ঠিক সাড়ে দশটায় বাস ছাড়বে। আপনাকে এসে খবর দিয়ে যাব।

গীতা চলে যাবার পর সতী লীলার পাশে এসে বসল, আমি যাব না বৌরানী।

কেন?

আমি মাঝে মাঝে ভুলে যাই এ জায়গা আর আমাদের নয়, দত্ত সায়েবের। এখানকার গাছপালা, জলমাটি সব। হয়তো মানুষগুলোও।

সব মানুষগুলো নয় দিদি। অন্তত একজন তো নয়ই। লীলা হাসল।

সত্যি আমার যাওয়া বোধ হয় উচিত নয়, না 'বৌরানী? সতীর মনে সন্দেহের দোলা।

বিরোধ করা সাজত দিদি যখন আমাদের শক্তি ছিল, আভিজাত্যের দম্ভ ছিল। এখন বিরোধ করতে যাওয়ার চেষ্টাই হাস্যকর। সোজাসুজি ভাবে দত্ত সাহেবের কাছে মাথা নোয়াব না কোনদিন, অন্তত আমি তা পারব না, কিন্তু তার কল্যাণকর প্রচেষ্টায় যোগদান করব না, এমন আমি কোনদিন বলি নি। যার স্বামী দত্ত সায়েবের খিদমত খাটতে বিদেশ বিভুঁয়ে পড়ে আছে, এ অভিমান তার সাজে না। লীলা একটু থামল। ভারী গলার আওয়াজ। জল-চকচক দুটি চোখ। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে বলল, তুমি নন্দনকাননে যেতে পার দিদি। আমি তো দোষের কিছু দেখছি না।

সতী চুপ করে রইল। আনমনে আঁচলটা আঙুলে জড়াল কিছুক্ষণ, তারপর উঠে পাশের ঘরে চলে গেল।

সারাটা দিন লীলা একলা। নিস্তার খাওয়া-দাওয়া সেরে পাশের গাঁয়ে গেছে আত্মীয়ের বাড়ি। খুকুর পাশে শুয়ে সময় কাটাল। ঘুমোবার বৃথা চেষ্টা। এ পাশ ও পাশ করে উঠে পড়ল। হঠাৎ কি মনে হতে চাবি ঘুরিয়ে আলমারি খুলল। থাক থাক শাড়ি। নিচে কোঁচানো ধুতি কয়েকটা। মাদ্রাজী চাদর, জরির কল্কা। তার তলা থেকে সন্তর্পণে লীলা ছবিটা বের করল। দামী শাল কাঁধের ওপর ফেলা। হাতে রুপো-বাঁধানো হরিণমুখো লাঠি। পায়ে নাগরা। অপূর্ব মুখশ্রী। পৌরুষের কাঠিন্যের সঙ্গে লাবণ্যের মিশেল। জমিদার শেখরনাথের সঙ্গে শিল্পী শেখরনাথের সংমিশ্রণ। চেয়ে চেয়ে আশ যেন মেটে না। এমন কেন হল? ঈশান কোণে মেঘের ইসারা। আচমকা ঝড় উঠল। ধুলোর ঘূর্ণি। সারা আকাশ ছেয়ে গেল কালো মেঘে। ঝড় যখন থামল, তখন সর্বনাশ হয়ে গেছে। স্নেহ প্রেম ভালবাসা দিয়ে বাঁধা নীড় নিশ্চিহ্ন। মনের

মানুষ উধাও। কিন্তু এ মেঘ তো কেটে যেতে পারে। ফিরে আসতে পারে আলো ঝলমল দিন। আগের সম্পদ সম্ভ্রম, আভিজাত্য এসব কিছু লীলা ফিরে চায় না, শুধু আগের দিনের মানুষ ফিরে আসুক, পুরনো দিনের বুকভরা প্রেম ভালবাসা নিয়ে।

খুব আশা করেছিল একদিন হীরু বাগ্দী এসে দাঁড়াবে দরজার গোড়ায়। প্রথমে গলার শব্দ তারপর লীলা মুখ তুলতেই জানাবে ছোট হুজুরের আর একখানা চিঠি এসেছে। কথার সঙ্গে সঙ্গে চিঠি এগিয়ে দেবে। এবার আর ছ-সাত লাইনের চিঠি নয়। পুরো একপাতা লিখেছেন শেখরনাথ। বাইজী খোঁজার কাজ শেষ। এবার ঘরে ফিরে আসছেন। ঘর ছেড়ে বাইরে বাইরে ঘোরা আর ভাল লাগছে না। এমনি করে পথে পথে নটীর অনুসন্ধান। তবলচির তল্লাশ। বাড়ীর লোকের কথা মনে পড়ছে। কাজের অবসরে মনের দিগন্তে খুকুর মুখ ভেসে আসছে। লীলার মুখও। ঘরে ফেরার ডাক কানে আসছে। পথ আর ভাল লাগছে না।

লীলার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল শেখরনাথের ধূলি-ধূসরিত চেহারা। সারা মুখে ক্লান্তির ছাপ, অবসাদের ছায়া। আস্তে আস্তে ফটক পার হয়ে বাড়ির মধ্যে এসে ঢুকলেন। দাঁড়ালেন ঘরের মাঝ বরাবর।

লীলা।

বল।

চল আমরা কোথাও চলে যাই। এ জায়গা ছেড়ে অনেক দূরে। এখানে থাকলে আমি বাঁচব না, আমাকে বাঁচাতে পারবে না তুমি। এ বাড়ির আওতা আমাকে ছাড়তেই হবে। যেমন করে হোক। এ বাড়ির অদৃশ্য আত্মা হাতছানি দিয়ে ডাকে আমাকে। বাতাসে নূপুরের নিক্কণ, কাচের গ্লাস আর ডিকাণ্টারের ছোঁয়াছুঁয়ির শব্দ। মল্লিক-বাড়ির আভিজাত্যের প্রেতমূর্তিটা খল খল হাসির আওয়াজে আমায় ভয় দেখায়। এখান থেকে সরে যেতে হবে আমাকে।

গাল বেয়ে লীলার চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। বেদনার নয়, আনন্দের ধারা। এ যে লীলার মনের কথা। ওর দিনের চিন্তা, নিশীথ রাত্রির প্রার্থনা। ভরতপুর থেকে অনেক অনেক দূরে। মল্লিক বংশের সব-খোয়ানো বংশধর নয়, মল্লিক-বাড়ির অভিশপ্ত বধূও না, কেবল দুটি পুরুষ রমণী, অন্য কোন পরিচয়

নেই, অন্য কোন ঠিকানা নয়। নতুন করে জীবন শুরু করবে। কোলিয়ারির গভীর অন্ধকারে, দিগন্ত-ছোঁয়া কর্ষিত মাটির বুকে, কারখানার মেশিনের চাকার আবর্তনে যে জীবন ছড়ানো, যে প্রাণস্পন্দনের ছন্দ, তাই আহরণ করবে। এতদিন কিংখাবের তাকিয়া ঠেস দিয়ে দামী মসনদের ওপর বসে যে জীবন তিল তিল করে নষ্ট করেছিল, অপচয় আর অপব্যয়, তারই ঋণ শোধের প্রস্তুতি।

হঠাৎ একটা শব্দে লীলার স্বপ্ন খানখান। ধূলো উড়িয়ে গরুর গাড়ির সার চলেছে। ভিনগাঁয়ের গাড়ি। শাক সব্জি তরিতরকারি নিয়ে চলেছে হাটে। গরুর গলায় বাঁধা ঘণ্টার শব্দ, গাড়োয়ানের চীৎকার, সব মিলে আর্তনাদের মতন।

লীলা জানলা থেকে সরে এল। খুকু নিজের মনে কখন ঘরের কোণে গিয়ে হাজির হয়েছে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা বেহালাটা নিজের কুক্ষিগত করেছে। লীলা ছুটে গিয়ে ধরবার আগেই গোটা দুয়েক তার ছিঁড়ে গুটিয়ে গেল। মোলায়েম শব্দ করে। মাকে আসতে দেখেই খুকু সাবধান হয়ে গিয়েছিল, বেহালা ছেড়ে ছড়টা হাতে তুলে নিল।

অনেক কষ্টে খুকুকে লীলা কোলে করে সরিয়ে আনল। মিষ্টি ধমক দিল, দুষ্টু মেয়ে কোথাকার, দিলে তা বাপের বেহালাটা ভেঙে? মানুষটা ফিরে এলে আমি কি বলব?

একদৃষ্টে খুকু মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। কি দেখল কে জানে। খিলখিল করে হেসে মায়ের বুকে লুটিয়ে পড়ল।

লীলার খেয়াল হল। বেলা পড়ে এসেছে। বাইরে সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকার। এখনও যে সতী ফিরল না। হীরু বাগ্দী একটু পরেই আলো জ্বালাতে আসবে, তার মুখেই সব শোনা যাবে। মানুষটা সেই সকাল বেলা গেছে, বেলা গড়িয়ে এল, সন্ধ্যা হয় হয়, বনভোজনের পালা কি এখনও মিটল না?

নিস্তার আর হীরু বাগ্দী প্রায় এক সঙ্গেই ঢুকল।

তুমি নন্দনকানন থেকে কখন ফিরলে হীরু।

আমি তো অনেকক্ষণ ফিরেছি মা। শহর থেকে নতুন সায়েবের কাছে দুজন বিলিতি সায়েব এসেছেন। কাল থেকে তাঁরা শিকারে যাবেন, তারই বন্দোবস্ত করার জন্য তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হল।

কিন্তু দিদি তো ফেরেন নি এখনও।

এখনও ফেরেন নি? বাতি জ্বালতে জ্বালতে হীরু ফিরে দাঁড়াল কোমরে দুহাত দিয়ে। কিন্তু ছেলেমেয়েদের একটা মোটর বাস যেন দেখলাম কাছারী বাড়ির সামনে। বোধ হয় এখনি এসে পড়বেন। বড়মাকে আসবার সময় দেখলাম এক পাল ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে দীঘির পাড়ে বসে গল্প করছেন।

লীলার দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে হীরু আর দাঁড়াল না। দুহাত জোড় করে নমস্কার করে বাইরে চলে গেল।

লীলা জানলায় গিয়ে দাঁড়াল। আর নয়, এইবার বারণ করে দিতে হবে সতীকে। মাঝে মাঝে স্কুলে যাওয়া তবু এক রকম, এক দেয়াল, এক বাড়ি, কিন্তু মোটরে করে দূরে কোথাও যাওয়া ঠিক নয়। বাইরের যারা, তারা স্বভাবতই একটু কৌতূহলী হবে। কি ব্যাপার মল্লিক-বাড়ির বৌ, দত্তসায়েবের স্কুলে এত আগ্রহ। মাইনে-করা শিক্ষয়িত্রীদের মতন ছেলেমেয়ে সামলে সামলে বেড়াচ্ছে।

সতীকে ভাল করে বুঝিয়ে বলতে হবে। কিন্তু বুঝিয়ে বলাই যে মুশকিল। মনে মনে বলবার কথা গুছিয়ে নিয়ে লীলা সতীর মুখের দিকে চাইলেই সব ভুলে যায়। কিছু মনে থাকে না। উদাস চোখের দৃষ্টি, সারা মুখে সারল্যের আমেজ। সামাজিক রীতিনীতি, দোষত্রুটি কিছুই নজরে পড়ে না। ভালো মন্দ সৎ অসৎ সব যেন ওর আওতার বাইরে।

লীলা রান্নাঘরের কাছ বরাবর খুকুকে দুধ খাওয়াচ্ছিল, মোটরের আওয়াজ হতেই খুকুকে নিস্তারের কাছে দিয়ে উঠে পড়ল। চৌকাঠ পেরিয়ে এ ঘরে এসেই থমকে দাঁড়াল। উজ্জ্বল আলোয় সব পরিষ্কার। খাটের পায়ায় মাথা রেখে সতী নিঃঝুম। মাথার কাছে কাপড়টা অনেকখানি ফেঁসে গেছে, জায়গায় জায়গায় ধুলোকাদার ছাপ, চোর-কাঁটার সার। স্পন্দমান দেহ দেখে লীলার মনে হল সতী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

দিদি! লীলা এগিয়ে এল। কি সর্বনাশ হল? পোশাকের এমনি হাল, মুখ লুকিয়ে এমন করে কাঁদছে কেন সতী?

কাছে বসে গায়ে হাত রাখতেই সতী হাঁউমাঁউ করে কেঁদে উঠল। লীলার কোলে মুখ গুঁজে।

দিদি, তোমার পায়ে পড়ি দিদি, অমন কোরো না, কি হয়েছে বল।

লীলা জোর করে দু হাতে সতীর মুখ তুলে ধরল। নিমীলিত চোখ, হাওয়া-লাগা ঝাউ গাছের পাতার মতন ঠোঁট দুটো থরথরিয়ে কাঁপছে। অশ্রুর বন্যার যেন শেষ নেই।

প্রায় আধ ঘণ্টা, কি আরও বেশী। একবার লীলার মনে হল কোনদিন বুঝি এ কান্না থামবে না। অন্তহীন স্রোত, বিরামহীন।

তারপর আঁচল দিয়ে চোখ মুছে সতী উঠে বসল। হাত দিয়ে খুলে যাওয়া চুলের রাশ বেঁধে নিল। চোখে আর জল নেই, আগুনের ছিটে। নিশ্বাস রোধ করে লীলা শুনল।

নন্দনকাননের সংস্কার চলেছে। বাড়তি ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে অনেকটা ফাঁকা। কাঁচের ঘরের মধ্যে নতুন ধরনের ফার্ন। দুপুরের দিকে ছেলেমেয়েরা খেতে বসলে গীতার সঙ্গে গাছপালা দেখতে হট হাউসের মধ্যে ঢুকেছিল দুজনে। স্তূপাকার টব। এধারে ওধারে ঘন ঝাউ গাছ। নানারকমের পাতাবাহার। ঝুপসী অন্ধকার। দেখতে দেখতে হঠাৎ পিছন ফিরেই সতী চমকে উঠেছিল। গায়ের রক্ত হিম। ঠিক দরজার গোড়ায় দত্তসায়েব। পরনে সাহেবী পোশাক। মাথায় শোলার টুপি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছেন।

তারের জাল ধরে সতী টাল সামলেছিল। এগোতে পারে নি। দুটো পা-ই ঠক ঠক করে কাঁপছে। পা বাড়াতে গেলেই ছিটকে পড়ে যাবে ফার্নগাছের ওপরে।

কেমন লাগছে বলুন? টুপিটা খুলে হাতে নিয়ে দত্তসায়েব জিজ্ঞাসা করেছিলেন। হাসি না থামিয়ে।

সতী উত্তর দিতে পারে নি। সামনের দিকে চেয়ে দেখেছিল। নিবিষ্ট মনে গীতা কি একটা গাছের পাতা পরীক্ষা করছে। সাড়া নেই।

ভারী জুতোর মস মস শব্দ। নিকট থেকে নিকটতর। দত্তসায়েব আরো কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। একেবারে গা ঘেঁষে।

কি, কথা বলবেন না? এত নিষ্ঠুর কেন আপনি? আমি কি দোষ করেছি? কোন অপরাধে অপরাধী দাস?

সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে সতী শুধু একটা কথা উচ্চারণ করতে পেরেছিল, ছিঃ! শুধু একটা শব্দ। কিন্তু তার মধ্যেই উজাড় করে দিয়েছিল মনের সমস্ত ঘৃণা, সমস্ত বিদ্বেষ।

দত্তসায়েব অটল, অবিচলিত। দু হাত প্যাণ্টের পকেটে ডুবিয়ে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন।

সরুন, আমি না হলে চীৎকার করব।

ওসব ভয় আমাকে দেখাবেন না দেবী। আর চীৎকারই বা আপনি করতে যাবেন কেন? ও তো কাপুরুষের লক্ষণ। বিচার করে দেখুন। মল্লিক-বাড়ি কি দিয়েছে আপনাকে? কতটুকু। মদ্যপ দুশ্চরিত্র শেখরনাথ, যার জীবনের পরিধি শুধু বাইজী আর মদ। শেখরনাথের স্ত্রী পথ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে। আভিজাত্যের দম্ভটুকুই আছে, সম্পদের লালসা। তাঁর ধারণা শেখরনাথ দুবাহু মেলে আবার একদিন বুকে টেনে নেবেন তাঁকে। প্রেমের উত্তাপে নিভন্ত সম্পদের শিখা আবার জ্বলে উঠবে। এ অন্ধ বিশ্বাস ভেঙে যাবার আর দেরি নেই। কিন্তু আপনার কথা স্বতন্ত্র। মন্দারগঞ্জের আজ হয়তো কিছু নেই, কিন্তু তার ঐতিহ্যের কথা আমার অজানা নয়। তেত্রিশটা গাঁ আপনার বাপের .তাঁবে। কিসে গেল তাও শুনেছি। হাসপাতাল, দরিদ্রনিকেতন, মক্তব, শিক্ষায়তন এই সবে দু হাতে সম্পদ ছিটিয়ে ছড়িয়ে দেউলে হয়ে পড়েছিলেন প্রতাপনারায়ণ। সেই বাড়ির মেয়ে আপনি, এক লম্পটের ঘরণী হয়ে সারাজীবন কেবল দুঃখই পেয়ে গেলেন। আপনাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলল সবাই। মনের দিকে কেউ ফিরেও দেখল না। আপনার দুর্বার যৌবন, বুভুক্ষু হৃদয় সবই অতৃপ্ত রয়ে গেল। নিজেকে চেনবার আগেই খেলা শেষ।

প্রত্যেকটি কথা সুস্পষ্ট ভঙ্গীতে উচ্চারণ করেছিলেন দত্তসায়েব। একটি শব্দও সতী ভোলে নি। শুধু কানের ভিতরেই নয়, মরমেও বিঁধেছিল কথার শলাকা। শোনার ফাঁকে ফাঁকে এদিক ওদিক দেখছিল। কোথায় পালিয়ে যাওয়া যায়। গীতা উধাও। কোন ফাঁকে সরে পড়েছে। একটি মাত্র দরজা। সেটাই আগলে দত্তসায়েব দাঁড়িয়ে।

দত্তসায়েবের গলার আওয়াজেই আবার চমক ভেঙেছিল।

নিজেকে তিলে তিলে এভাবে নিঃশেষ করার কোন মানে হয়? আপনার এ রূপযৌবন অবহেলায় নষ্ট হবে? মাথা নিচু করে মানুষের বিচার মেনে নেবেন? দাঁড়াবেন না মাথা তুলে? উপভোগই যদি না করবেন, তবে মানুষজন্মে লাভ!

সতী বুকে সাহস এনেছিল। মাথার কাপড় টেনে দিয়ে সোজা হ'য়ে দৃপ্তকণ্ঠে

বলেছিল, পথ ছাড়ুন। আমি যাব। কয়েক পা এগিয়েও এসেছিল। তারপরই ঘটল সর্বনাশ।

সতী কিছু বোঝবার আগেই তার দুটো হাত দত্তসায়েব চেপে ধরেছিলেন। সজোরে। কাছে আনার চেষ্টা করতে করতে বলেছিলেন, আপনাকে প্রথম দেখার দিন থেকেই বুঝতে পেরেছি, সারা জীবন যাকে আমি খুঁজে বেড়িয়েছি, সে আপনি। বিশ্বাস করুন আমার এ কথার মধ্যে এতটুকু ভেজাল নেই। আমি নিজেও নিজের দিকে চাইবার অবকাশই পাই নি। কেবল টাকার পিছনে ছুটেছি। নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা। ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য সব জলাঞ্জলি দিয়েছি। যখন নিজের দিকে চাইলাম তখন যৌবনের জোয়ার শেষ হয়ে এসেছে। একটু দম নিলেন দত্তসায়েব, সতীর হাত দুটো তেমনি ভাবে ধরা।

আপনাকে আমি সহজভাবে চাই। ভরতপুরের রানী করব আপনাকে। আপনাকে ঘিরে এখানকার দৈনন্দিন জীবন আবর্তিত হবে। হাসপাতাল, সায়র, স্কুল, মন্দির সব গড়ে উঠবে আপনার নামে। মল্লিক-বাড়ি যা আপনাকে দেয় নি, উপেক্ষায়, অবহেলায় আপনার যে মনকে পিষে ফেলতে চেয়েছে, আমি তাই দেব আপনাকে, আপনার সেই মনকে সকলের সামনে তুলে ধরব। আপনি আমার হৃদয়ের রানী হবেন, দেশের লোকের প্রেরণা।

তারপরের ব্যাপারটা ঠিক কি হয়ে গেল সতীরও মনে নেই। লীলাকেও গুছিয়ে বলতে পারবে না। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে সবেগে হাত দুটো সতী ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল। দত্তসায়েব বোধ হয় তৈরী ছিলেন না। আচমকা ধাক্কায় জড়ো-করা টবের ওপর ছিটকে পড়ে গেলেন। অনেকগুলো টব গুঁড়িয়ে যাওয়ার শব্দ, দত্তসায়েবের অস্ফুট আর্তনাদ এইটুকু কানে গিয়েছিল। তারপর আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান হতে দেখল ঘাসের ওপর শুয়ে আছে আর গীতা পাশে বসে গালে কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। গীতার হাতটা সবেগে ঠেলে দিয়ে সতী উঠে পড়েছিল।

আমি বাড়ি যাব।

হ্যাঁ, এইবার তো সকলেই উঠব। আপনি জামাকাপড় চুলটুল ঠিক করে নিন।

সতী চুল ঠিক করতে এদিক ওদিক চেয়ে দেখেছিল। না. জানোয়ারটা কোথাও নেই। কিন্তু তার কলুষ স্পর্শ রয়েছে সতীর দুই মণিবন্ধে। লালচে দাগ। দাঁত দিয়ে কামড়ে এ দাগ তুলে ফেলা যায় না, কিংবা মাতঙ্গী নদীর জলে ধোয়া যায় না হাত দুটো। ঘষে ঘষে নিশ্চিহ্ন করা যায় না। কিন্তু নদীতে আর কতটুকু জল। চোখের জলে যা ধোয়া যায় না, মোছা যায় না, সাতসাগরের জল ঢেলেও সে দাগ ওঠানো সম্ভব নয়।

চলতে চলতেই সতী শুনতে পেয়েছিল গীতার গলা।

আপনি মেয়েমানুষ, লোকসান এতে আপনারই। পাঁচ কান করার চেষ্টা না করাই ভাল। হৈ চৈ করলে, কাদা ছিটোছিটি হবে, পাঁক আপনারই গায়ে লাগবে। সারা ভরতপুরে দত্তসায়েবের বিরুদ্ধে কেউ যাবে না, অন্তত না যায় তার ব্যবস্থা তিনি করবেন। কাজেই যা হয়েছে সেটা ভুলে যাওয়াই বুদ্ধির কাজ আর কথাটাও এমন কিছু অন্যায় নয়।

সতীর চোখের দিকে চোখ পড়তেই গীতা থেমে গিয়েছিল। রোষ নয়, বিরাগ নয়, সে চোখের দৃষ্টি সহজ মানুষের নয়। উদ্‌ভ্রান্ত, উন্মাদিনীর চাউনি।

মাঝরাতে একবার লীলার ঘুম ভেঙে গেল। বাতাসে কার গোঙানির শব্দ, খুব চাপা স্বরে কান্না ভেসে আসছে কানে। সতীর কান্না কি!

বিছানার ওপর লীলা উঠে বসল। কিছুক্ষণ কান পেতে শুনল। না, কান্না নয়। করোগেটেড টিনের ওপর দিয়ে বাতাসের আওয়াজ কান্নার স্বর নিয়েছে। জানলার খড়খড়ির ফাঁকে চোখ রেখে লীলা দেখল। আকাশে জমাট কালো মেঘের ভার। বিদ্যুতের আঁচড়। দূরে গাছের মাথাগুলো, নুয়ে নুয়ে পড়ছে। বুঝি বৃষ্টি আসবে।

মেঘের গর্জন হতেই খুকু চমকে কেঁদে উঠল। লীলা খুকুকে কোলে তুলে নিল। ভাল করে চাপা দিয়ে বিছানার এ পাশে সরে এল।

এতদিন দত্ত সায়েব হাত বাড়িয়ে ছুঁয়েছেন মল্লিক-বাড়ির সম্পদ আর ঐতিহ্য। তাঁর আঙুলের কসরতে মল্লিক-বাড়ির অদলবদল হয়েছে। দেয়াল ভেঙে, বাড়ির নক্সা বদলে নতুন রূপ নিয়েছে। দত্ত সায়েবের ইচ্ছায় এ বাড়ির চেহারা পাল্টেছে। কিন্তু সেটুকুতে তিনি পরিতৃপ্ত হন নি। ইট, কাঠ, পাথর

ডিঙিয়ে এবারে মানুষ ছুঁতে আরম্ভ করেছেন। অন্তঃপুরিকাদের মান মর্যাদা, সম্ভ্রম আর শুচিতা।

এতদিন পরে লীলার কেমন ভয় ভয় করল। বাদুড়ের কালো ডানা মেলে অমঙ্গল এগিয়ে আসছে। নন্দনকাননে যে লালসার সূত্রপাত, কোথায় তার শেষ, ভাবতেই লীলা শিউরে উঠল।

বৃষ্টি নয়, শুধু বাতাস। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে ধুলো আসতে শুরু করল। খড়খড়ি নামিয়ে লীলা এদিকে সরে এল। বিছানার মাঝ বরাবর।

কাল থেকে গীতা হয়তো আর আসবে না। এ বাড়িতে আসার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। দূতীগিরির অবসান। আসবে না, কিন্তু চোখাচোখি হলেই হাসবে মুখ ঘুরিয়ে। শেষ যে ঐতিহ্যটুকু আঁকড়ে ধরে দুটি বৌয়ের বাঁচবার প্রাণপণ প্রয়াস, তারও ইতি। জনার্দন নায়েবের কথাগুলো মনে এল। মান যাওয়া জান যাওয়ারই সামিল বৌরানী। কাদা ধুলো শুধু সতীর জামাকাপড়েই নয়, লেগেছে মল্লিক-বাড়ির অন্তঃপুরের মর্যাদায়। পশুর নখর-চিহ্নে সামাজিক পবিত্রতা শতছিন্ন, আবিল।

বিরোধের দেয়াল তুলে লীলা বাঁচতে চেয়েছিল, তা সম্ভব হয়নি। শামুকের মতন নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আত্মরক্ষা করার চেষ্টাও বুঝি ফলপ্রসূ হবে না। এখন একমাত্র উপায় বুক ঠুকে মুখোমুখি দাঁড়ানো। আঘাতের পরিবর্তে আঘাত। কিন্তু এ হাস্যকর প্রচেষ্টার পরমায়ু কতদিনের! একদিকে সহায়সম্পদহীনা দুর্বল দুটি বধূ, অন্যদিকে পরাক্রম, শক্তি আর দম্ভের প্রতীক দত্ত সায়েব। এ অসম যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা ভাবলেও লীলার শরীর ঝিমঝিম করে। এ অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করতে যিনি পারতেন, তিনিও আত্মবিক্রয় করেছেন শত্রুর শিবিরে। তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পাবার কোন আশা নেই।

কিন্তু আগের দিনের শেখরনাথ যদি শুনতেন সতীর হেনস্থার কথা, তবে কি চুপচাপ বসে থাকতেন নিস্পৃহ ভঙ্গীতে? আগুনের ভাঁটার মতন জ্বলে উঠত দুটো চোখ, শিরা-উপশিরা স্ফীত হয়ে উঠত উন্মত্ত আবেগে। রাইফেল হাতে ছুটে যেতেন দত্তসায়েবের কাছারিতে। তার পরের কথা আর ভাবতে পারে না লীলা। কি হত জানে না, কিন্তু এটুকু জানে আশেপাশের দশখানা গাঁয়ের লোক বলত, হুঁ, ছোট হুজুর হারেম অপবিত্র করার প্রতিশোধ নিয়েছেন।

পাগলা কুকুরকে যেমন ভাবে মানুষ গুলি করে, তেমনি করে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছেন দত্তসায়েবের কলিজা। অন্তঃপুরচারিণীর ইজ্জত মাটিতে মেশানোর উপযুক্ত শাস্তি।

সাবধানে লীলা খুকুকে পাশে শুইয়ে দিল। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে চাদরটা ঢাকা দিয়ে দিল গায়ে। দূরে কোথায় বৃষ্টি নেমেছে বোধ হয়। ভিজে হাওয়া, ঠাণ্ডার মিশেল।

খুকুর পাশে লীলা শুয়ে পড়ল বটে, কিন্তু ঘুম এল না। এ পাশ ও পাশ করল। দিনের বেলা হাজার গোলমালে, কাজকর্মের ঝঞ্ঝাটে নিজেকে ভুলে থাকে, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে হারানো দিনের সব কিছু রঙে রেখায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মনের সামনে। এদিক ওদিক ছড়ানো ছোট ছোট ঘটনার টুকরো। আগের দিনের উজ্জ্বল জীবন! মনের মানুষকে পাশে নিয়ে।

খুব ভোরে লীলার ঘুম ভেঙে গেল নিস্তারের হাঁউমাঁউ চীৎকারে।

নিস্তার একেবারে লীলার পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, সর্বনাশ হয়েছে বৌরানী।

হঠাৎ ঘুমভাঙা চোখে প্রথমটা লীলা কিছু বুঝতে পারে নি। সব অস্পষ্ট। উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা নিস্তারের স্পন্দমান দেহ, তার বিকৃত স্বরে কান্না, সব কিছু।

একটু একটু করে লীলা ধাতস্থ হল। উঠে বসে নিস্তারকে ঠেলা দিল, কি হয়েছে রে নিস্তার? ওঠ, কি হয়েছে বল!

নিস্তার কোন কথা বলল না। মুখে কাপড় চাপা দিয়ে আরো জোরে কেঁদে উঠল।

কি মুশকিল! বিছানা ছেড়ে লীলা উঠে পড়ল। ক্ষীণ একটা সন্দেহ। রাত্রেও দু একবার মনে এসেছে কিন্তু লীলা আমল দেয় নি। অন্য কথা ভেবেছে। আবোল তাবোল সব কথা। তবু সব কিছু ঠেলে সন্দেহের সাপ ফণা তুলেছে।

লীলা উঠে দাঁড়াতেই নিস্তারও উঠে দাঁড়াল। লীলার পিছন পিছন সতীর ঘরের চৌকাঠ বরাবর এসেই আবার ভেঙে পড়ল কান্নায়।

হাত দিয়ে পর্দা সরিয়েই লীলা থমকে দাঁড়াল। আবছা অন্ধকার। কাঁচের

শার্শীর ফাঁক দিয়ে ভোরের অস্পষ্ট আলো। কিন্তু দেখতে একটুও অসুবিধা হল না। ঝাড়লণ্ঠনের সঙ্গে শাড়ি বাঁধা। আর এক প্রান্ত সতীর গলায় ফাঁস দেওয়া। বোধ হয় টুলের ওপর দাঁড়িয়ে সর্বনাশের আয়োজন করেছিল। কাজ শেষ হতেই পা দিয়ে টুলটা ঠেলে দিয়েছে। কোণের দিকে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে সেটা। এক মাথা কোঁকড়ানো চুলের রাশ, পিঠে বুকে ছড়িয়ে পড়েছে। এ পাশ থেকে মুখ দেখবার উপায় নেই। মিনিট দুই তিন, তারপর আর লীলার কিছু মনে নেই। সামনের সব কিছু দুলে উঠেছিল। পায়ের তলার মাটিও।

জ্ঞান হতে লীলা দেখল নিজের বিছানার ওপর শুয়ে আছে। পাশে পাখা হাতে নিস্তার। এদিক ওদিক অচেনা কারা সব যেন ঘুরছে। বেলা অনেক।

খুব আস্তে, প্রায় ফিস্‌ফিসিয়ে লীলা ডাকল, নিস্তার।

নিস্তার লীলার দিকে ঝুঁকে পড়ল, কি বৌরানী?

কী হবে?

কি আর হবে বলুন? সর্বনাশের সুরু। পুলিশে বাড়ি ছেয়ে গেছে। হীরু বাগ্দী দত্তসায়েবকে খবর দিয়েছে।

নিস্তারের কথাগুলো অস্পষ্ট হয়ে এল, নিস্তারের মুখও। লীলা বালিশে মাথা রেখে আবার চেতনা হারাল।

অনেক পরে লীলা চোখ খুলল। যন্ত্রণায় মাথার শিরাগুলো ঝনঝন করছে। ভারী চোখের পাতা। কান্না জমাট হয়ে কণ্ঠনালীতে বাসা বেঁধেছে। অসহ্য ব্যথা গলার মধ্যে।

চোখ মেলতেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক একটি এগিয়ে এসে লীলার কাছে দাঁড়ালেন, কোন ভয় নেই মা। সমস্ত বিপদ কেটে গেছে। এবার আস্তে আস্তে উঠে বসে এঁদের কথার উত্তরগুলো দিয়ে দাও। এঁদের কর্তব্য এঁদের করতে হবে বৈ কি মা। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লীলা দেখল, প্রৌঢ় ভদ্রলোকের গলায় স্টেথস্কোপের মালা। বোধ হয় দত্তসায়েবের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তারই হবেন। দেয়াল ঘেঁষে আরো দুটি ভদ্রলোক। অঙ্গে পুলিশের পোশাক। এদিকে দাঁড়ানো দত্তসায়েবের সঙ্গে ফিস ফিস করে কি সব আলাপ করছেন।

লীলা উঠে বসবার চেষ্টা করতেই নিস্তার পিঠের দিকে দুটো বালিশ উঁচু করে দিয়ে দুধের গ্লাস এগিয়ে দিল, গরম দুধটুকু খেয়ে নিন বৌরানী।

লীলা মাথা নাড়ল।

প্রৌঢ় ডাক্তারটি নিস্তারের হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে নিজে ধরলেন লীলার সামনে, এটুকু খেয়ে নাও মা। দুর্বলতা কাটবে। বুড়ো মানুষের কথা ঠেলতে নেই।

ডাক্তারবাবুর দিকে লীলা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখল। কি বুঝল কে জানে, আপত্তি না করে চুমুক দিয়ে খেয়ে নিল দুধটুকু। নিস্তার পাশে-রাখা তোয়ালে দিয়ে মুখটা মুছিয়ে দিল।

একটু বিরক্ত করব আপনাকে। দয়া করে কিছু মনে করবেন না। বুঝতেই পারছেন, এ ছাড়া আমাদের উপায় নেই। খাকি-পোশাক-পরা ভদ্রলোকটি এগিয়ে এলেন। বিছানার কাছ ঘেঁষে।

লীলা কিছু বলবার আগেই জিজ্ঞাসা করলেন, উনি কি ইদানিং অসুখটায় বড্ড কষ্ট পাচ্ছিলেন?

অসুখ? কার অসুখ। মুখ তুলতেই দূরে দাঁড়ানো দত্তসায়েবের সঙ্গে লীলার চোখাচোখি হল! জ্বলন্ত দুটি চোখ নিষ্পলক।

কথা বলতে গিয়ে জড়িয়ে গেল। হাত দিয়ে কপালের জমে-ওঠা ঘাম লীলা মোছবার চেষ্টা করল।

আপনার মনের অবস্থা আমরা সবাই বুঝতে পারছি। নিজের পরিবারে এমন একটা ভয়াবহ ব্যাপার ঘটে গেলে, মানুষের মাথা ঠিক রাখাই কঠিন। তবে সতীদেবীর লেখা চিঠি আমাদের হাতে এসেছে। বালিশের তলাতেই রেখে গিয়েছিলেন।

চিঠি? দিদির চিঠি?

হ্যাঁ, তাতে সব কিছুই তিনি খুলে লিখেছেন। শূলবেদনা সত্যিই মানুষকে পাগল করে তোলে। যন্ত্রণার তাড়নায় রোগী বাধ্য হয়েই এসব করে। পুকুরে ঝাঁপ দেয়, নয় তো এই রকম আড়কাঠে দড়ি বেঁধে আত্মহত্যা করে। এমন কেস্ এর আগেও আমাদের হাতে এসেছে। মোহনপুরের কার্তিক মজুমদারের কথা তোমার মনে আছে সেন? ভদ্রলোক কূয়োর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন।

শেষের কথাগুলো ভদ্রলোক সহকারীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন।

শূলবেদনার যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করেছে মল্লিক-বাড়ির বড় বৌ! যন্ত্রণা সহ্য

করতে না পেরে মাঝরাতে উঠে পরনের শাড়ি গলায় জড়িয়েছে। তিলে তিলে রোগের ব্যথা ভোগ করার চেয়ে এই তো ভাল। একরাতে নিজেকে নিঃশেষে মুছে ফেলা। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটি কথা নিজে লিখে রেখে গেছে। ওর মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। দুরারোগ্য ব্যাধি ছাড়া আর কাউকে অপরাধী করা চলবে না।

একবার লীলার ইচ্ছা হল খুব জোরে চীৎকার করে ওঠে। না, না সব কিছু মিথ্যা, সব সাজানো। কে তোমাদের এমন মনগড়া কথা বলতে শিখিয়েছে, কিসের জোরে মল্লিক-বাড়ীর বৌয়ের নামে তোমরা অযথা অপবাদ দিতে সাহস কর, তা আর অজানা নেই লীলার। লোহার শিকলের চেয়ে অনেক দামী সোনার শিকল। স্তূপীকৃত রূপার ঔজ্জ্বল্যে তোমাদের দৃষ্টি অন্ধ। সত্যকে দেখার অবকাশ নেই।

এর পাশাপাশি লীলার আর একটা কথাও মনে পড়ে গেল। দত্তসায়েবের মুখোস ছিঁড়ে কুটিকুটি করে দেওয়া দরকার। পশুর চামড়া অঙ্গে জড়িয়ে মানুষের সমাজে অবাধে বিচরণ করবে। সুযোগ পেলেই থাবার আঘাতে ঘায়েল করবে মানুষকে! কামনা-কলুষ দৃষ্টি দিয়ে লেহন করবে সবাইকে। তার চেয়ে সোজা হয়ে বসে শুকনো গলায় পুলিশের কাছে সব কিছু বলে দেওয়াই তো ভাল। নন্দনকাননের জঘন্য কাহিনী। ষড়যন্ত্রের জাল ছড়িয়ে দুর্বল রমণীকে নিজের কুক্ষিগত করার কদর্য ইতিকথা। সারা ভরতপুর চিনুক নতুন সায়েবকে। সব শুনে ঠিক থাকতে পারবে তারা! কোদাল, গাঁইতি, লাঠি, শড়কি হাতের কাছে যা কিছু পাবে তাই নিয়ে দাঁড়াবে সার দিয়ে। দল বেঁধে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে। ভরতপুরের সমস্ত প্রজা, পুরুষানুক্রমে যারা অঞ্জলি পেতে এতদিন মল্লিকবংশের কৃপা কুড়িয়েছে, আপদে বিপদে বুক দিয়ে পড়েছে। ধানের মঞ্জরী নিয়ে রক্তাক্ত করেছে খেতের আল। আজ এতবড় একটা সর্বনাশের দিনে কেউ এগিয়ে আসবে না মল্লিক-বাড়ির সম্মান বাঁচাতে!

কিন্তু তাতেই সম্মান বাঁচবে মল্লিক-বাড়ির? শাখা প্রশাখায় প্রসারিত হয়ে মল্লিক-বাড়ির বড় বৌয়ের অপমান আর লাঞ্ছনার কাহিনী মহীরুহের রূপ নেবে না? গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়বে এ কাহিনী লোকের মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে। মানুষের মন সমান নয়। শুধু দত্তসায়েবকেই অভিশাপ দেবে

এমন নয়, সতীরও কুৎসা কীর্তন করবে। অসূর্যম্পশ্যা বধূ নন্দনকাননে বিহার করবে পরপুরুষের সঙ্গে এই বা কেমন কথা! আসল কথা অনেকই বুঝবে না। কুৎসার কাদা ছিটিয়ে সব কিছু পঙ্কিল করে তুলবে।

ঠোঁট কামড়ে লীলা চিন্তা করে নিল। শূলবেদনা! তাই হোক। প্রকৃত ঘটনা জানুক শুধু তিনজন। মল্লিক-বাড়ির ছোট বৌ, এ উপকথার নায়ক দত্ত-সায়েব আর তাঁর হীন কাজের দূতী গীতা। আরো একজন জানবে। কিন্তু তাঁর জানা না জানা বুঝি সমান। পশুপতিনাথের মন্দিরের প্রস্তরময় বিগ্রহ। জড়, নিশ্চেতন। দত্তসায়েবের কারখানা মন্দির আড়াল করে ফেলেছে। শুধু মন্দির নয়, বুঝি দেবতাও আড়াল হয়ে গেছে লোহা ইস্পাত আর বয়লারের পিছনে।

নড়ে চড়ে লীলা সোজা হয়ে বসল। ক্ষীণ গলায় বলল, আমার শরীর খুব দুর্বল, আসল কথা তো দিদির চিঠিতেই জানতে পেরেছেন, নতুন কিছু আমি আপনাদের শোনাতে পারব না।

এমন কিছু বেশী কথা নয়, কিন্তু এইটুকু বলেই লীলা হাঁপাতে লাগল। দ্রুত স্পন্দন বুকের মধ্যে। এ প্রহসন বন্ধ না হলে আবার বুঝি চেতনা হারাবে।

পুলিশের লোকটি কি একটা বলার চেষ্টা করতেই বাধা পেলেন। দত্তসায়েব এগিয়ে এসে ভদ্রলোকের কাঁধে হাত রাখলেন তারপর ইসারায় তাঁকে দরজার কাছে নিয়ে গেলেন। মিনিট কয়েক ফিসফাস। নতুন কোন ষড়যন্ত্রের প্রস্তুতি, কিংবা পুরানো মিথ্যাচারের ওপরে আবার অসত্যের পলিমাটি চাপা দেওয়া।

কিছুক্ষণ পরেই পুলিশের লোকটি বিছানার কাছে ফিরে এলেন, আপনার মনের অবস্থা বুঝে আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাই না। তার চেয়ে একটা. বিবৃতি আমি লিখে দিচ্ছি, আপনি দয়া করে একটা সই দিয়ে দেবেন। ব্যাপারটা করুণ, তা বুঝি, কিন্তু আপনিই বলুন এমন ভাবে জীবনভোর কষ্ট পাওয়ার চেয়ে এ রকম ভাল। অবশ্য শাস্ত্রমতে আত্মহত্যা পাপ।

লীলা চোখ তুলে চাইতেই লোকটি থতমত খেয়ে থেমে গেলেন। দু হাত জোড় করে বললেন, আচ্ছা নমস্কার। আসি। বিকেলের দিকে কাগজটা পাঠিয়ে দেব। পড়ে একটা সই করে দেবেন।

জানলায় বসে বসে লীলা সবই দেখল। দলে দলে লোক এসে জড় হল। নানারকমের ফুল। খাট সাজানো হল। স্কুলের শিক্ষয়িত্রীরাও এসে দাঁড়ালেন। গীতাকে দেখা গেল ওপাশে। অল্পক্ষণের জন্য। শেষদিকে লীলা আর দেখতে পারল না। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে সরে এল জানলার পাশ থেকে।

সন্ধ্যার দিকে হীরু এসে দাঁড়াল। ভিজে কাপড়, সদ্য স্নান করে ফিরেছে। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েই হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, কি সর্বনাশ হল মা। এমন একটা রোগে ভুগছিলেন, একটা দিনের তরেও জানতে পারি নি। তাছাড়া এমন করে নিজেকে শেষ করার আগে ডাক্তার বদ্যিকে দেখানোও তো উচিত ছিল?

হীরুর কান্নার শব্দে নিস্তার এসে দাঁড়িয়েছিল। খুকুকে কোলে করে। হীরু থামতেই গালে আঙুল দিল। দু চোখে অগাধ বিস্ময়। বলল, যা হোক একটা বোঝালেই হল। শূল বেদনার যন্ত্রণা হলে আমরা আর জানতে পারতাম না? আমার পিসির ছিল, দেখেছি তো। মানুষ একেবারে কাটা ছাগলের মত ছটফট করে। সে সব কিছু নয়, কথা শেষ করে দু হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল। বিড় বিড় করে ঠোঁট নেড়ে কি বলল, তারপর লীলার দিকে ফিরে চড়াল গলার আওয়াজ, ওসব অপদেবতার কাণ্ড। নন্দনকাননেই যে ওঁরা থাকেন। দিন-দুপুরে ওসব জায়গায় যেতে নেই, কখন কার গায়ে পা লেগে যায় ঠিক আছে। ঠিক প্রতিশোধ নেবেন। গলায় দড়ি দিয়ে হোক, জলে চুবিয়ে হোক, তার প্রাণ ওঁরা নেবেনই।

লীলা নিস্তারের দিকে চাইল। শুরুতেই না থামালে এখনই আবোল তাবোল বকতে আরম্ভ করবে। ভূতপ্রেতের অলৌকিক সব কাহিনী।

খুকুকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এস নিস্তার। একটু চাপড়ালেই ঘুমিয়ে পড়বে।

নিস্তার আর দাঁড়াল না। খুকুকে নিয়ে ভিতরে চলে গেল।

এদিক ওদিক চেয়ে লীলা মৃদু গলায় ডাকল, হীরু।

মা। দরজার চৌকাঠ চেপে হীরু বসল।

শূল বেদনা দিদির কোনদিনই ছিল না।

আমিও তো তাই বলছিলাম। এ বাড়িতে আমিও তো পুরোনো হয়ে গেলাম; বড় মার এমন একটা অসুখ থাকলে নিশ্চয়ই জানতে পারতাম।

নিজের মান বাঁচাতে দিদিকে এ কাজ করতে হয়েছে। এ ছাড়া আর উপায় ছিল না। কথার সঙ্গে লীলার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল জলের ধারা।

আপনার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না মা।

বুঝতে পারছ বৈ কি। যা শুনছ তা বিশ্বাস করে উঠতে পারছ না। তাই নয়?

বিশ্বাস করুন মা, হেঁয়ালি একবর্ণও আমি বুঝতে পারছি না। মল্লিক-বাড়ির সব হয়তো গেছে মা, জমজমাট বাড়ি, লোকলস্কর সব। কিন্তু আকাশছোঁয়া ইজ্জত, কার সাধ্য তাকে মাটিতে নামায়।

হীরু বাগ্দীর দু চোখে আগুনের স্ফুলিঙ্গ। পুরোনো দিনের লঠিয়াল হীরুই বুঝি জেগে উঠেছে। মল্লিক-বাড়ির সামান্য অবমাননায় দুর্বার, অপ্রতিরোধ্য।

ভরতপুরের সব কিছু গ্রাস করেও যার ক্ষুধা মেটে নি, এমন একটা মানুষের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয় হীরু। মেয়েমানুষের ইজ্জতকে মাটির ঢেলার মূল্য দেয়, টাকাপয়সা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার মতন, এ বাড়ির বৌদের নিয়েও ছিনি-মিনি খেলতে চায়, ভরতপুরে এমন লোক একজনই আছে। তার কাছে যে না আত্মবিক্রয় করবে, তাকেই এমন করে মরণ বরণ করতে হবে। এ ছাড়া আর বাঁচবার অন্য পথ নেই।

মা, হীরু গর্জন করে উঠে দাঁড়াল। গম্ভীর গলার আওয়াজে জানলার গরাদ, দরজার কাচের শার্শী ঝনঝন করে উঠল। সিক্ত কাপড়ের ওপর দিয়ে পাক খেয়ে ফুলে উঠল মাংসপেশী। গোঁফের রোঁয়াও স্ফীত হয়ে উঠল।

দরজার পাশে দাঁড় করানো বাঁশের লাঠিটা সশব্দে হীরু লীলার পায়ের কাছে আড়াআড়ি ভাবে আছড়ে ফেলল, আদেশ করুন মা।

অনেকক্ষণ নিষ্পলক চোখে লীলা চেয়ে চেয়ে দেখল। এ দৃশ্য দেখে যেন আশ মেটে না। চোখ ফেরাতে ইচ্ছা হয় না। পুরোনো দিনের বই থেকে পাতা ছিঁড়ে সামনে দাঁড়িয়েছে লাঠিয়াল হীরু বাগ্দী। মল্লিক-বাড়ির বিশ্বস্ত অনুচর। রক্তের বদলে রক্ত, কলিজার বদলে কলিজা। শুধু হুকুম চায়। মনিবানীর সামান্য একটা অঙ্গুলি সঙ্কেত।

কিন্তু বড় দেরি হয়ে গিয়েছে। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে নত মস্তকে হুকুম হয়তো তামিল করা যায়, হুকুম করা যায় না।

তবু লীলার প্রাণ ভরে উঠল। কত বড় একটা সহায়, সম্বল, এ দুর্দিনেও মস্ত

বড় ভরসা। মুমূর্ষুর কঁকিয়ে কান্নার ফাঁকে ফাঁকে এমন বজ্রহুঙ্কার, এর দামও যে অনেক।

কিন্তু তোমার যে নতুন মনিব, হীরু? তার গায়ে একটু আঁচড় লাগলে, তোমার মাথা থাকবে না।

হীরু বাগ্দী নিজের মাথার কোনদিন পরোয়া করেছে, এমন কথা কি কোন-দিন শুনেছেন মা? জানি মা, সারা ভরতপুর নেমকহারামি করবে, চাঁদির মায়ায় পড়ে কেউ এগিয়ে আসবে না আমার পাশে, কিন্তু মা আপনার পায়ের ধুলো মাথায় থাকলে কাজ হাসিল না করে হীরু বাগ্দী কোনদিন ফিরবে না।

আস্তে আস্তে লীলা এগিয়ে এল। এমন মধুক্ষরা কথা কতদিন শোনে নি। যুগযুগান্ত ধরে শুনেও যেন তৃপ্তি হয় না। কিন্তু এত শুধু সর্বনাশ বাড়ানো। রক্তের ঢেউয়ে ভরতপুরের মাটি রাঙা হয়ে উঠবে। বিদ্বেষে নীল হয়ে উঠবে মানুষ। হীরু বাগ্দী জীবন দিতে পারে, শুধু জীবনই দেবে, কিন্তু মল্লিক-বাড়ির অন্তঃপুরের হারানো মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে পারবে না। তবে এ রক্তক্ষয়ের প্রয়োজন।

লীলা নীচু হয়ে লাঠিটা কুড়িয়ে হীরুর হাতে তুলে দিল। ধীর কণ্ঠে বলল, তোমার কথা মনে রইল হীরু। আজ নয় ভবিষ্যতে যখন প্রয়োজন হবে, ডাকব, এমনি করে এসে দাঁড়িয়ো।

কিন্তু এমন মানুষের কাছে কাজ করতে পারব না মা। চাকরিতে আমি ইস্তফা দেব।

আর কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাক হীরু। কয়েকদিনে মধ্যে ছোটবাবু ফিরে আসছেন। তিনি এলে আমরা ভরতপুর ছেড়ে চলে যাব। যে দিকে দু চোখ যায়। তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে।

যাব মা। আপনারা যেখানে যাবেন সেখানে আপনাদের সঙ্গে যাব।

যাবার আগে হীরু মাটিতে সোজা হয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল। উঠে দাঁড়িয়ে আর একবার মনে করিয়ে দিল, ঠিক নিয়ে যাবেন কিন্তু মা। ভুলে যাবেন না।

না, ভুলবে না। কিছু ভুলবে না লীলা! কোন কথা নয়। সারা ভরত-পুরে ছড়ানো মল্লিক বংশের আভিজাত্য আর সম্ভ্রম দিনের পর দিন সঙ্কুচিত

মল্লিক-বাড়ির মধ্যে আত্মগোপন করেছিল, কিন্তু নিষ্ঠুর ঘাতক তন্নতন্ন খুঁজে খুঁজে শাবলের আঘাতে সব কিছুর অবসান ঘটিয়েছে। ইঙ্গিত নয়, অস্পষ্ট কিছু নয়, লালসার প্রেতমূর্তিটা এবার মুখব্যাদান করে দাঁড়িয়েছে। আর নিস্তার নেই।

একমাত্র উপায় শুধু সরে যাওয়া। স্বামীকন্যার হাত ধরে অনেক দূরে কোথাও। একবার শেখরনাথকে বোঝাবে লীলা। পরে মাথা খুঁড়ে, দু হাত যোড় করে, চোখের জল ফেলে। কোন আপত্তি শুনবে না। রাজা-রাজা খেলা শেষ, আবার নতুন করে জীবন শুরু।

দরজার কড়ার আওয়াজ হ'তেই লীলার চমক ভাঙল। এমন সময় কে আবার এল। দরজা খোলাই আছে, তবু নিস্তারকে ডাকল, নিস্তার, দেখ তো, কে ডাকছে।

নিস্তারকে ডেকে দিয়েই লীলা চৌকাঠ পার হয়ে ভিতরে এসে দাঁড়াল।

মিনিট কয়েক। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে নিস্তার নিচু গলায় কার সঙ্গে আলাপ করল, তারপর ফিরে এসে দাঁড়াল লীলার কাছে, পুলিশ থেকে লোক এসেছে বৌরানী, কিসের সই চায়।

সই! কথাটা বলেই লীলার মনে পড়ে গেল। নিস্তারকে বলল, কাগজটা নিয়ে আয় তো নিস্তার।

নিস্তার বাইরে গিয়ে কাগজটা নিয়ে এল। হলদে লম্বা সাইজের কাগজ। বেশী নয় লাইন দশেক। কয়েক বছর ধরে প্রাণান্তকর এই ব্যাধির সঙ্গে কি ভাবে যুদ্ধ করে এসেছে সতী, তারই বিবরণ। কতদিন যন্ত্রণায় পাগল হয়ে লীলাকে বলেছে, যন্ত্রণার হাত এড়াতে তাকে আত্মহত্যা করতেই হবে। আফিং খেয়ে, গলায় দড়ি দিয়ে কিংবা খিড়কির পুকুরে ঝাপিয়ে পড়ে। আগের দিন রাত্রে নন্দনকানন থেকে সতী ফিরেছে প্রায় অর্ধচেতন অবস্থায়। যন্ত্রণায় অধীর হয়ে। অনেক রাত জেগে লীলা সেবা করেছে। ভোরে এমন একটা অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে, একথা ঘুণাক্ষরেও ভাবে নি।

অনেকবার লীলা পড়ল। অনেকক্ষণ ধরে। সারা মুখে রক্তের ঝলক। এই বিবৃতির তলায় স্বাক্ষর দিতে হবে। তার মানে হীন ষড়যন্ত্রের অংশীদার। প্রাণ গেলেও লীলা তা পারবে না। যত সংঘাতই নামুক তার জীবনে।

দুহাতে লীলা কাগজটা খণ্ড খণ্ড করে ফেলল। তারপর কাগজের খণ্ডগুলো

হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে বাইরে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল, এই নিন আপনাদের কাগজ। মিথ্যা বিবৃতিতে সই দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ছোকরা গোছের একজন পুলিশ এসেছিল। লীলার মুখচোখের চেহারা দেখে দু ধাপ নেমে দাঁড়াল, তারপর কাগজের টুকরোগুলো সযত্নে কুড়িয়ে নিয়ে ফটক পার হয়ে গেল। একটি কথাও না বলে।

॥ আট ॥

বাজনার শব্দে লীলা উঠে বসল।

একটা বিরাট জয়ঢাক, গোটা চারেক রামশিঙা সঙ্গে অগুনতি ঢোল আর কাঁসি। সমবেত ভাবে বাজিয়ে চলেছে, বাজনার তালে তালে আবলুস-রঙা জোয়ান চেহারার একজন চেঁচিয়ে কি সব বলছে। শব্দে কিছু শোনবার উপায় নেই।

জানলার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে লীলা দেখল। বাজনদারদের পিছনে গ্রাম্য লোকের স্রোত। কারখানার মজুররাও রয়েছে।

লীলা ঘুরে দাঁড়াল।

নিস্তার। নিস্তার!

নিস্তার পাশের ঘরেই ছিল। লীলার ডাকে উঠে দাঁড়াল। চৌকাঠ পার হয়ে এ ঘরে এসে বলল, ডাকলেন বৌরানী?

দেখ তো কিসের বাজনা। কি একটা বলছে কিন্তু আওয়াজের জন্য কিছুই কানে আসছে না।

নিস্তার খড়খড়ির ফাঁকে চোখ রেখে একবার দেখল তারপর গায়ের মাথার কাপড় ঠিক করে সিঁড়ি বেয়ে ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

পথচলতি একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতেই ব্যাপারটা বোঝা গেল। ফিরে লীলার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, কাল দত্তসায়েবদের দু নম্বর কারখানা খোলা হবে বৌরানী। সেই জন্য গানবাজনার আয়োজন করা হয়েছে। দেশবিদেশ থেকে সব গাইয়েরা আসবে। সাত দিন ধরে উৎসব।

এত কথা লীলার কানে গেল না। দেশবিদেশ থেকে সব গাইয়েরা আসবে।

এ বাড়ির, ছোটবাবু তো তাদের আনতেই ঘর ছেড়েছেন। তা হলে শেখরনাথও বুঝি ফিরে আসবেন।

কথাটা নিস্তারই বলল। পা মুড়ে লীলার কাছাকাছি বসে খুব আস্তে আস্তে।

ছোটবাবু ফিরে আসবেন না বৌরানী?

লীলা চমকে মুখ তুলল। ওর মনের নিভৃত কামনা ভাষা নিল আর এক জনের মুখে। তিলে তিলে একান্তে গড়ে তোলা স্বপ্ন। কিন্তু কি উত্তর দেবে লীলা। শেখরনাথের কোন খবরই তো তার জানা নেই। কেবল মাসান্তে দত্তসায়েবের পাঠানো টাকা হীরু বাগ্দীর মারফত।

সত্যি ফিরে আসছেন শেখরনাথ? ভাঙা সংসারের মাঝখানে এসে দাঁড়াবেন?

ছোটবাবু কি কিছু লেখেন নি বৌরানী? নিস্তার আবার প্রশ্ন করল।

অনেকদিন চিঠি পাই নি নিস্তার। খুব নিস্তেজ ঠেকল লীলার কণ্ঠস্বর। অনেক কষ্টে উদ্গত নিশ্বাস চাপল, চিঠি দেওয়ার ভারি যে অসুবিধা। এক-জায়গায় তো বেশীদিন থাকেন না। আজ কাশী, কাল আগ্রা, পরশু ফৈজাবাদ এই করে বেড়াচ্ছেন।

কথাগুলো লীলার নিজের কানেই কেমন বেখাপ্পা লাগল। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে চিঠি দেওয়া চলে না! নিয়মিত না হক, মাঝে মাঝে, কালে ভদ্রে বুঝি দেওয়া যায় না চিঠি। নিজের শরীর গতিকের খবর, স্ত্রীকন্যার কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা।

কথাগুলো শেষ করে লীলা মুখ তুলল না। কি জানি নিস্তারের চোখে যদি অবিশ্বাসের ঝিলিক থাকে।

হীরু বাগ্দী আজ দুদিন আসছে না। পুরো সপ্তাহটাই ছুটি নিয়েছে। দত্ত-সায়েব কি কাজে তাকে ভিনগাঁয়ে পাঠিয়েছেন। নূতন একটা লোক তার বদলে কাজ করছে। তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করাও চলে না।

কিন্তু আসার আগে শেখরনাথের একটা খবর পাঠানো উচিত বৈ কি। শুধু দু ছত্র। অমুক দিন অমুক সময়ে পৌঁছাচ্ছি, ব্যস এইটুকু। কিছু বলা যায় না। যা অদ্ভুত ধরনের মানুষ। হঠাৎ ভোরবেলা তল্পিতল্পা ঘাড়ে দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াবেন। খুকুর নাম ধরেই ডাকবেন কিংবা পুরোনো অভ্যাসমত

হাঁকাহাঁকি করবেন চাকরবাকরদের নাম ধরে। এমন যদি হয় ফিসফিসিয়ে লীলাকেই ডেকে বলেন।

সমস্ত শরীরে শিহরণ, সারা দেহের রক্ত ছুটি গালে। লজ্জার ছোঁয়ায় চোখের পাতা বুজে আসে। লীলা আঁচল দিয়ে কপালের ঘামের ফোঁটা মুছে নিল।

বিকালের দিকে গেটের সামনে মোটর দাঁড়াতেই লীলা ছুটে এল। শেখর-নাথ এসেছেন। স্টেশন থেকে টানা মোটরে। একেবারে বাইরে না বেরিয়ে জানলার পাল্লা খুলে লীলা পাশে দাঁড়াল।

শেখরনাথ নয়, দত্তসায়েব নামলেন। কোট-প্যাণ্ট-টাই-বাঁধা কেতাদুরস্ত পোশাক। নেমেই রুমাল দিয়ে কপাল মুছলেন, ঘাড়ের দুটো পাশ। নামলেন কিন্তু গেট পার হয়ে এগিয়ে এলেন না! নেমে-দাঁড়ানো ড্রাইভারকে কি একটা ইঙ্গিত করলেন।

গেট খুলে ড্রাইভার ভিতরে ঢুকল। শানের ওপর জুতোর কর্কশ শব্দ।

বাতি জ্বালানো হয়নি। আজকাল ঠিকমত জ্বালানোও হয় না। দত্তসায়েবের কাজ শেষ করে লোকটা অনেক দেরিতে মল্লিক-বাড়িতে আসে। একটা বাতি কমে গেছে। সতীর ঘর অন্ধকারই থাকে। সন্ধ্যার পরে ওঘরে যাবার কারুর প্রয়োজনই হয় না।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। নিস্তার বাড়িতে নেই।

আর একবার শব্দ হতেই লীলা এগিয়ে দরজা খুলে দিল।

ড্রাইভার ভিতরে ঢুকল না। হাতটা প্রসারিত করে দিল। রূপোর রেকাবির ওপর বকের পালকের মতন ধবধবে খাম।

আপনার চিঠি।

দু একবার চেষ্টা করেও লীলা হাত বাড়াতে পারল না। শেখরনাথের চিঠি। এতদিন পরে বুঝি মনে পড়ল। ফেলে-আসা ঘরবাড়িই শুধু নয়, ফেলে-আসা একটা মানুষের কথা। দত্তসায়েবের জলসায় আনন্দ বিতরণের ভার নিয়েছেন বলে আর একটা মানুষের মন থেকে আনন্দের শেষ রঙটুকুও মুছে নিতে হবে, এ কেমন কথা!

ড্রাইভার অসহিষ্ণু কাশির শব্দ করতেই লীলার খেয়াল হল। চিঠি এসেছে,

আর লীলা এমনি করে দাঁড়িয়ে থাকবে হাত গুটিয়ে। শেখরনাথ আসবেন, ও লিপি তো সেই খবরই বহন করে এনেছে।

ব্যস্ত হাতে লীলা চিঠিটা তুলে নিল।

চিঠিটা হাতে নিয়েই লীলার ভুল ভাঙল। ওপরে গোটা গোটা অক্ষরে ওর নাম লেখা। লীলা দেবী। এ হাতের লেখার সঙ্গে ওর কোন পরিচয় নেই। এ আঁচর ওর বুকের রক্তে দোলা দেয় না। উন্মাদনা আনে না শিরায় শিরায়।

চিঠিটা খুলে লীলা হতাশ হল। শেখরনাথের কোন বার্তা নয়, দত্তসায়েবের দু নম্বর খারখানা খোলার ব্যাপারে যে উৎসব আয়োজন করা হয়েছে, তারই নিমন্ত্রণ-পত্র? মহিলাদের বসার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। চিকের আড়ালে। কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। লীলাদেবী এ উৎসবে যোগদান করলে অনুষ্ঠানের কর্মকর্তারা বিশেষ বাধিত হবেন।

দেয়ালে হেলান দিয়ে চিঠিটা অনেকবার উল্টে পাল্টে পড়ল। শুধু দত্তসায়েবের রাজসূয় আয়োজনের কাহিনী, ঘরছাড়া মানুষটার কথা কোথাও লেখা নাই।

চিঠিটা মুড়ে লীলা সন্তর্পণে জানলার বাইরে ফেলে দিল।

পরের দিন ঠিক পাঁচটার একটু আগে আবার মোটরের শব্দ! এবার নিস্তার কাছেই ছিল। খুকুকে সাজিয়ে গুজিয়ে সামনের রাস্তায় পায়চারী করছিল। মোটর দেখে এগিয়ে এল।

খালি মোটর। ড্রাইভার এসে দাঁড়াল। দত্তসায়েব গাড়ি পাঠিয়েছেন মল্লিক-বাড়ির বৌকে জলসায় নিয়ে যাবার জন্য।

লীলা যে যাবে না একথা নিস্তারের জানাই ছিল। বৌরানীর ধাত তার খুব জানা। দত্তসায়েবের ছায়াও মাড়াবে না। ধুমধাম যাগযজ্ঞ যাই হোক।

তবু নিস্তার বাড়ির ভিতর গিয়ে দাঁড়াল, বৌরানী, আপনার জন্য গাড়ি এসেছে।

লীলা রামায়ণ নিয়ে বসেছিল। পিসীমার ফেলে-যাওয়া পুরনো ঝরঝরে বই। অর্ধেকের ওপর পাতা উধাও। পোকায় খেয়ে ফোঁপরা করে ফেলেছে। তবু বেছে বেছে লীলা পড়ে নিয়ম করে। পঞ্চবটী বন ধরে চলেছে সার দিয়ে। প্রথমে নবদূর্বাদলশ্যাম, মাঝখানে জনকনন্দিনী, একেবারে পিছনে অনুজ লক্ষ্মণ। রাজ্য, সম্পদ বিলাস দুহাতে সরিয়ে অরণ্যজীবন। রাজকীয় সুখ বিসর্জন দিয়ে

কৃচ্ছ্রসাধন। তবু জনকতনয়ার হৃদয়ে অনন্ত পরিতৃপ্তি। দুঃখের কাঁটায় একটু বিচলিত নয় তার মন। সম্পদবর্জিত জীবন কিন্তু স্বামীসঙ্গবঞ্চিত তো নয়। ছায়ার মত স্বামীর অনুগামিনী। এ প্রব্রজ্যায় অসীম সুখ। পড়তে পড়তে লীলার দু চোখে বাষ্প ঘনিয়ে আসে। ভূমিকম্পে প্রাসাদ গুঁড়িয়ে যাবার মতন, আভিজাত্য, ঐতিহ্য সম্পদ সব নিঃশেষিত। তাতে লীলার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। একটু বেদনা নয়। শুধু যদি শেখরনাথ থাকতেন পাশাপাশি। খুকুকে কোলে নিয়ে স্বামীর হাত আঁকড়ে ধরে অজগর বনের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে একটুও ক্লান্তি আসত না লীলার। ফেলে-আসা সমারোহের জন্য ক্ষীণ নিশ্বাসও নয়।

নিস্তারের কথা কানে যেতেই বই মুড়ে লীলা চোখ তুলল। কিছু বললি নিস্তার ?

আপনার জন্য গাড়ি এসেছে বৌরানী।

উঠে দাঁড়াতেই জানলা দিয়ে গাড়ির কিছুটা লীলার নজরে এল। কিসের জন্য গাড়ি পাঠানো তাও আন্দাজ করতে পারল।

নিস্তারের দিকে ফিরে ম্লান হেসে লীলা বলল, দত্তসায়েবের চতুর্দোলা ফিরিয়ে দে নিস্তার। এখনো যাবার সময় হয় নি।

হেঁয়ালি ঠিক বুঝলো না নিস্তার, কিংবা হয়তো বুঝেও না বোঝার ভান করল।

জলসা না কি হবে বৌরানী, সেজন্য গাড়ি পাঠিয়েছে। সকাল থেকে আশপাশের গাঁ ঝেঁটিয়ে লোক আসছে। মেয়েপুরুষ কাচ্চাবাচ্চা কেউ আর বাকি নেই। বেলডাঙার মাঠে অগুনতি মানুষ। নানা দেশ থেকে বাইজী আর বাজনা নিয়ে ইয়া ইয়া ষণ্ডা সব লোক এসেছে।

তুই এত সব জানলি কোথা থেকে ? চুপি চুপি দেখতে গিয়েছিলি বুঝি ?

নিস্তার থতমত খেয়ে গেল। দেখতে অবশ্য যায় নি, কিন্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পথচলতি লোকদের কাছ থেকে সব খবর যোগাড় করেছে। বিরাট সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। বাঁশের আড়ায় কত যে পেট্রোমাক্স ঝুলানো হয়েছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। দুপুর থেকে গিজগিজ করছে আসর। চারপাশে সার সার দোকান বসেছে।

না আমি যাই নি বৌরানী। গেলে বলেই যেতাম।

তুই ড্রাইভারকে একবার বলে আয় নিস্তার। বলে আয় শরীর খারাপ, যাওয়া সম্ভব হবে না।

গানবাজনা তো ভালবাসতে বৌরানী? চলতে চলতেও নিস্তার ফিরে দাঁড়াল। বৌরানী যদি যান তো খুকুকে কোলে নিয়ে সেও যেতে পারে পিছন পিছন। বৌরানীর কল্যাণে চিকের আড়ালে বসতে পারে হাত-পা ছড়িয়ে। ছত্রিশ জনের গা ঘেঁষে গুঁতোগুঁতি করতে হয় না।

তুই আগে বারণ করে আয়, তারপর তোর কথার উত্তর দেব। লীলা রামায়ণ মাথায় ঠেকিয়ে আলমারির ওপরে রেখে দিল। খাটের একপ্রান্তে বসে জানলার দিকে চোখ রাখল।

নিস্তার নেমে ড্রাইভারের কাছে দাঁড়িয়ে কি সব বলল। ড্রাইভার বাড়ির দিকে চোখ ফেরাতেই লীলার সঙ্গে চোখাচোখি হল। সে আর দাঁড়াল না। গাড়িতে উঠেই ইঞ্জিন চালু করল।

নিস্তার ফিরে এসে দাঁড়াল চৌকাঠের ওপর। বৌরানী যেন কেমন ধরনের। সারা রাত না জাগেন, একটুখানি ঘুরে এলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত। কত টাকা ছড়িয়ে দত্তসায়েব এমন সমস্ত গুণী লোক এক জায়গায় জড়ো করেছেন। এ সব জিনিস্ তো আর হামেশা হচ্ছে না। চড়ক সংক্রান্তির মেলার মতন এ বছর ফাঁক গেল তো পরের বছর পুষিয়ে নেব। বড় মানুষের কাণ্ডই আলাদা! তবু যদি না পলেস্তারা খসে ইটের পাঁজর বেরিয়ে পড়ত। পাঁচিল গেঁথে গেঁথে চোদ্দ ভাগে ভাগ না হত বসতবাটী।

গানবাজনার কথা জিজ্ঞেস করছিলি নিস্তার? গান আমার ভাল লাগে না, ভাল লাগে শুধু বাজনা, তাও আবার সব বাজনা নয়, কেবল বেহালা।

কথার সঙ্গে সঙ্গে লীলা চোখ ফেরাল দেওয়ালের কোণে রাখা বেহালার বাক্সের দিকে। কতদিন কেউ ছড় টানে নি। থুতনি দিয়ে বেহালা চেপে ধরে আস্তে আস্তে ঝঙ্কার তোলে নি তারে তারে। গুমরে গুমরে কান্নার মতন চাপা বেদনার সুরে আকাশ-বাতাস ভরিয়ে তোলে নি।

শেখরনাথের বেহালা অবহেলায় পড়ে আছে এক কোণে। মীড়ের মূর্ছনা জাগাতে আজ বুঝি কেউ এগিয়ে আসবে না।

ছোটবাবুর বেহালার হাত বড় চমৎকার বৌরানী। বনের পশু মুগ্ধ হয়।

অন্য জন্তুর খবর লীলা রাখে না, কিন্তু মুগ্ধা এক হরিণীর খোঁজ রাখে বৈ

কি। ছড় টানার তালে তালে যে সব কিছু ফেলে চলে এসেছে। বাড়ি, ঘর, আত্মীয়স্বজন সব।

দরজার বাইরে কাশির শব্দ! বাতি জ্বালাবার লোক এসে দাঁড়িয়েছে। আজ একটু তাড়াতাড়িই এসেছে। কোনরকমে কাজ সেরে জলসার আসরে গিয়ে বসবে।

কথাটা নিস্তার বলল বাতি জ্বালানোর পর।

বৌরানী।

কি রে?

একটা কথা ছিল।

বুঝেছি কি কথা। জলসায় যাবি তো?

নিস্তার চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল আঁচলের খুঁট আঙুলে জড়িয়ে।

বেশ তো, যাবি তো এই বেলা যা। এরপরে আর জায়গা পাবি না।

তবু নিস্তার নড়ল না।

কি রে দাঁড়িয়ে রইলি যে?

আপনি একলা থাকবেন বৌরানী?

হাসি এল লীলার। নিস্তার আর কতটুকু সঙ্গ দিতে পারে লীলাকে! নিঃসঙ্গ তো সে চিরদিন। তবু নিস্তার যে বলেছে কথাটা এই যথেষ্ট।

একলা থাকতে আমার ভয় করে না। তা ছাড়া একলা কেন, খুকুসোনা তো রয়েছে।

নিস্তার কি ভাবল কে জানে। আস্তে আস্তে সরে গেল সেখান থেকে। কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে এসে দাঁড়াল।

বৌরানী।

বল।

স্কুলবাড়ির দারোয়ানকে বলে এলাম সারারাত দাওয়ায় বসে থাকবে। পাহারা দেবে।

আর কথা বাড়াল না লীলা। আশেপাশে সবাই যাবে জলসায়। এদিকটা একেবারে ফাঁকা। ছোট একটা মেয়েকে বুকে জড়িয়ে লীলা হয়তো বিনিদ্র রজনী যাপন করবে। সামান্য শব্দেই চমকে বিছানা ছেড়ে উঠবে। সারা বাড়ির আনাচে কানাচে কেমন একটা ভয় লুকানো। লীলাকে একলা পেলেই কঙ্কাল

হাত এগিয়ে এসে বুঝি তাকে ছুঁয়ে যাবে। ভাবতেই লীলার রক্ত হিম হয়ে এল।

কিন্তু তবু নিস্তারকে বারণ করা সম্ভব নয়। মনের রঙ নিঃশেষে মুছে ফেলে লীলাই না হয় নিঃস্বের ব্রত নিয়েছে, আশেপাশের সবাই সাধ আহ্লাদ সবকিছু কি তা বলে ভুলে যাবে। তা কখন হয়!

না, তোর বরাতে আর জলসা শোনা নেই দেখছি। এইখানেই তো রাত করে ফেললি।

নিস্তার পরনের শাড়িটা ঠিক করে নিয়ে বেরিয়ে গেল। লীলা পিছন পিছন গিয়ে বাইরের দরজা বন্ধ করে দিল।

জানলার ওপাশে অন্ধকার নেমেছে। লীলার মনের অন্ধকারটা আরও জমাট। জানলার ধারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে লীলা বিছানার পাশে এসে বসল। খুকু খাটের ওপর উঠে বসে একদৃষ্টে লীলার দিকে চেয়ে রয়েছে। লীলা ফিরে চাইতেই খুকু কেঁদে উঠল।

নিজেকে আর সামলাতে পারল না লীলা। খুকুকে বুকে চেপে ধরে অঝোরে কাঁদতে শুরু করল।

আধ ঘুমের মধ্যেই লীলার কানে গেল টহলদারী দারোয়ানের নাগরার শব্দ। লাঠি ঠোকার আওয়াজও পেল। ঘুম আর আধঘুমের মধ্যে অনেকগুলো প্রহর পার হল।

কড়া নাড়ার শব্দ। অস্পষ্ট গলার স্বর। লীলা ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসল।

নিস্তারের গলার আওয়াজ। ফাঁকে ফাঁকে দরোয়ানের হাঁক। ভোর হয়ে গেল। নিস্তার ফিরে এসেছে।

বিছানা ছেড়েই লীলার ভুল ভাঙল। না, এখনও বেশ অন্ধকার রয়েছে বাইরে। মাঝরাতে নিস্তার চলে এল! বোধ হয় সুবিধামত জায়গা পায় নি বসতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গেছে তাই বাড়ি ফিরে এসেছে।

দরজা খুলতেই দারোয়ান কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম করল। পিছন পিছন নিস্তার এসে ঢুকল আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে।

কি রে ফিরে এলি যে?

নিস্তার পাশ কাটিয়ে ঘরে চলে গেল। যেতে যেতে বলল, ভাল লাগল না বৌরানী।

সে কি, এত খরচপত্র করে বিরাট জলসার আয়োজন, তোর ভাল লাগল না?

না, ওস্তাদদের চেঁচানি আর লোকজনের চীৎকারে কান পাতা দায়।

লীলা বিছানায় শোয়ার পরেও লক্ষ্য করল নিস্তার চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে দেয়াল ঘেঁসে।

কি রে এখনও দাঁড়িয়ে আছিস অমন করে? শাড়িজামা ছেড়ে শুয়ে পড়।

যাই বৌরানী।

মুখে বলল বটে কিন্তু নিস্তার যাবার কোন চেষ্টাই করল না। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে একভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

লীলা উঠে বসল। আবার কি নতুন বিপদ বাঁধিয়ে এল নিস্তার। দত্ত-সায়েবের লোকেরা অপমান করেছে বুঝি? জলসায় ঢুকতেই দেয় নি?

নিস্তার মাথা নাড়ল। ফিসফিসিয়ে বলল, না বৌরানী। চিকের আড়ালে বসেছিলাম। বন্দোবস্ত ভালই, দেখতে কোন অসুবিধা হয় নি।

তবে?

ছোটবাবু।

কে? লীলা সোজা হয়ে বসল। এলো খোঁপা খুলে সারা পিঠে চুল ছড়িয়ে পড়ল। সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল থরথরিয়ে। নীরন্ধ্র অন্ধকারে আলোর ফুলকি। ভেঙে-পড়া মানুষের কানে বাঁচার সঞ্জীবনী মন্ত্র। নিজের কানকে বিশ্বাস হল না লীলার। আরো স্পষ্ট করে বলুক নিস্তার, আরো জোরে।

নিস্তার পা মুড়ে বসল মেঝের ওপর। সব বলল একটু একটু করে। বৌরানীকে বলবে বলেই তো মাঝরাতে ছুটে এসেছে। সে দৃশ্য দেখার পরে কিছুতেই আর বসে থাকতে পারে নি।

কোন এক ওস্তাদের গানের পরেই এক বাইজি গাইতে উঠল। অপূর্ব সুন্দরী। রূপের দ্যুতিতে অত পেট্রোমাক্সের আলো যেন ম্লান হয়ে গেল। দু হাতে হীরের অলঙ্কার। নাকেও হীরের নাকছাবি। আলোয় জ্বলে জ্বলে উঠল। নাক মুখ চোখ যেন তুলি দিয়ে আঁকা। এক গাদা বাজনদারেরা তাকে ঘিরে বসল। একটা গান গাইল আধ ঘণ্টা ধরে। কি সুরেলা গলা, কি চমৎকার গাইবার ভঙ্গী। গান থামতেই বাইজি উঠে দাঁড়াল।

একটু থামল নিস্তার। খুব জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে লীলার। খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে আছে। অন্ধকারেও ক্লান্ত অবসন্ন তন্বীর কাঠামো নিস্তারের নজর এড়াল না।

বল, থামলি কেন? অনেকদূর থেকে লীলার কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

বাইজি উঠে দাঁড়াতেই ছোটবাবু পাশে এসে দাঁড়ালেন। এক হাত দিয়ে বাইজির একটা হাত আঁকড়ে ধরে সাবধানে তাকে নামিয়ে আনলেন।

নিস্তার! আচমকা কান্নাজড়ানো গলার আওয়াজে রাতের অন্ধকার ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। লীলা এগিয়ে এসে নিস্তারের একটা হাত চেপে ধরল। অনুভবে নিস্তার বুঝতে পারল হিমশীতল সে হাত। উত্তাপ নেই, স্পন্দন নেই, নিথর।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারি নি বৌরানী। পা দুটো ছড়িয়ে নেবার ছল করে উঠে দাঁড়ালাম। ভিড় ঠেলে ঠেলে বাইরে চলে এলাম। পায়ে পায়ে আসরের কাছাকাছি গিয়ে ঘোরাঘুরি করতে আরম্ভ করলাম। তারপরই চোখে পড়ল। জোর বাতির ঠিক নিচেই দুজনে। তাকিয়া ঠেস দিয়ে বাইজি বসে আছে, ছোটবাবু পাশে বসে গ্লাসে করে—

আ থাম নিস্তার, আর আমি শুনতে পারছি না। তোর ইচ্ছাটা কি বল তো? আমায় কটাদিনও বুঝি আর বাঁচতে দিবি না?

এরকম একটা ভয় নিস্তারেরও হয়েছিল। মনে মনে অনেকবার ভেবেছে ছোটবাবুর আসার খবরটা দরকার নেই বৌরানীকে দিয়ে। শুধু ফিরে আসা নয়, এমন একটা পরিবেশে তাঁকে দেখতে পাওয়া। কিন্তু কিছুতেই নিজের মনকে বোঝাতে পারে নি। সর্বনাশের শুরুতেই সব বৌরানীকে জানানোই ভাল। তবু যদি বাঁচবার পথ থাকে, স্বামীকে ফিরিয়ে আনার উপায়। একটার পর একটা আঘাতে বৌরানী ভেঙে পড়বেন, গুঁড়িয়ে যাবে বুকের পাঁজরগুলো, তবু জানাতেই হবে তাঁকে। বাইরের হাজার শক্তি বিপথগামী স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে পারে না। সতী নারীর তেজ ছাড়া এ নেশা কাটানো অসম্ভব। সহজ বুদ্ধিতে নিস্তার এইটুকুই বুঝেছিল।

উপুড় হয়ে লীলা ফুলে ফুলে কাঁদছিল, নিস্তার পাশে বসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। আস্তে বলল, কেঁদে কি করবেন বলুন, এর একটা বিহিত করতেই হবে।

বিহিত? হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে লীলা চোখ মুছে নিল। কি বিহিত করবে? একদিকে দত্তসায়েবের হাজার পেট্রোমাক্স জ্বালানো ঝলমলে আসর আর একদিকে অভাগিনী এক নারীর কান্নাটলমল দু চোখের ম্লান দীপ্তি। অগুনতি পাইক-বরকন্দাজের মুখোমুখি দাঁড়াবে মল্লিক-বাড়ির ভাগ্যহীনা বধূ।

এই জন্যই বুঝি দত্তসায়েব নিজে নিমন্ত্রণ-পত্র নিয়ে এসেছিলেন। গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন লীলাকে জলসায় নিয়ে যাবার জন্য। নিজের সর্বনাশের চেহারা নিজের চোখে দেখাতে চেয়েছিলেন। উন্মত্ত বন্যায় নিজের দাঁড়াবার ঠাঁইটুকুও ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে তটে দাঁড়িয়ে তাই দেখার আমন্ত্রণ।

লীলা জলসায় গেলে হয়তো সামলাতে পারত না নিজেকে। দু হাতে বুক চেপে জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ত। হৈ চৈ চেঁচামেচি, দারুণ বিশৃঙ্খলা। বাইরের লোকের কানেও ছড়িয়ে পড়ত কথাটা। মল্লিক-বাড়ির বৌরানী অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। ভিড়ের চাপে কিংবা অন্য কোন কারণে তাই নিয়ে চাপা কানাকানি, কুৎসিত ইসারা, মুখ মুচকে শ্লেষের হাসি।

কিন্তু তাতেও হয়তো শেখরনাথের নেশা কাটত না। নেশা ফিকে হয়ে এলেই পাশে-বসা বাইজি পাত্র পূর্ণ করে দিত। বৌরানীর সর্বনাশের পাত্র।

॥ নয় ॥

লীলা বোঝাল নিজেকে। দিন সাতেক, তারপরই উৎসব শেষ! বাড়তি লোক একে একে ফিরে যাবে নিজেদের আস্তানায়। বাইজি আর বাজনদারের দল। বাড়ির মানুষ বাড়িতে ফিরে আসবে। তা নয় তো ভাঙা হাটে আর কিসের আশায় বসে থাকবে?

তখন শেখরনাথকে লীলা হাত ধরে কাছে বসাবে! সব বলবে একটু একটু করে। মল্লিক-বাড়ির ঐশ্বর্য আর আভিজাত্য ভেঙে পড়ার কাহিনী নয়, সে তো শেখরনাথের জানা, মানুষের তিল তিল করে নেমে আসার ইতিকথা।

প্রথম খবর আনল হীরু।

দোরগোড়ায় এসে হাত জোড় ক'রে দাঁড়াল।

মা!

কিরে? লীলা এগিয়ে এসে দরজার কাছে দাঁড়াল।

কাল আসতে পারিনি মা, সবাই চলে গেলেন, গোছগাছ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।

এত দুঃখেও লীলার হাসি এল। হীরু যেন ওরই কর্মচারী। আগের দিনের মতন ওদের সেরেস্তা থেকে মাস্ মাস বেতন পাচ্ছে। একটা দিন আসতে পারে নি, তাই নিবেদন করছে ভয়ে ভয়ে।

কিন্তু হীরুর শেষদিকের কথাগুলো কানে যেতেই লীলার দুটো চোখ ঝক-মকিয়ে উঠল। আশার ঝিলিক। সবাই চলে গেছে, শেখরনাথের ফিরে আসতে তাহলে আর কোন বাধা নেই।

দত্তসায়েবের উৎসব শেষ হয়ে গেল হীরু?

হ্যাঁ মা। কাল শেষ হয়ে গেল। বাইরে থেকে যাঁরা এসেছিলেন, মোটরে সবাইকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসা হল।

দু-একবার কথা আটকে গেল। চেষ্টা করেও স্বর ফুটল না লীলার গলায়। আঁচলের খুঁট দিয়ে কপাল গাল মুছে নিয়ে কাঁপা-গলায় বলল, তোমাদের ছোটবাবু এবার বাড়ি ফিরে আসবেন তো হীরু?

স্পষ্ট দেখা গেল, লীলার কথাগুলো কানে যেতেই হীরু বাগ্দী টান হয়ে দাঁড়াল। একটা হাত কানের পাশে রেখে লীলার দিকে ঝুঁকে পড়ল। ভুল শোনে নি তো। ছোটবাবু ভরতপুরে ফিরে আসার খবর বৌরানী কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন।

লীলা হীরু বাগ্দীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল।

হেসে বলল, তোমাদের ছোটবাবুর এখানে আসার খবর আমি পেয়েছি হীরু। আমাকে লুকিয়ে লাভ নেই।

কিছুক্ষণ হীরু মাথা নীচু করে রইল। হাতের লাঠি দিয়ে ঘরের মেঝেয় আঁচড় কাটল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, ছোটবাবুও চলে গেছেন মা।

দেওয়ালে হাত রেখে লীলা টাল সামলাল। ভীষণ কাঁপছে শরীর। দুচোখে অসম্ভব জ্বালা। এর চেয়ে হাতের মোটা লাঠিটা দিয়ে যদি ওর মাথায় হীরু সজোরে আঘাত করত, তাহলেও বোধ হয় এমন অবস্থা হত না। চোখের

সামনে অন্ধকারের স্রোত। লীলার মনে হল সেই অনন্ত তমিস্রা বুঝি ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে।

ছোটবাবু চলে গেছেন! খুব আস্তে, বিড়বিড় করে লীলা উচ্চারণ করল। একটু দম নিল হীরু। মাথার কাপড় খুলে কপালের জমে-ওঠা ঘাম মুছে নিয়ে বলল, ছোটবাবু নন্দীপুরে রয়েছেন মা।

নন্দীপুরে? দত্তসায়েবের নতুন কেনা পত্তন। নিস্তারের মুখে শুনেছে লীলা। একেবারে পাশের গাঁ। এখান থেকে মাইল দুয়েক। খাজনা বাকি পড়েছিল, দত্তসায়েব বাকি খাজনা মিটিয়ে দিয়ে গাঁ কুক্ষিগত করেছেন। নতুন কিছু নয়। টাকার জাল ছড়িয়েছেন দত্তসায়েব। বিস্তৃত জাল। চুনো পুঁটি থেকে স্থরু করে রাঘব বোয়াল কিছু যেন পালায় না।

নন্দীপুরে? নন্দীপুরে কি হীরু? জলে ডোবা মানুষের হাঁপ নেওয়ার মতন থেমে থেমে লীলা কথাগুলো বলল।

দত্তসায়েব নতুন বাগানবাড়ি করেছেন 'দত্ত-কানন', সেখানেই ছোটবাবু উঠেছেন, মা।

নতুন বাগানবাড়িতে উঠেছেন। কেন? বাস্তুভিটাটুকুও কি হাতবদল করল? মুষ্টিমেয় টাকার বদলে এ অংশটুকুও বুঝি দত্তসায়েবের কবলিত। তাই যদি হয়, তবে শেখরনাথের স্ত্রীকন্যাই বা এখানে থাকবে কোন অধিকারে? কিছু বলা যায় না, অক্ষক্রীড়ায় দ্রৌপদীকে পণ রাখার মতন, এ সর্বনাশা খেলায় শেখরনাথও বুঝি নিজের বনিতা আর দুহিতাকেও পণ রেখেছিলেন। সব হারিয়ে তাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার অধিকারও হারিয়েছেন।

আরো কাছে সরে এল লীলা। হীরুর সামনাসামনি।

তোমাদের দত্তসায়েবের বাগানবাড়িতে বুঝি আবার নতুন করে উৎসব আরম্ভ হবে?

কিছু বলা যায় না। গ্রাম হাতবদল করেছে। জমিদারির পরিধি বাড়ল, সেই জন্যই হয়তো গানবাজনার আয়োজন হবে। যন্ত্রী, বাইজি, তবলচীর মতন ভরতপুরের সব-হারানো শেখরনাথও ঠাঁই বদল করবেন। এক উৎসব থেকে আর এক উৎসবে। ভাটের রাজারা জয়গাথা গেয়ে বেড়ানোর মতন, দত্ত-সায়েবের প্রশস্তি কীর্তন করে বেড়াবেন স্থান থেকে স্থানান্তরে। চমৎকার!

হীরু ঘাড় নাড়ল।

না মা, আর কিছু নয়। সবাই যে যার দেশে ফিরে গিয়েছে, কেবল ছোটবাবু আর—

আর? দুটো চোখে লীলার আগুনের ছিটে। বিস্ফারিত চোখ। এ কথাটা বলতে এত দেরি করছে কেন হীরু। দেরি করলেই বুঝি সর্বনাশ এড়াতে পারবে? দু হাত দিয়ে ঠেকাবে বন্যার উদ্দাম স্রোত। সর্বনাশের আঁচ লীলা ঠিক পেয়েছে। এমন যে কিছু একটা হয়েছে তা বুঝতে একটুও ভুল করে নি।

কাশী থেকে যে বাইজি এসেছিলেন, তিনিও উঠেছেন দত্তকাননে।

শব্দটা পাশের ঘর থেকে নিস্তারও পেয়েছিল। ছুটে এসে দেখল লীলা মেঝের উপর পড়ে রয়েছে। বিমূঢ় হীরু নিজের পাগড়ি খুলে সজোরে আন্দোলিত করছে লীলার মুখের কাছে। যদি কিছু হাওয়া হয়, এই ভরসায়।

নিস্তার লীলার মাথা নিজের কোলে তুলে নিল। হীরুর দিকে চেয়ে বলল, ও ঘরের কোণে কুঁজো আছে, শীগগীর এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে এস।

অনেকক্ষণ পর লীলা চোখ খুলল। এদিক ওদিক দেখে হীরুর দিকে চোখ পড়তেই গায়ে মাথায় আঁচল ঠিক করে উঠে বসল।

এখন উঠবেন না মা। কিছুক্ষণ এইভাবে শুয়ে থাকুন। আমি বাইরে রয়েছি।

হীরু দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়াতেই, লীলা নিস্তারের দিকে হাতটা বাড়িয়ে ধরল। নিস্তারের হাত ধরে খুব সাবধানে হেঁটে হেঁটে নিজের বিছানায় গিয়ে শুল।

বিছানায় শুয়েই লীলা চোখ বুজল। আঁকড়ে ধরার মত কিছু নেই। হেরে গেছে লীলা। শুধু হেরেই যায় নি, হারিয়েছে নিজের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। আভিজাত্য, ঐশ্বর্য সব হারিয়েও শুধু এক আশায় লীলা বুক বেঁধেছিল। শেখরনাথ ফিরে আসবেন। লীলার মুখোমুখি দাঁড়ালে আর ফিরে যেতে পারবেন না। বাইজির কাছে সতীর হার হয়েছে। সর্বস্ব হারিয়ে নিজেও নিঃশেষিত। তারই বুঝি পুনরাবৃত্তি হবে লীলারও জীবনে। কাশী থেকে আসা বাইজিকে নিয়ে শেখরনাথ আকণ্ঠ ডুবে থাকবেন, অবহেলিত লীলা এককোণে বসে শুধু চোখের জল ফেলবে। নিঃশব্দে অশ্রুমোচন আর নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার।

কিন্তু না! কোমরে আঁচল জড়িয়ে লীলা উঠে বসল। সজোরে মাথা নাড়ল। অন্তত খুকুর মুখ চেয়ে উঠে দাঁড়াতেই হবে তাকে। সতী নিঃসন্তান। আঁকড়ে ধরার মতন কেউ ছিল না, কিছু ছিল না। কিন্তু লীলার অবলম্বন রয়েছে। বুকের রক্ত-নিংড়ানো ধন। সর্বগ্রাসী আগুনের শিখায় নিজে দগ্ধ হলেও বুকের সন্তানকে বাঁচাতে হবে এ আঁচ থেকে।

উঠলেন কেন বৌরানী? নিস্তার কাছে এসে দাঁড়াল।

সারাজীবন কি শুয়েই কাটাব?

অসুস্থ শরীর।

শরীর আমার আর কোনদিনই সুস্থ হবে না।

নিস্তার আর কোন কথা বলল না। মেয়েমানুষ হয়ে মেয়েমানুষের ব্যথা বোঝে বৈ কি। জোর বাতির সামনে রংচং-মাখা জড়োয়া গয়নায় সাজা বাইজিকে নিস্তার দেখেছে, আর বৌরানীকেও দেখছে সামনে। সংসারের হাজার দুঃখে, আঘাতে আঘাতে কিছুই নেই মানুষটার, কিন্তু তবু কি রঙের জেল্লা, কি নাকচোখের বাহার। চাঁদ আর জোনাকি! পুরুষমানুষের ঠিক ঠিকানা নেই। রত্ন ফেলে পাগড়িতে কাচের টুকরো পরার সামিল। এ ভুল কবে ভাঙবে, কোন্ যুগে!

নিস্তার লীলার মাথায় হাত রাখল। পাখার বাতাস করল। একটু যদি ঘুমোন বৌরানী। যতটুকু তন্দ্রা, ততটুকু শান্তি। কুটিল চিন্তার কবল থেকে অব্যাহতি।

বিকালে হীরু বাগ্দী আসতেই লীলা ডেকে পাঠাল।

সসম্ভ্রমে হীরু চৌকাঠের ওপারে এসে দাঁড়াল। দু হাত বুকের কাছ বরাবর তুলে বলল, ডেকেছেন মা?

হ্যাঁ, বসো হীরু।

মেঝের ওপর সঙ্গে সঙ্গে হীরু বসে পড়ল।

দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সব কাটিয়ে উঠল লীলা। এমন সময়ে সংশয়ের কোন মানে হয় না। সারা ঘরে আগুনের লেলিহান শিখা, আবরণ বাঁচাবার হাস্যকর প্রয়াস তখন সর্বনাশ ডেকে আনারই নামান্তর।

আমার একটা কাজ করে দিতে হবে হীরু।

আদেশ করুন মা।

দত্তকাননে একটা চিঠি নিয়ে যেতে হবে।

দত্তকাননে?

হ্যাঁ। কি পারবে না?

লাঠি আঁকড়ে হীরু সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল।

আপনি হুকুম দিলে, পারব না, সে কি হতে পারে মা।

লীলা আর কথা বলল না। খাটের পাশে রাখা গোল টেবিলটা টেনে কাছে নিয়ে এল। সারা দুপুর খুঁজে কাগজের প্যাড বার করেছে আলমারির তলা থেকে। কলমও জোগাড় হয়েছে। কোন অসুবিধা নেই।

কিন্তু লিখতে গিয়েই লীলা থেমে গেল। সকাল থেকে হাজার বার মনে মনে ঠিক করেছে। জপমালার মতন আউড়েছে মনে মনে। বেশ গুছিয়ে লিখতে হবে কথাগুলো। খুব অল্প অথচ ব্যঞ্জনাবহ। বিস্মৃতির শ্যাওলা সরিয়ে পুরনো জীবন যাতে জেগে ওঠে চোখের সামনে। শেখরনাথের চেতনা ফিরে আসে।

অনেক ভেবেচিন্তে লীলা শুধু দু লাইন লিখল। বিশেষ দরকার। একবার যেন দেখা করে। অন্যথা না হয়। সম্বোধনহীন চিঠি, কিন্তু তলায় যত্ন করে লিখল, 'তোমারই লীলা'।

খামে মুড়ে চিঠিটা হীরুর হাতে তুলে দিতেই দু চোখ ছলছলিয়ে এল। গলার কাছে কান্নার কুণ্ডলী। আর লুকোচুরি খেলার কোন মানে হয় না। কোন আব্রু নেই, সামান্য আড়ালও নয়। লীলার জীবন মেলে-দেওয়া শাড়ির মতন উন্মুক্ত, প্রসারিত। সুখের সামান্য ভাঁজও কোথাও নেই, বর্ণাঢ্য পাড়ের ঝিলিক নয়।

তুমি ছোটবাবুকে বিশেষ করে একবার আসতে বোলো হীরু। চিঠি পেয়েই যেন আসেন, বুঝলে। অনুনয়ের সুরে কোমল গলার স্বর।

হীরু বাগ্দী মুখ তুলে চাইল না। মাথা নিচু করেই ঘাড় নাড়ল। কেবল যাবার মুখে থেমে দাঁড়িয়ে বলল, আমি ছোটবাবুকে বুঝিয়ে বলব মা। তাঁকে ফিরিয়ে আনবই।

তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক হীরু। ফিসফিসিয়ে লীলা বলল।

সারাদিন লীলা ছটফট করল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। ঝুঁকে এদিক ওদিক দৃষ্টি। কোথাও একটু শব্দ হলেই চমকে উঠে বসল। দরজার গোড়ায় বুঝি শেখরনাথ এসে দাঁড়িয়েছেন। মল্লিক-বাড়ির বংশধর ফিরে এসেছেন আভিজাত্যের সমাধিস্তূপে।

দরজা বরাবর গিয়েই লীলার ভুল ভেঙেছে। দরজার কড়া নয়, বাইরে কোথাও আর কিসের শব্দ।

বিকাল হতেই লীলা খুকুকে নিয়ে বসল। আলমারি খুলে ফ্রকের রাশ বের করল। নানা রংয়ের। সতী আনিয়েছিল পছন্দ করে। বেছে বেছে আকাশী রং। এ রংটা লীলার খুব ভাল লাগে। মেয়ের মুখ মুছিয়ে পাউডারের হালকা প্রলেপ। চোখের কোণে পাতলা কাজলের টান। ঝাঁকড়া চুলের গোছা আঁচড়ে সবুজ রিবন আটকে দিল। সাজগোজ শেষ করে হাতের তালুতে মেয়ের মুখ তুলে ধরল। একদৃষ্টে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ ধরে।

দেখতে দেখতে লীলার বুক কাঁপিয়ে নিশ্বাস পড়ল। মল্লিক-বাড়ির একমাত্র সন্তান, সারা ভরতপুরের আদরের জিনিস। আজ যদি ঐশ্বর্যের সমারোহ থাকত, বিগত দিনের জমজমাটি ভাব, তাহলে বুঝি এমন অনাদরে, এমন অবহেলায় মানুষ হত খুকু! মেয়েটারই বরাত। জন্ম নিল মল্লিক-বাড়ির আভিজাত্যের পড়ন্ত বেলায়, ঝিমিয়ে আসা অন্ধকারের ছায়ায়।

নিস্তারের গলার আওয়াজে লীলার চমক ভাঙল। একি বৌরানী, মেয়েকে আজ যে এত সাজাবার ঘটা?

লীলা কথার উত্তর দিল না। মুখ তুলে নিস্তারের দিকে চাইল।

নিস্তার আরো কাছে সরে এল। পা মুড়ে বসল লীলার পাশে। খুব মৃদু গলায় বলল, একি, আপনি কাঁদছেন বৌরানী?

লীলা চোখে আঁচল চাপা দিল। রগড়ে রগড়ে দু চোখের জল মুছে ফেলল। মুখে ম্লান হাসি এনে বলল, কই আবার কাঁদছি। তুই কেবল আমায় কাঁদতেই দেখিস।

নিস্তার হাত বাড়িয়ে খুকুকে কোলে তুলে নিল। খুকুকে আদর করল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, বৌরানী আজ ছোটবাবু আসবেন?

ছোটবাবু! লীলার সারা শরীর শিউরে উঠল।

মুখে বলল, তোদের ছোটবাবু বুঝি আমার ঘরের কানাচে বসে রয়েছেন,

ডাকলেই ছুটে আসবেন? যখন দয়া হবে, মনে পড়বে আমাদের কথা, তখন হয়তো বাড়ির দিকে পা ফেরাবেন। সে কবে, পশুপতিনাথই জানেন।

নিস্তার কি একটা উত্তর দিতে গিয়েই বাধা পেল। হীরু বাগ্দী দরজার ওপারে। ও যে এসেছে তারই জানানি হিসাবে কৃত্রিম কাশির শব্দ করছে।

উঠতে গিয়ে লীলা দেয়াল ধরে টাল সামলাল। অসম্ভব কাঁপছে পা দুটো। মনে হচ্ছে চলতে গেলেই মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়বে। কি জানি কি সংবাদ এনেছে হীরু। ছোটবাবু বাড়ি ফেরার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দিনের আলোয় ফিরতে লজ্জা, তাই পা টিপে টিপে ফিরবেন রাতের অন্ধকারে। কিংবা হয়তো শেখরনাথ চিনতেই পারেন নি কাউকে। স্ত্রী, কন্যা পিছনে ফেলে যাওয়া কাউকেই নয়। দু কানে নূপুরের অশ্রান্ত রুনুঝুনু, দু চোখে সুরার মদির স্বপ্ন। শেখরনাথের জগতে আর কেউ নেই।

খুব সাবধানে দেয়াল ধরে ধরে লীলা এগিয়ে গেল। দরজার কাছাকাছি।

কষ্টে উচ্চারণ করল কথাগুলো।

কি খবর হীরু?

লাঠি পাশে রেখে হীরু সাষ্টাঙ্গে লীলাকে প্রণাম করল। কথার কোন উত্তর দিল না।

প্রণাম শেষ করে উঠে বসতে হীরুর মুখের দিকে লীলা চেয়ে চেয়ে দেখল। মুখের ভাঁজে, কপালের বলিরেখায়, দু গালের হিজিবিজি আঁচড়ে যদি আশার সংবাদের ক্ষীণ চিহ্নটুকুও থাকে। আনন্দের বার্তার সামান্য ইশারা।

অনেকক্ষণ পরে লীলা জিজ্ঞাসা করল, বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

হীরু ঘাড় নাড়ল। খুব ধীরে ধীরে। অস্পষ্ট গলায় বলল, না মা। গেটের দারওয়ান ভিতরে ঢুকতে দেয় নি। কাউকেই দেয় না। সায়েবের বারণ।

সায়েবের? কোন সায়েবের?

দত্তসায়েব মানা করে দিয়েছেন। বাইরের কোন লোক গেট পার হতে পারবে না।

দত্তসায়েব মানা করেছেন। ঠোঁট কামড়ে লীলা দাঁড়িয়ে পড়ল। এতদিন অলিগলি বেয়ে যে স্রোত মৃদুমন্দ গতিতে বেয়ে চলেছিল, আজ সেই স্রোত দুর্বার হয়ে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। ভাঙনের সর্বনাশা রূপ। অশ্রান্ত কল্লোলে কান পাতা দায়।

মল্লিক-বাড়ির বৌরানীর সমস্ত দম্ভ, আক্রোশ প্রতিঘাত করার শক্তি আজ নিঃশেষিত। দত্তসায়েব তাঁর হাতের পাঞ্জা ফেলেছেন মাটিতে, সাহস থাকে বৌরানী উত্তর দিক এই ঔদ্ধত্যের।

আমি তবু হাল ছাড়িনি মা। অনেক বলে কয়ে মিনতি করে দারওয়ানের হাত দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলাম।

কোন কথা লীলার কানে গেল না। মুখ তুলেই আশ্চর্য হয়ে গেল। এত আবছা ঠেকছে কেন হীরু বাগ্দীর কাঠামো। দুর্বল রক্তহীন। সব আস্ফালনের ইতি। তৈলসিক্ত পাকানো বাঁশের লাঠি কেবল বুঝি হাতের শোভা। কিংবা অন্তঃসারশূন্য মল্লিক-বাড়ির প্রতাপের মতন, হীরু বাগ্দীর হাতিয়ারও শক্তিহীন।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর দারওয়ান ফিরে এল। জিজ্ঞাসা করলাম, চিঠি ছোটবাবুর হাতে দিয়েছে কি না। উত্তরে সে হাসল।

হাসল?

হ্যাঁ মা, বলল ছোটবাবু নাকি চিঠির ওপর চোখ বুলিয়েই চিঠিটা মুচড়ে পিকদানির ভিতর ফেলে দিয়েছেন।

তুমি তাই শুনে চলে এলে হীরু। লাঠি ধরার হাত কি এত দুর্বল হয়ে গেছে? তিনপুরুষে তোমরা না লাঠিয়াল? এর মধ্যেই এমন ঝিমিয়ে পড়লে? এততেও রক্তে জোয়ার আসে না?

আর চোখের জল নেই। বিন্দুমাত্রও না। দু চোখে বিদ্যুতের শিখা। সারা মুখ আরক্ত। প্রসারিত ফণা ভুজঙ্গীর মত দুর্বার।

সব কিছুই করতে পারতাম মা, যদি ছোটবাবুর সায় থাকত। কথাগুলো বলেই হীরু মাথা নিচু করল। লাঠিতে থুতনি চেপে চুপচাপ দাঁড়াল।

এক মুহূর্তে কে যেন লীলার মুখে তরল আগুন ছিটিয়ে দিল। রক্তের শেষ বিন্দুও উধাও। পাংশু আভা দুটি চোখে। ঠোঁটের রং কাগজ-সাদা। যন্ত্রণায় মুখের প্রত্যেকটি রেখা কুঁকড়ে এল।

ঠিক বলেছে হীরু। শুধু বাহুর শক্তিতেই লাঠি তোলা যায় না। পিছনে আরো বৃহত্তম শক্তির সায় চাই। জমিদারবাড়ির বধূ হয়ে লীলা এ সহজ সত্যটা কেমন করে ভুলে গেল। লাঠিয়ালের দল অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মানুষের ওপর, রাত্রির অন্ধকারে বসতবাটিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, রাতারাতি পঞ্চাশ কোদালের সাহায্যে আল ভেঙে জমির সীমানা বাড়িয়েছে, এসব কি শুধু

লাঠিয়াদের আত্মতৃপ্তির মোহে ? পিছনে ছিল অমিতপ্রতাপ জমিদারের ইঙ্গিত, প্রবলতর শক্তির সংকেত।

আজ যদি শেখরনাথ রুখে দাঁড়াতেন, সুরা আর নারীর ফেনিল স্রোতে নিজেকে না ভাসিয়ে শক্ত মাটির খোঁজ করতেন, উজান বেয়ে হারানো ঘাটে ফিরে আসার চেষ্টা, তা হলে দত্তসায়েবের সাধ্য ছিল এমন ভাবে প্রহরী মোতায়েন করতে দত্তকাননের গেটে ? লীলার চিঠি তো শেখরনাথের হাতেও পৌঁছেছিল, কিন্তু কি হল তার পরিণতি !

একটু দম নিয়ে লীলা আস্তে আস্তে বলল, আচ্ছা তুমি এখন যাও হীরু।

কোন কথা নয়। মাথা নিচু করে হীরু নেমে গেল। সিঁড়ির ধাপ বেয়ে বেয়ে উঠানে গিয়ে নামল, তারপর মিলিয়ে গেল পথের বাঁকে।

জানলার পাল্লায় মাথা রেখে লীলা একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখল।

পিছন ফিরলেই দেখা হবে নিস্তারের সঙ্গে। শুধু নিস্তারই নয়, খুকুও রয়েছে। প্রসাধন শেষ। চোখ দুটো বড় বড় করে হয়তো কৈফিয়ত চাইবে লীলার কাছে। কোথায় সেই অতিথি ? যাকে উপলক্ষ্য করে খুকুর সাজ-গোছের এত ঘটা !

শুধু কি খুকুই সেজেছে ! সারাদিন ধরে লীলাও ঘর গুছিয়েছে। নিস্তারকে ডাকতে লজ্জা করছিল। কি জানি কি মনে করবে। বিছানা ঝেড়েঝুড়ে নিজের হাতে ফুল-তোলা ঢাকাগুলো সযত্নে পরিয়ে দিয়েছিল সাটিনের বালিশ গুলোর ওপর। পুরনো কাপড় দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করেছিল আলমারির কাঁচ আর পাল্লা। কিন্তু সবচেয়ে বেশী সময় নষ্ট করেছিল বেহালাটা নিয়ে। পা মুড়ে বসে সন্তর্পণে মুছেছিল। ছেঁড়া তার সরিয়ে সরিয়ে, এপিঠ ওপিঠ। শুধু মোছাই নয়, বেহালাটা তুলে রেখেছিল কোণের টিপয়ের ওপর। শেখরনাথ থাকার সময় যেমন থাকত।

কেবল নিজে সাজে নি লীলা। আলমারির নিচের তাকে শাড়ি-জামা গুছিয়ে রেখেছিল। ভেবেছিল বিকালে গা ধুয়ে জড়িয়ে নেবে। কিন্তু কি ভেবে শাড়ি-জামা আর পরে নি। ঝকঝকে পোশাক অঙ্গে জড়ালেই বুঝি ব্যথা-জর্জর জীবনটাকেও ঢাকা যাবে।

অনেকক্ষণ পরে লীলা জানলা থেকে সরে এল। বাইরে সন্ধ্যার আবছা

অন্ধকার। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে দু-একটা বাতির ইশারা। ততক্ষণে নিস্তার খুকুকে নিয়ে সরে গেছে। লীলা ক্লান্ত পায়ে ফিরে গিয়ে বিছানার ওপর বসে পড়ল।

অনেক রাত অবধি নিস্তার শুনল। পায়ের আওয়াজ এদিক থেকে ওদিক। একটুও বুঝি চোখ বোজে নি মানুষটা। অবিশ্রাম পায়চারি। নিস্তারের মনে হল দরজা ঠেলে বুঝিয়ে বলে বৌরানীকে। এমন করলে শরীর দুদিনে ভেঙে পড়বে। উপায় কি, বুকের ব্যথা চেপে মুখে হাসি ফোটাতে হবে। সংসারের নিয়মই এই।

এক সময়ে নিস্তার ঘুমিয়ে পড়ল। ভোরে উঠে বৌরানীর চেহারা দেখেই গালে হাত দিল। বয়স একরাতে যেন পাঁচ বছর বেড়ে গেছে। শুকনো মুখ, জাগরণ-ক্লান্ত দুটি চোখ, এলোমেলো চুলের রাশ।

একি, সারারাত ঘুমোন নি বৌরানী? অনেক রাত অবধি জেগে থাকার শব্দ আমি পেয়েছি।

লীলা কোন উত্তর দিল না। ম্লান হেসে বলল, তুই খুকুকে একটু দেখ নিস্তার, আমি চট করে একবার স্নানটা সেরে আসি।

লীলা স্নান সেরে ফিরল প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে। শুধু স্নান নয়, সেই সঙ্গে কান্নাও বোধ হয় শেষ করে এসেছে। জলের ধারার সঙ্গে অঝোরে চোখের ধারা। বাইরে থেকে যাতে বোঝা না যায়।

আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে নিস্তারের দিকে ফিরল, একটা কাজ করতে পারবি নিস্তার?

কি বৌরানী?

একবার হীরুকে খবর দিতে পারবি? দুপুরের দিকে আসতে বলবি, খুব জরুরী দরকার।

কি দরকার? বৌরানীর হাবভাব যেন ভাল লাগছে না। সর্বনাশের ওপর আবার সর্বনাশ না ডেকে নিয়ে আসে।

লীলা হাসল। সে হাসি মুখে নয়, ফুটল দুটি চোখে। বলল, হীরু আসুক, জানতে পারবি।

খাওয়া-দাওয়া সেরে নিস্তার বেরিয়ে গেল। সদরে গেলেই ধরা যাবে হীরুকে। কাছারি বাড়ির দাওয়ায় পা মুড়ে বসে থাকে।

সব ঠিক হল। কোন অসুবিধা নয়। দুপুরবেলা হীরু এসে দাঁড়াল মল্লিক-বাড়ির দরজায়। লীলা তৈরীই ছিল। এগিয়ে চৌকাঠের এপাশে দাঁড়াল।

আমায় ডাকছেন মা?

বিকালে একটা গাড়ির বন্দোবস্ত করে দিতে হবে। ঘোড়ার গাড়ি।

কোথায় যাবেন মা, পশুপতিনাথের মন্দিরে?

না, দত্তকাননে।

আচমকা উদয়নাগ যেন ছোবল দিল ঠিক বুকের মাঝখানে। আচমকা একটা আর্তনাদ। হাতের লাঠি শ্লথ।

মা!

না, ভুল শোন নি হীরু। দত্তকাননেই যাব খুকুকে সঙ্গে নিয়ে। নতুন দারোয়ান আমাকে আটকাতে পারবে বলে মনে হয় না। যদি আসেই আটকাতে, তুমি আমার ইজ্জত রাখতে পারবে তো? আগের বারে মনিবের সায় ছিল না, কিন্তু এবার মনিবানীর পূর্ণ সম্মতি রয়েছে।

আর লজ্জা দেবেন না মা। এ বাড়ির অনেক নিমক খেয়েছি। হীরু লাঠি হাতে পিছন ফিরল, যেতে যেতেই বলল, বেলা পাঁচটার মধ্যে গাড়ি নিয়ে আসব মা। আমি যাবার সময় ইব্রাহিমকে বলে যাচ্ছি।

নিস্তার পাশেই ছিল। হীরু চলে যেতেই লীলার পাশে এসে দাঁড়াল।

আপনি একলা যাবেন বৌরানী? থেমে থেমে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে নিস্তার বলল। গলার স্বরে ভয়ের ছোঁয়াচ।

একলা কেন, হীরু থাকবে, খুকু থাকবে সঙ্গে।

কিন্তু ছোটবাবু রয়েছেন সেখানে!

লীলা খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসির পাশাপাশি অশ্রু ঘনিয়ে এল দুটি চোখে। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বলল, তাঁর কাছেই তো যাচ্ছি। তোর কি ধারণা সেই কাশীর বাইজির কাছে যাচ্ছি, ছলা-কলা শিখতে?

নিস্তার আর একটি কথাও বলল না। বৌরানীর মেজাজ তার অজানা নয়।

গাড়ি এসে দাঁড়াল ঠিক পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই। লীলা তৈরী ছিল। মেয়েরও সাজগোজ শেষ। নিজে দামী ময়ূরকণ্ঠি শাড়ি জড়িয়ে নিল। জড়োয়া গহনা সর্বাঙ্গে। পায়ে আলতা টেনে দিয়েছিল নিস্তার। নিজের হাতে লীলা সিঁথিতে সিঁদুর মাখাল, চওড়া করে।

ঘোমটা একটু টেনে লীলা নিস্তারের দিকে ফিরে বলল, ঘরদোর খোলা রইল নিস্তার, একটু দেখিস।

ঘাড় নেড়ে নিস্তার এগিয়ে গেল। লীলার সামনে গিয়ে বলল, একটু দাঁড়ান বৌরানী।

লীলা থমকে দাঁড়াতেই গলায় আঁচল দিয়ে নস্তার প্রণাম করল।

কিরে, হঠাৎ প্রণাম করলি যে?

এমনি। নিস্তারের দু চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি।

গাড়ীতে উঠে লীলা প্রথম টের পেল। কাঁপছে আঙুলের ডগাগুলো, বুকের মাঝখানে দ্রুত স্পন্দন। গাড়ির চাকা আবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সাহসও যেন কমে আসছে। মল্লিক-বাড়ির অন্তঃপুরচারিণীর লজ্জা আর সঙ্কোচ ঘিরে ধরছে লীলাকে।

হীরু বাগ্দী কোচবাক্সে ইব্রাহিমের পাশে। ভিতরে শুধু লীলা আর খুকু। খড়খড়ির ফাঁকে চোখ রেখে লীলা দেখল। মাতঙ্গী নদীর ধার দিয়ে গাড়ি চলেছে। এপাশে ওপাশে বৈঁচি আর বনতুলসীর ঝোপ। মাঝে মাঝে রাংচিতার সার। একটু পরেই গাড়ির নাচুনিতে মালুম হল বাঁধানো পথে আর তারা নেই, উঁচু-নিচু শড়ক ধরে গাড়ি এগিয়ে চলেছে।

ঘণ্টাখানেকেরও বেশী। এর মধ্যে কতবার পরিবর্তিত হল দু পাশের দৃশ্যপট। ধানখেতের পাশ দিয়ে চামড়ার কারখানার ধার ঘেঁষে গাড়ি মন্থর গতিতে চলল।

আচমকা হীরুর চীৎকারে ইব্রাহিম লাগাম কষে ধরল। ঝাঁকানি দিয়ে গাড়ি থেমে গেল।

দরজার পাল্লায় রাখা হাতটা ভিজে উঠেছে। কপালেও ঘামের ফোঁটা। বেশ চলছিল গাড়ি। অনন্তকাল ধরে যদি এমনই চলত। আচমকা থামল কেন পথের মাঝখানে! পথের মাঝখানে যে গাড়ি থামে নি সেটা হীরু নেমে দরজা খুলতেই লীলা টের পেল।

লোহার রেলিং ঘেরা বাড়ি। চারপাশে আম, জামরুলের বাগান। মাঝে মাঝে দু একটা ফুলের গাছও দেখা যাচ্ছে। ঠিক গেটের পাশে টুলের ওপর পাগড়ি মাথায় এক মূর্তি। দেউড়ি আগলাবার ভার বোধ হয় তার ওপর। পড়ন্ত রোদে শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা 'দত্ত-কানন' ঝিকমিকিয়ে উঠল।

পাদানিতে পা দিয়ে লীলা সাবধানে নেমে পড়ল। দু-একপা গিয়েই ফিরে দাঁড়াল।

তোমার আর যাবার দরকার নেই হীরু, খুকুকে নিয়ে তুমি গাড়ির মধ্যেই থাক, আমি না আসা পর্যন্ত।

হীরু কি বলতে গিয়েই থেমে গেল। ততক্ষণে লীলা জোর পায়ে গেটের কাছে এগিয়ে গেছে।

দারওয়ান এক হাতের তালুতে খৈনি টিপতে টিপতে একটা লাগসই গান ভাঁজবার তালে ছিল, আচমকা শাড়ির খসখস শব্দে চমকে মুখ ফেরাল। ঝক-ঝকে শাড়ি-গহনায় ঢাকা এক অপূর্ব নারী। চলার ছাঁদে, ঠোঁটের গড়নে, চোখের দৃষ্টিতে আভিজাত্যের ছোঁয়াচ। খানদানী ঘরের কেউই হবেন। কিন্তু এমন সময়ে এখানে!

দারওয়ান এর বেশী আর ভাববার অবসরই পেল না।

লীলা সামনে এসে দাঁড়াতেই টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

ওপরে ওঠার সিঁড়িটা কোনদিকে?

বুকের মধ্যে অশ্রান্ত দাপাদাপি কিন্তু গলার স্বর লীলার একটু কাঁপল না।

দু-পা জোড় করে দারওয়ান সশব্দে সেলাম ঠুকল। এগিয়ে বলল, আসুন মাইজী।

বাগান পার হয়ে লাল সিমেন্টের চাতাল। তারই প্রান্তদেশে চওড়া সিঁড়ি। দু-পাশে ধরবার চকচকে হাতল।

ঠিক আছে, তুমি যেতে পার।

চাতাল পার হয়ে সিঁড়িতে পা রাখতে রাখতে লীলা বলল।

কটাই বা সিঁড়ির ধাপ কিন্তু উঠতে লীলার বেশ সময় লাগল। ওরই মধ্যে হাতলে ভর দিয়ে বারদুয়েক জিরিয়ে নিল।

ঢোকার মুখেই দরজায় নীল পর্দা। খুব পাতলা, ওপাশের সব কিছু দেখার পক্ষে কোন বাধা নেই।

পর্দার এপাশে লীলা চুপচাপ দাঁড়াল।

মাঝখানে ফুলতোলা পুরু কার্পেট। ভেলভেটের দুটো তাকিয়া। তারই একটাতে ঠেস দিয়ে মল্লিক-বাড়ির শেষ প্রদীপ, ভরতপুরের সব-খোয়ানো মালিক। ওপাশের তাকিয়ায় আধশোয়া অবস্থায় সালোয়ার-পরা এক তরুণী। দু-চোখে

রাত্রি জাগরণের কালিমা, ঠোঁটে চটুল হাসির ঝিলিক। সামনের থালায় বেল-ফুলের রাশ। এককোণে দুটি পাত্রে টলটল করছে রঙীন সুরা। বাইজির কোলের কাছে মাঝারি আকারের বীণা। তারই তারগুলোর ওপর আঙুল ছোঁয়াচ্ছে।

অনেকক্ষণ লীলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। একবার শেখরনাথকে আর একবার বাইজিকে।

অবিন্যস্ত চুলের রাশ। তামাটে আভা সারা মুখে। খুব ক্লান্ত আর শীর্ণ মনে হল শেখরনাথকে। দুটো হাত কোলের ওপর রেখে সামনে জড়ো করা বেলফুলের দিকে চেয়ে রয়েছেন। ফুলের কথাই ভাবছেন হয়তো। পরিমিত পরমায়ু নিয়েও ফুলের জীবন সার্থক। লাবণ্যে সুরভিতে মাতিয়ে রাখে মানুষকে। কিংবা ওই একমুঠো দুধ-সাদা ফুলের মতন আর একজনের নিষ্কলঙ্ক জীবনের কথাই মনে পড়ছে। অবহেলায় দূরে সরিয়ে রাখা আর-একটি ব্যথাতুর হৃদয়।

আঁচল দিয়ে লীলা মুখ মুছে নিল। আর দেরী করা ঠিক নয়। বীণার সুর বাঁধতে আরম্ভ করেছে বাইজি। একটু পরেই বীণা কোলের ওপর তুলে নিয়ে ঝঙ্কার তুলবে। মীড়ের মূর্ছনায় ভরিয়ে তুলবে আকাশ-বাতাস। শেখরনাথ ডুবে যাবেন সেই সুরতরঙ্গে। পিছনে-ফেলে-আসা জীবনটুকুই নয়, চারপাশের সব কিছু ভুলে যাবেন।

এক হাত দিয়ে পর্দা সরিয়ে বিদ্যুৎগতিতে লীলা ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

প্রথমে চোখে পড়ল বাইজির। চমকে উঠতেই হাতের বীণার তারে বেসুর ঝঙ্কার। বীণা কোল থেকে মাটিতে নামিয়ে বাইজি বলল, কে? কি চাই?

কি চাই? লীলা ঠোঁট মুচকে হাসল। কি চাই বললে সহ্য করতে পারবে বাইজি? সে চোখ ফেরাল শেখরনাথের দিকে।

শেখরনাথ সোজা হয়ে বসেছেন। দু চোখে অগাধ বিস্ময়। ভরতপুরের অন্তঃপুরচারিণী পা ফেলে ফেলে প্রমোদের আসরে এসে দাঁড়িয়েছে। পার হয়েছে আভিজাত্যের বেড়া, সম্ভ্রমের আগল।

তুমিও কি চিনতে পারছ না? লীলা হাঁটু মুড়ে বসল শেখরনাথের সামনে। গাল বেয়ে অশ্রুর বন্যা। ইচ্ছা হল শেখরনাথের কোলে মুখ লুকিয়ে অঝোর ধারায় কাঁদে। উজাড় করে দেয় বুকের সব ব্যথা!

তুমি? তুমি? আমতা আমতা করলেন শেখরনাথ। বিকৃত জড়ানো কণ্ঠস্বর।

হ্যাঁগো আমি। ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি তোমাকে।

ফিরে যাব? কোথায়?

যেখানে দু চোখ যায়। দত্তসায়েবের আওতা ছাড়িয়ে অনেক—অনেক দূরে। নতুন করে জীবন শুরু করব। তুমি, আমি আর খুকু। নতুন কোন শহরে আস্তানা বাঁধব।

পাগল, শেখরনাথ মুখ ফেরালেন, ফুর্তির পয়সা জোগাবে কে? মদের খরচ পাব কোথায়? নিজের তো সব গিয়েছে। মহল নেই, প্রজারা নেই, আমি তো পথের ভিখারী।

না, তুমি পথের ভিখারী নও, লীলার দুটো চোখ জলে উঠল, তুমি যেমন রাজা ছিলে ঠিক তেমনিই আছ। ফণা গুটিয়ে থাকলেই বুঝি নির্বিষ হয় শঙ্খচূড়? এই কি তোমার জীবন। সংসার পরিজন দুহাতে সরিয়ে দিয়ে একি সর্বনেশে খেলায় তুমি মেতেছ? তুমি কি রং-চং-করা মাটির পুতুল, অদৃশ্য সুতোর টানে টানে হাতপা নাড়বে?

আস্তে আস্তে লীলা গলা চড়াল। না চড়িয়ে উপায়ও নেই। শেখরনাথ প্রকৃতিস্থ নেই। নরম গলার মিঠে মিঠে কথা হয়তো কানেই যাবে না। ঘোলাটে চোখের ভাব। উত্তেজনায় ঠোঁট কামড়ে ধরেছেন দাঁত দিয়ে। সুরার নেশা এখনও কাটে নি।

উঠে এস লক্ষ্মীটি। আমি নিজে নিতে এসেছি তোমায়। সাহস করে লীলা একটা হাত বাড়াল শেখরনাথের দিকে। আঙুলের ডগা ছুঁল।

শেখরনাথ আবার চোখ তুললেন। উন্মত্ত দৃষ্টি নয়, সংজ্ঞা ফিরে আসছে অল্প অল্প করে। মনে পড়ছে ফেলে-যাওয়া জীবনের কথা, পুরনো পরিবেশ। আবার বুঝি সহজ হয়ে এল মানুষটা।

হুজুরের পরিবার বুঝি? ঠোঁট বাঁকিয়ে বাইজী অদ্ভুত গলায় বলল। এক হাতে সুরার পাত্র তুলে নিয়ে ঝুঁকে পড়ল শেখরনাথের দিকে, আহা, এত কষ্ট করে যখন উনি এসেছেন, আর দেরী করবেন না। পরিবারের হাত ধরে গুটগুট করে বাড়ির ছেলে বাড়ি ফিরে যান। আমারও যাবার বন্দোবস্ত করে দিন। আজ রাত্রেই যাতে কাশী রওনা হতে পারি।

কথার শেষে বাইজী আবার হাসল। পরিহাসের ভঙ্গীতে কুঁচকে গেল ওষ্ঠ আর অধর। দুচোখে অবজ্ঞা আর ঘৃণার ছিটে।

নিস্তেজ শেখরনাথ আবার টান হয়ে বসলেন। হাত বাড়িয়ে টেনে নিলেন সুরার পাত্র। চীৎকার করে উঠলেন, যাও বাইরে। ফূর্তির সময় কেবল বাজে ঝামেলা। এই, কোই হ্যায়।

লীলা একটা হাত দিয়ে সুরার পাত্রসুদ্ধ শেখরনাথের হাত চেপে ধরল। এ বিষ ঠোঁটে ছোঁয়ালেই বিস্মৃতির পর্দা নেমে আসবে মনের ওপর। শেখরনাথ সব ভুলে যাবেন। নেমে যাবেন অতল-গর্ভ অন্ধকারে। হাজার চেষ্টা করেও লীলা আর তুলতে পারবে না তাঁকে।

না, আমার চোখের সামনে ও জিনিস তোমায় আমি গিলতে দেব না। দাও, ফেলে দাও। টানাটানিতে সুরা চলকে শেখরনাথের কাপড়ে গিয়ে পড়ল। কিছুটা জাজিমের ওপর।

ইস, দামী জিনিস কিভাবে নষ্ট হচ্ছে, জিভটা তালুতে ঠেকিয়ে বাইজী একটা শব্দ করল। হাতটা টেনে শেখরনাথ ছাড়িয়ে নিলেন। এক হাত দিয়ে অবিন্যস্ত চুলের রাশ সরিয়ে দিলেন কপালের ওপর থেকে। জোর গলায় বললেন, যাও সরে যাও, সামনে থেকে। ভাল হবে না বলছি।

না, না, না। লীলা আর একবার প্রাণপণ চেষ্টা করল সুরার পাত্র ছিনিয়ে নেবার কিন্তু তার আগেই শেখরনাথ উঠে দাঁড়িয়েছেন।

লীলা উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই শেখরনাথ হাতের পাত্র সজোরে ছুঁড়লেন লীলাকে লক্ষ্য করে; তখন থেকে বারণ করছি, কথা কানে যাচ্ছে না, না? নিরালায় একটু আমোদ করব তারও যো নেই।

প্রথমটা লীলা ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। ঝন্‌ঝন করে কাচের পাত্র চূর্ণ হবার শব্দ। কপালের বাঁ দিকে অসহ্য যন্ত্রণা। লীলা হাত দিয়ে কপাল চেপে ধরল। হাতের ফাঁক দিয়ে টসটস করে গড়িয়ে পড়ল তাজা রক্ত। ফোঁটায় ফোঁটায় লীলার শাড়ির ওপর। সাদা বেলফুল রক্তের ছোপে লালচে।

কাচ ভাঙার শব্দ ছাপিয়ে আর-একটা আওয়াজ শোনা গেল। দুহাত কোমরে ঠেকিয়ে খিলখিল করে হাসছে বাইজি। হাসির দমকে দুলে দুলে উঠছে যৌবন-সমৃদ্ধ দেহ। কাচ ভাঙার আওয়াজের চেয়েও আরও তীক্ষ্ণ সে হাসি।

দু হাতে কপাল চাপা দিয়ে লীলা আস্তে আস্তে ফিরে এল। সাবধানে

সরাল দরজার পর্দা। অন্ধের মতন হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নামতে লাগল।

হেরে গেছে লীলা। শেষ সম্বলটুকুও আজ নিঃশেষিত। অন্ততঃ এই আশাতেই নির্ভর করে জীবন কাটাচ্ছিল। কোনদিন শেখরনাথের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারলে আর ভয় নেই। পঙ্কিল, কামনা-কলুষ জীবন থেকে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। হাজার ষড়যন্ত্র, শলা-পরামর্শ কিছুই বাধা হতেপারবে না।

বহুদিন আগের এক ছবি ভেসে উঠল চোখের সামনে। নিজের চোখে দেখা নয়, কানে শোনা। মহাষ্টমীর দিন মুজরো ছিল মল্লিক-বাড়িতে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে এমনি এক দৃশ্য দেখেছিল সতী। রুণি বাইজী আর বড়বাবু অমরনাথ। সেদিন সাহস করে সতী এগিয়ে যেতে পারে নি। শুধু নিভৃতে কাতর অনুরোধ জানিয়েছিল অমরনাথের দু পা জড়িয়ে ধরে। অমরনাথকে ফেরাতে পারে নি। আজ এত বছর পরে সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। সেদিন সতী পারে নি, আজ লীলা সাহসে বুক বেঁধে এগিয়ে গিয়েছিল কিন্তু তারও হার হয়েছে। রুণি বাইজিদের যুগ বুঝি শেষ হয় নি।

এবারও দারওয়ান সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিল। চাতাল পার হবার আগেই লীলার কানে এল বীণার ঝঙ্কার। সুর বেঁধে বাইজি তৈরী হয়ে নিয়েছে। আর কোন বাধা নেই। কোন অসুবিধা নয়। জাজিমে আর পরিচ্ছদে কয়েক ফোঁটা সুরা আর বেলফুলের ওপর তাজা রক্তের বিন্দু। এ ছাড়া, এমন একটা ঘটনার কোন সাক্ষ্য নেই।

গাড়ির কাছেই হীরু বাগ্দী বসেছিল, খুকুকে কোলে নিয়ে। লীলাকে দেখেই দাঁড়িয়ে উঠল, একি মা, এ অবস্থা কে করলে?

কপাল থেকে লীলা আঁচল সরিয়ে নিল। চোখের পাতায়, গালের পাশে রক্তের স্রোত। ভ্রূর পাশে অনেকটা কেটে গেছে। রক্ত পড়া একসময়ে বন্ধ হয়ে যাবে, ক্ষতও সেরে যাবে একদিন, কিন্তু লীলার রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ড আর বুঝি কখনও স্বাভাবিক হবে না।

চল হীরু, আর দেরী করলে বাড়ি পৌঁছাতে রাত হয়ে যাবে। মাথা নীচু করে লীলা গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

আসার সময় যেমন, যাবার সময়ও জানলার খড়খড়ি সব বন্ধ। হীরু বাগ্দী গাড়োয়ানের পাশে গিয়ে বসল।

ভিতরে ঢুকে লীলা খুকুকে বুকে চেপে ধরল। এবার রক্তস্রোতের পাশাপাশি নামল অশ্রুর স্রোত। বাঁধভাঙা জলের তোড়ের মতন। কিন্তু অশ্রুর সাধ্য কি জমাট রক্তের দাগ মুছে ফেলতে পারে। মায়ের দেখাদেখি খুকুও কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে।

মল্লিক-বাড়ির সামনে গাড়ি থামতেই হীরু নেমে দরজা খুলে দিল। খুকুকে বুকে জড়িয়ে লীলা রাস্তার ওপর দাঁড়াল।

গাড়িটা ছেড়ে দিও না হীরু, আমি এখনি আসছি। কথা শেষ করে লীলা আর একটুও দাঁড়াল না। হনহন করে গেট পার হয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকল।

কথাটা বুঝতে হীরুর বেশ একটু সময় নিল। প্রথমে ভাবল বোধ হয় গাড়ি ভাড়া আনবার জন্যই লীলা ভিতরে গেল। কিন্তু ইব্রাহিম তো জানা গাড়োয়ান। এত তাড়াহুড়ো করার কি দরকার। লীলার মুখচোখের ভঙ্গী হীরুর ভাল ঠেকল না। গলার স্বরও যেন কেমন।

অল্পক্ষণ ভেবে নিয়ে হীরুও গেটের কাছ বরাবর এসে দাঁড়াল। লীলা মুখের কথায় কিছু প্রকাশ করে নি, কিন্তু ব্যাপারটা হীরু কিছুটা আঁচ করতে পেরেছে বৈ কি। লাঠি তো শক্ত হাতে আজো ধরা ছিল, কিন্তু নির্দেশ আসে নি। আঘাত যাঁর কাছ থেকে এসেছে, প্রতিঘাত দিয়ে তাঁকে শায়েস্তা করা যায় না। এ তো শুধু একটা মানুষের শায়েস্তা করা নয়, তার জীবনকে, তার প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করা!

শক্ত হাতে লাঠি ধরে হীরু উঠান অতিক্রম করে, সিঁড়ির ধাপ বেয়ে বেয়ে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল। চৌকাঠ বরাবর এসেই অবাক।

আলমারির পাল্লা খুলে লীলা কাপড়জামা মেঝেয় নামিয়ে স্তূপীকৃত করেছে। বিছানা গোটানো। বিয়ের সময়কার ফুলকাটা ট্রাঙ্কটা পাশেই ডালা-খোলা অবস্থায়।

মা! হীরুর গলাও কেঁপে উঠল।

লীলা ট্রাঙ্কে কাপড় ভরতে ভরতে মুখ তুলে দেখল। পাশেই খুকুর হাত ধরে নির্বাক নিস্তার।

একটু দাঁড়াও হীরু। যদি অসুবিধা না হয়, আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দেবে।

স্টেশনে? হীরু নিজের কানকেও বিশ্বাস করে উঠতে পারল না।

হ্যাঁ। এখনও রক্তের দাগ জমাট হয়ে রয়েছে। গালে, থুতনিতে, পরনের শাড়িতে রক্তের ছোপ। মুখটা কি ধুয়েও ফেলতে পারে নি! না বুঝি, নিজের হাতে এ দান মুছতে চায় না! অশ্রুতে ধুয়ে দিনের পর দিন ধরে একটু একটু করে অপসৃত হবে কলঙ্ক-রেখা। মুছে যাবে মল্লিক-বাড়ির শেষ প্রদীপের নির্মম স্বাক্ষর।

মিনিট পনের। তার মধ্যেই গোছগাছ শেষ।

লীলা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, একবার ইব্রাহিমকে ডেকে আনতে হবে যে হীরু। বিছানা আর ট্রাঙ্কটা গাড়িতে তুলে দেবে।

বাধা দিতে গিয়ে হীরু থেমে গেল। অবিন্যস্ত চুলের রাশ বাতাসে উড়ছে, দু চোখে অগ্নিশিখার ঝিলিক, চাপা ওষ্ঠাধরে দুর্বার প্রতিজ্ঞা। সমস্ত অনুনয় মিনতি কঠিন পাথরে প্রতিহত হয়ে ফিরে যাবে।

হীরু এগিয়ে গোটানো বিছানাটা তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই নিস্তার হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। আছড়ে পড়ল লীলার সামনে।

বৌরানী! বৌরানী! এর বেশী আর বলতে পারল না।

লীলা ফিরে দাঁড়াল। একটা হাত রাখল নিস্তারের মাথায়, অবুঝ হস নি। এ সবের পরেও আমাকে থাকতে বলিস এখানে? যে সাহসে ভর করে এতদিন কাটিয়েছি, আর তার ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই। দত্তসায়েব হাত ধরে রাস্তায় বের করে বাড়ি দখল করবে, সে দিনের অপেক্ষায় বসে থাকব হাত গুটিয়ে?

কিন্তু কোথায় যাবেন বৌরানী? সঙ্গে কেউ নেই।

লীলা হাসল। একটা হাত রাখল নিজের কপালে, সঙ্গে যাঁর থাকবার তিনিই থাকবেন। সবই কপালের লিখন নিস্তার। নইলে ঠিক এমন অবস্থা তো হবার নয়।

মা! চৌকাঠের ওপার থেকে হীরুর গলা শোনা গেল।

যাই হীরু। লীলা হাঁটু মুড়ে কার উদ্দেশ্যে প্রণাম করল। বোধ হয় গৃহদেবতাকে। বেহালার বাক্সর সামনে দাঁড়িয়ে কি ভাবল কিছুক্ষণ, বেহালার বাক্সর ওপর জমে-থাকা ধুলোয় আঙুল দিয়ে আঁকিবুকি কাটল। একবার উঁকি দিয়ে দেখল সতীর ঘরের দিকে। তারপর শাড়ির আঁচল মাথায় তুলে দিয়ে বাইরে চলে এল। পিছন পিছন খুকুকে কোলে নিয়ে নিস্তার।

ইব্রাহিম ট্রাঙ্কটা গাড়ির ছাদে তুলে দিল। বিছানা আগেই ওপরে তোলা হয়েছিল। খুকুকে লীলা কোলে নেবার চেষ্টা করতেই আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল নিস্তার।

গাড়ির হেঁচকা টানে লীলার সম্বিত ফিরে এল। হাত দিয়ে নামিয়ে দিল জানলার খড়খড়ি। আর আব্রুর প্রয়োজন নেই। মল্লিক-বাড়ির বৌরানীর অভিযান সুরু পথে পথে, বারবার হোঁচট খেতে হবে, গৈরিক ধুলোয় অঙ্গবাস রঞ্জিত হবে। ঘাড় কাত করে লীলা দেখল। অন্ধকারে মল্লিক-বাড়ির উদ্ধত প্রেতমূর্তি। অনেক স্বপ্ন জড়ানো, অনেক মোহের আকর, বিগত-জীবনের বালুবেলায় সোনা-চিকচিক অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে। উষ্ণ অশ্রু, ব্যথাতুর নিশ্বাস আর মান-অভিমানের পালা।

হৈ চৈ চীৎকারে লীলার চমক ভাঙল। গাড়ি প্রায় স্টেশনের কাছ বরাবর। আঁচল দিয়ে মুখ চোখ মুছে নিয়ে লীলা দেখল। কোলের ওপর খুকু ঘুমে অচেতন। পাঞ্চ লাইটের আলোর আঁচড় এদিকে ওদিকে।

একটু এগিয়েই গাড়ি থেমে গেল। সামনেই কাঁটাতারের বেড়া। স্টেশনের এলাকা। শুরকি-ঢালা প্লাটফর্মের কিছুটা দেখা যাচ্ছে।

হীরু এসে গাড়ির দরজা খুলতেই লীলা আঁচলের গিঁট খুলল।

ইব্রাহিমকে কত দিতে হবে হীরু?

সে ঠিক আছে মা। হীরু ঘুমন্ত খুকুকে কোলে নেবার চেষ্টা করল।

তোমরা আমার অনেক করেছ। আর তোমাদের ঋণ বাড়াতে চাই না। আঁচল খুলে লীলা দশ টাকার একটা নোট হীরুর দিকে প্রসারিত করে দিল।

কথা না বাড়িয়ে হীরু নোটটা হাত পেতে নিল। লীলা মাটিতে নেমে দাঁড়াতেই হাত দুটো জোড় করে বলল, একটা নিবেদন করব মা।

খুকুকে সন্তর্পণে চাপড়াতে চাপড়াতে লীলা বলল, এখানে থাকবার অনুরোধ যদি করতে চাও হীরু, তা হলে নিবেদন করে কোন ফল হবে না। আমি মন ঠিক করে ফেলেছি।

কিন্তু কোথায় যাবেন মা?

আপাতত কলকাতায়।

সেখানে আপনার আত্মীয়স্বজন কেউ কি আছে মা?

হীরু, হিন্দু নারীর স্বামীর চেয়ে বড় আত্মীয় আর কেউ নেই। তাঁর

কাছেই যখন আশ্রয় পেলাম না, তখন আর নতুন করে অন্য আত্মীয়ের খোঁজ করতে চাই না।

হীরু বাগ্দী মাথা হেঁট করে রইল। উত্তর দেবার আর কিছুই নেই, থাকলেও লীলার মনের এ অবস্থায় এ নিয়ে আলোচনা চালানোও সম্ভব নয়।

স্টেশন খুব বড় নয়, ওর মধ্যেই সব কিছুর বন্দোবস্ত। যাত্রীদের বিশ্রাম ঘর রয়েছে, 'জানানা'দের পৃথক ব্যবস্থা। মাঝে মাঝে সায়েব-সুবো নামতেন শিকারের প্রত্যাশায়। বন্দুক ঘাড়ে, থার্মোফ্লাস্ক-ঝোলানো জাঁদরেল সায়েবের দল। স্টেশনের যা কিছু প্রসাধন তাঁদেরই কল্যাণে।

হাতল-ভাঙা চেয়ার ক্যাম্বিশের খাট, ছোট টেবিল, এ ছাড়াও পেরেকে টাঙানো মাঝারি গোছের এক আয়না। ভিতরে ঢুকেই লীলা সাবধানে খুকুকে বিছানার ওপর শুইয়ে দিল। নিজে বসল হাতল-ভাঙা চেয়ারে। মালপত্র হীরুর তত্ত্বাবধানে মেঝেয় জড়ো হল। হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে লীলা চেয়ে চেয়ে দেখল। একটা স্বপ্নের ঘোর। ঠিক কিছুই লীলা বুঝতে পারছে না। কোথা থেকে কোথায় চলেছে ভেসে। নিছক ঝোঁকের মাথায়। কিন্তু যতবারই কথাটা ভেবেছে, ওর কানে কানে কে যেন বলেছে, পালাও ভরতপুরের সর্বনাশা আওতা ছেড়ে। যদি নিজে বাঁচতে চাও, বাঁচাতে চাও খুকুকে, তবে মানুষের কামনা-কলুষ দৃষ্টি থেকে সরিয়ে নাও নিজেদের। পশুপতিনাথের মন্দিরের কাঠামো বিরাটতর কারখানার পিছনে মুখ লুকিয়েছে। মন্দির নয়, লীলার মনে হল যুগে যুগে গড়ে-ওঠা বিশ্বাস, মানুষের ধর্ম সব মুখ লুকিয়েছে দত্তসায়েবের প্রচেষ্টার অন্তরালে। পুরোহিতের পূত মন্ত্রোচ্চারণ চাপা পড়েছে শ্রমিকদের হাতুড়ি-গাঁইতি আর যন্ত্রের কর্কশ শব্দে। মানুষও চাপা পড়েছে ফেনিল সুরার স্রোতে, বাইজির লাস্যময়ী অঙ্গভঙ্গীর তলায়। তাই কঙ্কালের বাসভূমি থেকে সরে যাচ্ছেন মল্লিক-বাড়ির দেবী। অগণিত প্রজার বন্দিতা বৌরানী। দেবীর নৌকায় আগমন, গমন বাষ্পীয় শকটে। ফল, সম্মান-হানি, সম্পত্তি-ক্ষয়, আত্মীয়-বিনাশ।

মা!

হীরুর গলার আওয়াজে লীলার চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল।

কী হীরু?

দরজা ঠেলে হীরু ভিতরে এসে দাঁড়াল।

বলছিলাম মা, ট্রেন দশটা বাইশে। স্টেশনে শুনলাম আধ ঘণ্টার

ওপর লেট হবে। এখন সবে আটটা। আমি একবার বাড়িতে ঘুরে আসব মা?

সত্যি হীরু, তোমার কথা আমার একেবারেই মনে নেই। তুমিও বিকেল থেকে ঘুরছ আমার সঙ্গে। কিছু মুখেও দাও নি। স্টেশন থেকে কিছু খেয়ে নিলে পারতে।

লীলা আঁচলের খুঁট খুলতেই হীরু বাধা দিল।

গাড়িভাড়া দশ টাকা লাগে নি মা। ব্যস্ত হবেন না। টাকা আমার কাছে রয়েছে। আমি একটু বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি।

হীরু আর দাঁড়াল না।

লীলা আস্তে আস্তে উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। দুটো কান যেন জ্বালা করছে। ভারি হয়ে এসেছে চোখের পাতা। মুখে চোখে একটু জল দিয়ে নিতে হবে। পরনের শাড়িটাও বদলে ফেলতে হবে।

লীলা ট্রাঙ্ক খুলে চওড়া লালপাড় শাড়ি বের করে নিল। মল্লিক-বাড়ির পূজা-পার্বণে এটাই সে পরত। চওড়া-পাড় শাড়ি আর সিঁথিতে চওড়া সিঁদুরের রেখা। শেখরনাথের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে পূজার নৈবেদ্য হাতে ঘোরাফেরা করেছে এই পোশাকে।

শুধু শাড়ি বদলাতে লীলা বাথরুমে ঢুকেছিল, কিন্তু ভিতরে ঢুকে স্নানও সেরে ফেলল। ঘটি ঘটি জল ঢেলেও শান্তি নেই। কত বছরের ক্লেদ জমা হয়ে রয়েছে সর্বাঙ্গে, পুঞ্জীভূত অপমান। স্নান সেরে শরীর বেশ ঝরঝরে মনে হল।

মাথা মোছবার সময়ই কান্নার আওয়াজ কানে গেল। তাড়াতাড়ি গামছা চুলে জড়িয়ে লীলা বাইরে বেরিয়ে এল।

ঘুম ভেঙে খুকু বিছানায় উঠে বসেছে। অচেনা পরিবেশ। ধারে কাছে কেউ নেই। প্রথমে ঠোঁট ফুলিয়ে তারপর তারস্বরে কাঁদতে আরম্ভ করেছে।

লীলা ছুটে এসে খুকুকে বুকে তুলে নিল। শুধু ভয় নয়, খাবার সময় হয়েছে খুকুর। এই সময়ে একটু দুধ পেলে হত। খুব ভুল হয়ে গেছে লীলার। অন্ততঃ বোতলে করে একটু দুধ আনা উচিত ছিল। স্টেশনে গরম দুধ একটু পাওয়া যায় না? কিন্তু মালপত্র এভাবে অরক্ষিত অবস্থায় রেখে কোথায় লীলা দুধের সন্ধানে ছুটবে। দরজার কাছে গিয়ে লীলা দাঁড়াল। যদি কোনো কুলিকে সামনে পায় একটু দুধ আনতে বলবে।

দরজা একটু খুলেই লীলা পিছিয়ে এল। মাথায় জব্বর পাগড়ি, অঙ্গে ঝলমলে পোশাক, ভারী নাগরা, লাঠিটা বন্দুকের ভঙ্গিতে কাঁধে নিয়ে কে একজন পায়চারি করছে সামনে। এদিকটা বেশ একটু অন্ধকার, আলোটা সাইনবোর্ডে আড়াল পড়েছে। সর্বনাশ, দত্তসায়েব খোঁজ পেয়ে বুঝি প্রহরী পাঠিয়েছে। শিকার না পালায়। ট্রেনে উঠতে গেলেই বাধা দেবে। আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বন্ধ-খড়খড়ি ঘোড়ার গাড়িতে কিংবা দত্তসায়েবের ঝকঝকে মোটরে।

ঠোঁট চেপে লীলা দাঁড়িয়ে রইল।

দরজার শব্দে প্রহরী পায়চারি থামাল। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল লীলার সামনে।

কিছু বলবেন মা?

মুখ তুলেই লীলার চোখের পলক পড়ল না। অচেনা কেউ নয়, হীরু বাগ্দী। সান্ত্রীর পোশাক অঙ্গে জড়িয়েছে। দত্তসায়েবের দেওয়া পরিচ্ছদ খুলে মল্লিক-বাড়ির পোশাক পরেছে।

একি হীরু?

কথার উত্তরে হীরু লাঠি মেঝেয় রেখে সাষ্টাঙ্গে লীলাকে প্রণাম করল, চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এলাম মা। পোশাক জমা দিয়ে এলাম। নতুন পোশাকে যেন হাঁপিয়ে উঠছিলাম, এখন অনেকটা হাল্কা লাগছে। তা ছাড়া, নতুন সায়েবের চাপরাশ পরে আপনার সঙ্গে যে যাওয়া যাবে না মা।

লীলার চোখের কূল ছাপিয়ে, গাল বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল। না, ভুল ভেবেছিল এতক্ষণ। ভরতপুর শুধু কঙ্কালের আস্তানা নয়, মানুষও আছে বৈ কি। অন্তত একজন তো সামনেই রয়েছে লীলার। একদা-বেতনভুক-সামান্য-কর্মচারী কিন্তু সে পরিচয় ছাপিয়ে কত উর্দ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে মানুষটা।

তারপরের ঘটনাগুলো যেন স্বপ্নের মতন। শুধু দুধ নয় কলকাতা যাবার টিকিটও কিনে আনল হীরু। লীলাকে কিছু মুখে দেবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করল। অন্য কিছু না হোক, অন্তত দুধ একটু।

কিন্তু লীলা মাথা নাড়ল। ভরতপুরে এক ফোঁটা জলও নয়। এখানকার বিষাক্ত বাতাসে নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে, এখানের মাটিতে যেন আগুনের উত্তাপ। পা রাখা যাচ্ছে না। কতক্ষণে ট্রেন আসবে। দুর্বার বেগে পার হয়ে

যাবে অভিশপ্ত এলাকা। তার আগে লীলার ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ হয় নেই. চেতনা-বোধও নয়।

দিগন্ত কাঁপিয়ে লৌহদানব এসে দাঁড়াল স্টেশনে। যাত্রীর চীৎকার। ফেরিওয়ালার হৈ চৈ। তার মধ্যে পথ করে হীরু বাগ্দীর পিছনে পিছনে খুকুকে কোলে নিয়ে মল্লিক-বাড়ির বৌরানী ট্রেনের কামরায় গিয়ে উঠল। একেবারে কোণের দিকে আরও দুটি স্ত্রীলোক। আবক্ষ ঘোমটা-টানা।

গাড়ি ছাড়তে লীলা জানলা দিয়ে বাইরে চাইল। নীরন্ধ্র অন্ধকার। মাঝে মাঝে জোনাকির দীপ্তির মতন ক্ষীণ আলোর রেখা এখানে ওখানে। অস্পষ্ট দেখা গেল খেত খামার বাড়ির ইসারা। আঁকাবাঁকা রেখায় মাতঙ্গী নদীর স্রোত। ট্রেনের চাকায় চাকায় যান্ত্রিক ছন্দোবদ্ধ ঝঙ্কার। কিন্তু কেবলই লীলার ভুল হতে লাগল। চাকার ঘর্ষণের তীব্র আর্তনাদ নয়, কাচের সুরা-পাত্র চূর্ণ হয়ে যাবার শব্দ। বাইজির শ্লেষ-মেশানো হাসির কলরোল।

শ্বশুরবাড়ি চলেছেন বুঝি? সামনে-বসা দুটি বৌয়ের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করল।

প্রথমে কথাটা লীলার কানেই যায় নি। ঝুঁকে পড়ে আর একবার জিজ্ঞাসা করতে লীলার খেয়াল হল।

কিছু বললেন?

বৌটি আবার জিজ্ঞাসা করল।

লীলা মাথা নাড়ল, না, শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি চলেছি।

লীলার জলচকচক চোখ ওদের নজর এড়ায় নি। তাই বৌটি থেমে আবার বলল, অনেকদিন থাকবেন বুঝি বাপের বাড়ি?

এবারে লীলা মুখে উত্তর দিল না। ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ, অনেকদিন থাকবে। মনে মনে বলল, হয় তো আজীবন।

ছোট স্টেশন। টিমটিমে তেলের আলো। চোখের জল লুকোবার জন্য লীলা বাইরে ঝুঁকে পড়ল। স্টেশনের নাম বিবির হাট। এক সময়ে শেখরনাথের জমিদারির অংশ ছিল, আজ বোধ হয় দত্তসায়েবের।

॥ দশ ॥

গোলমালে লীলার ঘুম ভেঙে গেল। অনেক লোকের হৈ চৈ। কুলিদের চীৎকার।

প্রথমে বুঝতে লীলার যেন কষ্ট হল। এত গণ্ডগোল কিসের। গোরাছাউনির মাঠে বুঝি শিবরাত্রির মেলা বসেছে। তাই শড়ক দিয়ে একটানা লোকের স্রোত চলেছে। আওয়াজে চারদিক কাঁপিয়ে।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছেই লীলার ভুল ভাঙল। ভরতপুর নয়, হাওড়া স্টেশনে গাড়ি ঢুকছে। জনতার কলরবে কান পাতা দায়। জানলা দিয়ে চেয়ে দেখল ইতস্তত সঞ্চরমান লোকগুলোর দিকে। অপরিচিত কঠিন মুখের সার। লীলাকে অভ্যর্থনা করতে কেউ আসে নি। কলকাতা শহরে চেনা জানা কেউই নেই। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে লীলা ভাবতে শুরু করল। অনেক আগে কলকাতাতেই ছিল তারা। ভবতোষবাবু চাকরি করতেন তখন। লীলার মাও বেঁচে। দু-একজন পড়শীর নাম মনে পড়েছে। একেবারে পাশাপাশি থাকত। কিন্তু পুরনো দিনের সে পরিচয়ের ওপর নির্ভর করে এতদিন পরে তাদের আশ্রয়ে কখন ওঠা যায়! তা ছাড়া, কোথায় তারা ছড়িয়ে ছিটকে পড়েছে ঠিক আছে!

ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গেই হীরু বাগ্দী এসে দাঁড়াল। ঝলমলে পোশাক আর নয়, সাদাসিদে জামা জড়িয়েছে অঙ্গে। পরনে ধুতি। ভরতপুরে যে পোশাকে মানাত, স্বাতন্ত্র্যের আভাস দিত, জনবহুল কলকাতার বুকে সে পোশাকে হীরুকে হাস্যাস্পদই করে তুলবে, এটুকু বুঝতে তার অসুবিধা হয় নি।

নেমে আসুন মা।

সঙ্গের মেয়েদুটি মাঝপথে কোথায় নেমে গেছে। কামরা ফাঁকা। একটা কুলি উঠে জিনিষপত্র বের করার চেষ্টা করতেই পাশ কাটিয়ে লীলা নেমে পড়ল। খুকুকে বুকে জড়িয়ে।

ভিড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে বেরিয়ে এল। সবে রাস্তায় জল দেওয়া হয়েছে। ভোরের হাওয়া বেশ ভিজে ভিজে। এত সকালেই কলকাতা জেগে উঠেছে।

কর্মব্যস্ত সবাই ছুটাছুটি শুরু করেছে। ঘোড়ার গাড়ি, ট্যাক্সি, রিক্সার ভিড়।

সামনে দাঁড়ানো ঘোড়ার গাড়ির ছাদে মালপত্র উঠিয়ে হীরু ঘুরে দাঁড়াল। লীলার মুখোমুখি।

কোথায় যাব মা?

ক্লান্ত দুটি চোখ মেলে লীলা এদিক ওদিক দেখল। ঢেউয়ের ঝাপটায় তলিয়ে যাওয়া মানুষের পারের সন্ধানের চেষ্টা। আঁকড়ে ধরার মতন কিছু একটা পেলেই হল। মাটির চর না হোক, ভাসন্ত কোন ভেলা। আশ্রয় করে ক্লান্তি অপনোদন অন্তত করতে পারে। কিছু সময় নিশ্বাস নেবার ঠাঁই।

লীলার হঠাৎই মনে পড়ে গেল। অনেক দিনের কথা, কিন্তু সে তুলনায় এমন কিছু আবছা নয়।

নতুন মামা! ওর মার দূর সম্পর্কের এক ভাই। জোড়া গির্জার সামনে থাকত। গলির নাম লীলার মনে নেই, কিন্তু বাড়িটা মনে আছে। লাল রংয়ের দুতলা বাড়ি। চারপাশে সবুজ বারান্দা। সামনে একটু ফালি জমিও ছিল। বেল, চাঁপা, জুঁইয়ের পাশাপাশি নতুন মামীমার হাতে পোঁতা লাউ আর পুঁইয়ের গাছ। নতুন মামা আর নতুন মামীমা প্রায়ই ওদের বাড়ি আসতেন। খুব আমুদে লোক নতুন মামা, নতুন মামীমা সেই পরিমাণে চাপা। লীলাকে খুব ভালবাসতেন। ওর মা মারা যাবার পরও অনেকবার এসেছিলেন। লীলাকে নিয়ে রেখেছিলেন তাঁদের বাড়ি। বলেছিলেন, আমার ছেলে নেই, পুলে নেই, তুমি আমাদের কাছেই থেকে যাও, কেমন?

তখন লীলা ঘাড় নেড়েছিল। বাপকে ফেলে থাকতে মন সরে নি, কিন্তু আজ আর লীলার কোন অসম্মতি নেই। মাথার ওপর একটা শুধু আচ্ছাদন চায়, নিজেকে আশপাশের কুৎসিত দৃষ্টি থেকে আড়াল রাখবার জন্য দেওয়ালের আবরণ। নিজের দিগন্তে আর কোন স্বপ্ন নেই, আশা-আকাঙ্ক্ষা স্তিমিত, কিন্তু যেমন করে হোক খুকুর গতি তো করতে হবে।

হীরু কাশির শব্দ করতেই লীলার খেয়াল হল। গাড়োয়ানকে একটা নির্দেশ দিতে হবে।

লীলা আস্তে আস্তে বলল জোড়া গির্জার কথা, লালবাড়ি আর সবুজ বারান্দা। সামনে চওড়া শড়ক। ট্রামের লাইন পাতা।

গাড়োয়ান কি বুঝল কে জানে। ওদের ওঠা শেষ হলে চাবুক কসাল ঘোড়ার পিঠে। ছোট বড় নানা রাস্তা, গলিঘুঁজি পার হয়ে ছুটল গাড়ি।

জোড়া গির্জা। মসৃণ পিচঢালা শড়ক। ভরতপুরের মতন উঁচু-নিচু লাল মাটির পথ নয়। চলতে এখানে কোন অসুবিধা নেই। কেবল চলা, বিরতি নেই, বিশ্রাম নয়। শহর থামতে দেয় না মানুষকে।

লীলা উঁকি দিয়ে দেখল। জোড়া গির্জার সামনে অপরিসর রাস্তা। মোড়ের বকুল গাছটা এখনও ঠিক রয়েছে। মনে আছে লীলার, এ পথে আসতে যেতে কতদিন কোঁচড় ভরে ফুল কুড়িয়েছে। বাড়িতে এনে মালা গেঁথেছে বসে বসে।

গাড়োয়ানের পাশ থেকে নেমে হীরু বন্ধ খড়খড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

মা।

ওই যে হীরু সামনের রাস্তাটা। বকুলগাছের পাশ দিয়ে, খান দুই বাড়ি পরেই।

লীলা ভাবতে আরম্ভ করল। কি একটা নাম যেন ছিল নতুন মামার। লীলার বাবা ডাকতেন 'বড় কুটুম' বলে। তাঁর নামটা বাড়ির দরজায় পেতলের প্লেটে লেখাও ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে কিছুতেই লীলা নামটা মনে করতে পারলে না।

গাড়ি ঘুরল। গলির মোড়ে লোকের জটলা। পাশ কাটিয়ে সন্তর্পণে গাড়ি এগিয়ে চলল।

খড়খড়ি একটু ফাঁক করে লীলা চেয়ে দেখল। লাল রংটা বিবর্ণ হয়ে এসেছে। বারান্দা, জানলার সবুজ রংটাও নিষ্প্রভ। কিন্তু ওই বাড়ি! লীলা ঠিক চিনতে পারল।

হীরু গাড়ির পাশ দিয়ে হাঁটছিল। লীলা একটু গলা চড়িয়ে বলল, ওই যে এদিকের লাল বাড়িটা।

গাড়ি থামল। হীরু এগিয়ে আসার আগেই হাতল ঘুরিয়ে লীলা দরজা খুলে ফেলল।

আপনি নামবেন না মা। গাড়ির মধ্যে বসুন। আমি খোঁজ নিয়ে আসছি।

এত দুঃখেও লীলার হাসি এল। ভরতপুরের মল্লিক-বাড়ির আভিজাত্য আর সম্ভ্রমের পালা শেষ, এতদূর সে সব বয়ে নিয়ে আসার কোন মানে হয় না। আশ্রয়প্রার্থিনী দুস্থা এক মেয়ে এ ছাড়া এ নির্মম শহরে লীলার আর কোন

পরিচয় নেই। তাছাড়া, শুধু হীরু গিয়ে দাঁড়ালে নতুন মামা চিনতেই পারবেন না। ভবতোষবাবুর মেয়ে এই পরিচয়ই তাঁর জানা, ভরতপুরের হৃতসম্পদ জমিদার বংশের অভিশপ্ত বধূর কথা তো তাঁর জানবার নয়। কাজেই হীরুর দেওয়া পরিচয়ে তিনি চিনতে পারবেন কি করে?

খুকুকে কোলে করে লীলা নেমে পড়ল রাস্তায়। হীরুর পিছন পিছন বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ফালি জমি ঠিকই আছে। ফুলগাছের বাহার। তবে আগের মতন ঝকঝকে তকতকে নয়। অযত্নবর্ধিত গাছের সার। তলায় শুকনো পাতার স্তূপ।

তুমি একটু দাঁড়াও হীরু। আমি খোঁজ করি।

বার তিনেক কড়া নাড়ার শব্দ শেষ হতেই ভিতর থেকে গলার আওয়াজ শোনা গেল। জুতোর শব্দ।

লীলা একটু সরে দাঁড়াল এ পাশে। নতুন মামার বয়সও কম হল না, এক নজরে চিনতে পারবেন এমন আশা কম।

খিল খোলার আওয়াজ। দরজা খুলতেই কিন্তু লীলা আরও পিছিয়ে গেল।

মাথায় পাকা চুল, গলায় মাফলার, কালো রংয়ের গাউন পরা প্রৌঢ়া মেম। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। সারা মুখে বয়সের হিজিবিজি নক্সা। মুখ বাড়িয়ে দেখেই থমকে গেল। চোখের চশমা কপালে তুলে বলল, কি চাই?

মেম দেখে লীলা পিছিয়ে গিয়েছিল, মেমের মুখে বাংলা শুনে একটু এগিয়ে এল। আস্তে আস্তে বলল। একজন বাঙালী বাবুর খোঁজ করেছে। ফর্সা মোটাসোটা চেহারা। মাথায় চকচকে টাক। ছেলেপুলের বালাই নেই। আগে এ বাড়িতে থাকতেন।

এত সব কথা কিন্তু মেমের কানেও গেল না। লীলার দিকে ঝুঁকে পড়ে খনখনে গলায় বলল, একি, রক্ত কেন কপালে?

রক্ত? লীলাও চমকে উঠল। রক্ত এল কোথা থেকে। আঁচল দিয়ে কপাল চেপে ধরেই বুঝতে পারল, নতুন করে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে। আগের দিনের ক্ষতমুখে আবার শুরু হয়েছে শোণিত ক্ষরণ। স্বামী-দেবতার প্রেমের স্পর্শ।

কিন্তু এ ক্ষতের উৎস সম্বন্ধে কাউকে তো কিছু বলা যায় না। নিঃশব্দে

শুধু সহ্য করতে হয়। আঁচলই শুধু রাঙা হয়ে ওঠে না, ব্যথায় মনও আরক্ত হয়।

লীলা ম্লান হাসল। আমতা আমতা করে বলল, ট্রেনে, ট্রেনের জানলায় মাথা লেগেছে। ও কিছু নয়। রক্ত ঝরা এমনি থেমে যাবে। কিন্তু এ বাড়ির মালিকের সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার।

বাড়ির মালিক! মেম কোমরে দু হাত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তারপর নিজের বুক চাপড়ে বলল বাড়ির মালিক মিসেস জি স্যামুয়েলস্। কর্পোরেশনের খাতাপত্রে স্পষ্ট করে লেখা আছে। কোন বাঙালী বাবু মালিক বলে তার জানা নেই। এ বাড়ি তার স্বামী কিনেছিল পার্শী ব্যবসাদার মিঃ মোডির কাছ থেকে। যে মিস্টার মোডি ঘোড়দৌড়ের মাঠে গলায় বন্দুকের নল লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছিল, তার ঘোড়া ব্লু ড্যানিয়ুব বাজী হারার পর। তার কাছ থেকে জর্জ বাড়িটা কিনেছিল।

মেমের কথা শেষ হবার আগেই লীলা পিছিয়ে এসেছিল। ধাপ বেয়ে নামতে নামতে বলল, মাপ করবেন, বাড়ি ভুল হয়েছে।

মেম চোখ তুলে দেখল। রাস্তায় দাঁড়ানো ঘোড়ার গাড়ি। গাড়ির ছাদে মালপত্র। ক্লান্ত বিষণ্ণ চেহারার অপূর্ব সুন্দর এক ভদ্রমহিলা। কপালের পাশে গভীর ক্ষতরেখা। পাশে দাঁড়ানো জোয়ান দারোয়ান।

দু-এক মিনিট মেম কি ভাবল। তারপর বলল আপনাদের খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে। প্রয়োজন বোধ করলে কিছুক্ষণ আমার বৈঠকখানায় বিশ্রাম করে যেতে পারেন।

ধন্যবাদ, তার দরকার হবে না।

লীলা দ্রুতপায়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল, পিছন পিছন হীরু বাগ্দী।

মা, এবার কোথায় যাব?

এবার? লীলা চোখ তুলে চাইল।

হীরুও যেন পরিশ্রান্ত। নিজের তাপদগ্ধ জীবনের সঙ্গে হীরুকেও কেন এমনভাবে লীলা জড়াল। চাকরির নিশ্চিন্ত পরিবেশ থেকে টেনে এনে কোথায় ঘোরাবে পথে পথে। ওর দুঃখ ওর নিজেরই, তার আঁচে অন্য মানুষকে কেন পোড়াবে এমনভাবে!

লীলার মনে হল একবার বলে, গাড়িসুদ্ধ নামা যায় না গঙ্গার অতল গর্ভে!

মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ভাগ্যহীন নারীর সলিল-সমাধি। সব জ্বালা, সব যন্ত্রণার সমাপ্তি।

কিন্তু সব সময়ে মনের সব কথা মুখ ফুটে কি বলা যায়!

কোন একটা হোটেলে গিয়ে উঠলে হয়। পরে যাহোক কিছু একটা বন্দোবস্ত করলেই হবে।

খুব অবসন্ন লীলার স্বর। কুণ্ডলী পাকিয়ে কান্না উঠছে গলার কাছে। আঘাতে আঘাতে ভেঙে বুঝি গুঁড়িয়ে পড়বে মাটিতে।

হীরু আবার উঠল গাড়োয়ানের পাশে। গাড়োয়ানকে ফিসফিসিয়ে বলতেই গাড়োয়ান গজর গজর আরম্ভ করল। সাত সকালে আচ্ছা সওয়ারী জুটেছে তো। যাবার জায়গারই কোন ঠিক নেই। সারা কোলকাতা শহর ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। হোটেলে যাবার দরকার, আগে বললেই হত। একরাশ হোটেল ফেলে এসেছে পিছনে।

গাড়োয়ানের কথা লীলার কানে গেল না। খুকু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। খিদেই পেয়েছে খুব সম্ভব। তার ওপর কড়া রোদেও কষ্ট হচ্ছে।

লীলা খুকুকে বুকের মধ্যে চেপে ধরল।

সাদা দোতলা বাড়ি। গেটের দু পাশে ফুলের টব। অনেকগুলো লোক ঘোরাফেরা করছে সিমেণ্ট-বাঁধানো উঠানে।

ভাড়া চুকিয়ে মালপত্র নামিয়ে রাস্তায় দাঁড়াতেই ছোকরা গোছের একজন সামনে এসে দাঁড়াল।

প্রথমে হীরুর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল, তারপর লীলার দিকে ফিরে বলল, মালপত্তর তুলি মা-ঠাকরুন?

হীরু উত্তর দিল, মালপত্তর তো তুলবে। ঘর খালি আছে হোটেলে?

আজ্ঞে আজ সকালেই ছ নম্বর খালি হয়েছে। তেতলায় খোলা ছাদের ওপর ঘর। যেমন হাওয়া, তেমনি আলো। আমি মালপত্তর নিয়ে তুলছি, আপনি ম্যানেজার বাবুর কাছে নামধাম লিখিয়ে ওপরে আসুন।

একেবারে সামনেই ম্যানেজার। টেবিলের ওপর স্তূপাকার কাগজপত্র। কালি, কলম, দোয়াতদান। মাথায় চুলের বালাই নেই, প্রশস্ত ললাট, গলায় যজ্ঞোপবীত, সুগৌর প্রৌঢ়।

হীরু এগিয়ে দাঁড়াতেই টেবিলের ওপর রাখা চশমাটা নিয়ে চোখে পরলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন আপাদমস্তক। প্রথমে হীরু বাগ্দীকে, তারপর লীলাকে। কোলের খুকুও বাদ পড়ল না।

কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

হীরু ভরতপুরের নাম বলল।

কতদিন থাকা হবে এখানে?

বিরাট সাইজের এক খাতা ইতিমধ্যে ম্যানেজার খুলে ফেলেছেন। মোটা কলম কালিতে ডুবিয়ে তৈরি। উত্তর পেলেই চটপট লিখে নেবেন।

হীরুর ইতস্তত ভাব দেখে লীলাই এগিয়ে এল।

আমার স্বামী ব্যবসার ব্যাপারে পশ্চিমে গেছেন! তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত থাকতে হবে। কতদিনের জন্য বলা মুশকিল।

উত্তরটা ম্যানেজারের খুব যে মনঃপূত হল এমন মনে হল না। স্বামী ব্যবসা উপলক্ষে বাইরে গেছেন তো স্ত্রীকে হোটেলে থাকতে হবে এই বা কেমন কথা? সুন্দরী স্ত্রীলোক, সঙ্গে দারোয়ান গোছের এক লোক। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন গোলমেলে। শেষকালে আশ্রয় দিয়ে বিপদে পড়তে হবে না তো?

ম্যানেজারের মুখের ভাব লীলার চোখ এড়াল না। মানুষের মনে সন্দেহ জাগা খুবই স্বাভাবিক।

আমরা এতদিন যেখানে ছিলাম সেখানে থাকা আর সম্ভব হল না। বদলী হয়ে যেতে সঙ্গে সঙ্গে কোয়ার্টারও খালি করে দিতে হল। এ শহরে জানা-শোনাও কেউ নেই। তাই হোটেল ছাড়া আর উপায়ও নেই। একটানা এত গুলো মিথ্যা কথা বলে লীলা হাঁপাতে লাগল।

মোটা খাতায় নামধাম লিখে নিয়ে ম্যানেজার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আসুন, আপনাদের থাকার ঘরটা দেখিয়ে দিই।

হোটেলের ছোকরা সিঁড়ির চাতালেই অপেক্ষা করছিল, ম্যানেজার এগিয়ে আসতেই বলল, ওপরে ছ নম্বরের সামনে আমি মালপত্তর সব রেখে এসেছি।

ম্যানেজার কোন উত্তর দিলেন না। ওপরে উঠে পৈতেয় আটকানো চাবি দিয়ে ঘর খুলে দিলেন। হোটেলের বেয়ারার দিকে চেয়ে বললেন, এই, মালটাল-গুলো ঘরের মধ্যে নিয়ে আয়। তারপর লীলার দিকে ফিরে বললেন, চাবি আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি মা।

লীলা কোন রকমে ঘরে ঢুকে ইজিচেয়ারে নিজেকে ছেড়ে দিল। আর দাঁড়াবার শক্তি নেই। দু চোখে ক্লান্তি আর অবসাদ।

কিছুক্ষণ পরে চোখ খুলে লীলা দেখল হোটেলের বেয়ারা বিছানা খুলে খাটের উপর বিছিয়ে দিয়েছে। ট্রাঙ্কটা সরিয়ে রেখেছে কোণের দিকে। ফুল লতাপাতা নক্সা-কাটা মাটির কুঁজোয় জল ভরে পাশে এনে রেখেছে। চোখ চেয়েই লীলা বলল, এই শোন।

বেয়ারা চৌকাঠের কাছে পাপোষটা ঝাড়ছিল, কাজ থামিয়ে বলল, আমার নাম বনমালী মা-ঠাকরুণ। ওই নামেই ডাকবেন।

বনমালী, খাটের ওপর ঘুমন্ত মেয়েকে সন্তর্পণে শোয়াতে শোয়াতে লীলা বলল, একটু দুধের বন্দোবস্ত করে দিতে হবে। মেয়েটার জন্য।

বনমালী উঠে দাঁড়াল, এখনি এনে দিচ্ছি মা ঠাকরুণ।

মিনিট দশেক। তারপরই বনমালী দুধের কাপ হাতে ওপরে উঠল। টেবিলের ওপর রেখে বলল, এই এনেছি দুধ। এখন তো কোন কাজ নেই। আমি নিচে যাচ্ছি। দরকার হলেই এই বোতামটা টিপবেন।

বনমালী জানলার পাশে একটা বোতাম দেখিয়ে দিল।

লীলা দু হাত দু গালে রেখে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল। খোলা জানলা দিয়ে অনেকখানি নজরে আসে। অট্টালিকার সার। বুঝি মানুষের দম্ভ আর অহঙ্কারের প্রতীক। এসব ছাড়িয়ে চোখে পড়ল নীল আকাশের কিছুটা। মেঘের মালিন্য নেই। উদার আকাশ। একেবারে কোণের দিকে ছোট্ট একটা ঘুড়ি। প্রায় অস্পষ্ট বিন্দুর মতন। হাওয়ায় থরথর করে কাঁপছে।

চেয়ে থাকতে থাকতেই লীলার মনে এল কথাটা। ওর জীবন অনেকটা ওই ঘুড়িরই মতন। অলক্ষ্যে স্থতোর কারসাজি চলেছে। কখনও টানা, কখনও ঢিল দেওয়া। লক্ষ্যহীন, কিছুটা অর্থহীন, বাতাসের গতিনির্ভর কাগজ-সর্বস্ব। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, কিংবা অন্য কোন জোরালো স্থতোর প্যাঁচে খেই হারিয়ে ভেসে ভেসে কোথায় গিয়ে পড়বে ঠিক আছে?

মা।

হীরুর গলায় লীলার চমক ভাঙল।

হীরু নিচে থেকে স্নান সেরে এসেছে। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলল, স্নান সেরে নিন মা। পাশেই কলঘর। আমি ম্যানেজারকে বলে এসেছি, ওপরেই ভাত পাঠিয়ে দেবে।

লীলা আস্তে উঠে দাঁড়াল।

বিকেলের দিকে মেয়েকে নিয়ে লীলা শুয়েছিল। আকাশ-পাতাল চিন্তা। কুলকিনারাহীন। ঝড়ের দাপটে কুটোর মতন ভেসে চলেছে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। নিশ্বাস ফেলার সময়টুকুও নেই। দরজায় খুট খুট আওয়াজ হতেই লীলা উঠে বসল।

হীরু বাইরে গেছে। টুকিটাকি জিনিস কেনার জন্য। সেই বোধ হয় ফিরে এল। দরজা খুলেই লীলা সরে এল। না হীরু তো নয়। অবগুণ্ঠনবতী একটি মহিলা।

মহিলা ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে এদিক ওদিক দেখেই মাথার ঘোমটা নামিয়ে দিল। হেসে বলল, আলাপ করতে এলাম দিদি। একলা একলা হাঁপিয়ে উঠেছি।

শ্যামা গোলগাল গড়ন। সিঁথিতে চওড়া সিন্দুরের রেখা। হাতে চুড়ির গোছা। পানের রসে টুকটুকে লাল ঠোঁট।

আপনারা সকালে যখন নামলেন, তখনই বারান্দা থেকে লক্ষ্য করেছি। বেটাছেলের পালের মধ্যে সত্যি হাঁপিয়ে উঠেছি ভাই। কথা বলবার লোক পাই না একটা।

আপনি বুঝি এখানেই উঠেছেন। কোণ থেকে চেয়ার টেনে নিয়ে লীলা মহিলাকে বসতে দিল। নিজে বসল খাটের ওপর। কথা বলবার লোক পেয়ে লীলাও যেন বেঁচে গেল। একলা থাকলেই উদ্ভট সব চিন্তা। চোখ বুজলেই সর্বনেশে স্বপ্ন।

হ্যাঁ ভাই, মাস দেড়েকের ওপর আছি। পাটনাতে ছিলাম এর আগে। বদলীর চাকরি। কোথাও কিছু নেই, খবর এল, যাও কলকাতা। এখানে এসে দেখি, সারা শহরে তিল রাখবার জায়গা নেই। কোথাও বাড়ি তো দূরের কথা, বারান্দা ভাড়া পাওয়াই দুষ্কর। অনেক খুঁজে হায়রান হয়ে শেষকালে এখানে এসে উঠেছি। তা বলতে নেই ভাই, এ হোটেলের খাওয়া-দাওয়াটা

ভাল। যত্ন-আত্তিও করে। তবে হাজার হোক হোটেল তো! হৈ হল্লা হয় মাঝে মাঝে। পুরুষদের গোলমাল।

মহিলাটিকে লীলার খুব ভাল লাগল। গোলগাল হাসি-খুশি চেহারাই শুধু নয়, কথাতেও হাসির ছিটে। দমকা হাওয়ায় শুকনো পাতা, ধুলো সব উড়িয়ে নিয়ে যায়। কোথাও দুঃখের আবর্জনা জমতে দেয় না।

আপনারও বোধ হয় একই অবস্থা? উত্তরের অপেক্ষা না করেই মহিলা বলে চলল, তবে কি জানেন, নিজের বাড়িঘর না হলে মন ভরে না। তাই তো ওঁকে বলি, রিটায়ার করে তো থাকতে হবে এক জায়গায়, কোথাও বরং একটা জমিটমি কিনে রাখ। উনি কানই দেন না সে কথায়। বলেন, কার জন্য?

কেন?

উত্তর দিতে গিয়ে মহিলা মুখ নিচু করল। লজ্জা-লজ্জা ভাব। আঁচলের কোণ দিয়ে ঠোঁট মুছে আস্তে আস্তে বলল, মানে, ইয়ে, ছেলেপুলে নেই কিনা। তাই উনি ওই কথা বলেন।

অনেকক্ষণ ধরে লীলা চেয়ে রইল। চেয়ে চেয়ে আশা আর মেটে না। আরো একজনের কথা মনে পড়ল। মাতৃত্বের অতৃপ্ত স্বাদ বুকে নিয়ে আর একটা জীবনের অসময়ে বিয়োগান্ত পরিণতি। বলা যায় না, অন্যরূপ ধরে আবার সেই বুঝি ফিরে এসেছে লীলার সান্নিধ্যে। দু হাত বাড়িয়ে খুকুকে কোলে নেবে। সান্ত্বনার হাত বোলাবে লীলার ক্ষতের ওপর।

হঠাৎ খাটের দিকে নজর পড়তেই মহিলা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, আপনার বুঝি ওই একটি মেয়ে। বা, ফুলের মতন ফুটফুটে। ভারি চটকাতে ইচ্ছা করছে।

মহিলাটির ভাব দেখে লীলা হেসে ফেলল। বলল, একটু বসুন না, এখনি জেগে উঠবে, তখন যত পারেন চটকাবেন।

ঠিক আপনার মতন দেখতে হয়েছে।

উহুঁ, লীলা ঘাড় নাড়ল, রং আর কপাল ওর বাপের মতন।

ভদ্রলোক এলে মিলিয়ে দেখব এখন। কথা শেষ করে মহিলা হাসল।

এবার কিন্তু হাসি ফুটল না লীলার মুখে। কবে ফিরবেন শেখরনাথ? কোন জন্মে? মায়াবিনীর মোহজাল কাটিয়ে, দত্তসায়েবের সর্বনেশে প্রলোভনের ফাঁদ এড়িয়ে লীলার কাছে আবার কবে ফিরে আসবেন? সারাটা জীবন লীলা দু

হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করবে। মণ্ডপ দুশ্চরিত্র শেখরনাথ নয়, ফিরে আসবেন অনুতপ্ত স্বামী প্রতীক্ষমানা স্ত্রীর কাছে।

কর্তাটিকে তো নামতে দেখলাম না?

মহিলার কথায় লীলা ঘুরে বসল।

তিনি এখানে নেই ভাই। ফিরে এলে আগে আপনাকে ডেকে এনে দেখাব।

লীলা ম্লান হাসল। কোন উপায় নেই। হাসিখুশির বোরখা জড়িয়ে এই ভাবে দিন কাটাতে হবে। যতই বুকে কাঁটা বিঁধবে ততই হাসি ফোটাতে হবে মুখে।

চিঠি লিখে তাড়াতাড়ি কর্তাকে নিয়ে আসুন। মহিলা মুখ টিপে হাসল।

উত্তর দিতে গিয়েই লীলা থেমে গেল। ককিয়ে কান্নার শব্দ। নিচে থেকে আসছে। কান পেতে লীলা শুনল। কান্না নয়, বেহালার সুর। পূরবী। আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান আলোয় গুমরে গুমরে উঠছে চাপা কান্নার মত। ছড় টানার সঙ্গে সঙ্গে করুণ মূর্ছনা ছড়িয়ে পড়েছে বায়ুস্তরে।

পিছু হেঁটে লীলা অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেল। আজকের তাপদগ্ধ প্রান্তর নয়, পুরনো দিনের শ্যামল ভূমিখণ্ড। শুধু বেহালার সুরই নয়, জীবনেরও সুর ছিল। দিনের পর দিন বেহালা চেপে ধরে সুরের খেলা চলত। ছড় দিয়ে তার ছোঁয়া নয়, হাত দিয়ে মন ছোঁয়া।

লীলার গাল বেয়ে বড় বড় ফোঁটায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। ভিজে উঠল কাজল কালো চোখের পাতা।

আবার এতদিন পরে সে সুরের আভাস কে আনল? হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে নির্মম মোচড়। হাসির ছদ্মবেশে আর বুঝি নিজেকে আড়ালে রাখা যায় না। ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়বে লীলা। অচেনা মানুষের হাটে ধরা পড়ে যাবে।

॥ দশ ॥

রাত্রে শুয়ে শুয়ে লীলা হিসাব করল। কটাই বা টাকা। এই পুঁজির ওপর নির্ভর করে চালাতে হবে অনির্দিষ্ট কাল। নিজের সামান্য জমানো কিছু, তার ওপর জনার্দন নায়েবের গচ্ছিত টাকা। নায়েবের ভয় ছিল ছোটবাবুর হাতে এ টাকা তুলে দিলে ফেরত পাবার আশা কম। তাই নির্ভয়ে তুলে দিয়েছিল বৌরানীর হাতে। স্বপ্নেও নায়েব ভাবে নি সে টাকা সম্বল করে ভরতপুরের অন্তঃপুরচারিণী বাইরের জগতে পা দেবে। গ্রাসাচ্ছাদন চালাবে তারই সঞ্চিত অর্থের বিনিময়ে। লীলাই কি ভেবেছিল কোনদিন ?

টাকা শেষ হলে নিজের গয়না একটি একটি করে খুলে দিতে হবে। এ ছাড়া উপায়ই বা কি! খুকুকে মানুষ করতে হবে, ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দেওয়া নয়। বিয়েতে আর শখ নেই লীলার। লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে হবে। নিজের পায়ে নিজে যাতে দাঁড়াতে পারে। লীলার মতন মিথ্যা মর্যাদাবোধ, ঠুনকো আভিজাত্যের খোলস আঁকড়ে বাঁচতে চেষ্টা করার কোন মানে হয় না। অপমান, নির্যাতন, নিগ্রহ। নিঃশেষে নিজের নারীত্বটুকুও বিলিয়ে দেওয়া। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে লীলা দেখেছে। সকালের দিকে দল দল মেয়ে চলেছে পথ দিয়ে। পুরুষের পাশাপাশি, পিছনে পিছনে নয়। অফিসে, স্কুলে, কলেজে।

যুগ শুধু ভরতপুরেই বদলায় নি, বদলেছে সারা দুনিয়ায়। সামন্ততন্ত্রের নিভে-আসা প্রদীপ থেকে আলো জ্বালিয়েছে বণিক-সম্প্রদায়। প্রাসাদ আর সৌধ ভেঙে ভেঙে কারখানা আর মিল গড়ে উঠেছে। পরিবর্তন শুধু বাইরেই নয়। এর ছোঁয়াচ লেগেছে অন্তঃপুরেও।

আভিজাত্যের চিতাগ্নি থেকে কারা এগিয়ে আসবে সমিধ জ্বালিয়ে নিতে! পথে ঘাটে আজ যারা দিকে দিকে ছুটেছে জীবিকার সন্ধানে, তারাই বুঝি সেই নতুন দিনের অগ্রদূত। দত্তসায়েবের শেষ নিশ্বাস থেকে আহরণ করবে নিজেদের প্রাণশক্তি।

এসব কথা লীলার নিজের নয়। ওর বাপের কাছে শেখা। মোটা মোটা

বই খুলে পড়তে পড়তে বোঝাতেন লীলাকে। যে হাত দিয়ে যন্ত্র আর কলকব্জা ধরে কুলিমজুরেরা, সে হাত দিয়ে তারা নাকি রাজদণ্ড ধরবে। আকাশে বাতাসে তারই ঘোষণা।

মাঝরাতে খুকু একবার চিৎকার করে উঠল, ভয় পেয়ে। সজোরে আঁকড়ে ধরল লীলাকে। ভয় পেলে তবু ওর আঁকড়ে ধরার লোক আছে। লীলার মতন এমন নিরালম্ব বুঝি কেউ নয়।

ভোর ভোর লীলার ঘুম ভেঙে গেল। জানলার কাচের মধ্য দিয়ে রক্তাক্ত আকাশের কিছুটা দেখা গেল। খাটে পা ঝুলিয়ে লীলা বসে রইল।

চোখ ফেরাতেই নজরে পড়ে গেল। বাতাস আসার জন্য এদিকের জানলাটা খোলাই থাকে। ছাদের কার্নিশের ধারে কে একজন দাঁড়িয়ে। একটু আলো ফুটতেই মানুষটাকে চেনা গেল। ডিরেক্টর পুলিনবাবু। বড় ঘন ঘন ছাদে আসছেন আজকাল।

লীলা চাদর ঢাকা দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল বিছানায়।

তন্দ্রা এসে গিয়েছিল, দরজায় টোকার আওয়াজে উঠে বসল।

বাইরে হীরু এসে দাঁড়িয়েছে। ঘরের মেঝেয় চনচনে রোদ। অনেক বেলা হয়ে গেছে। দরজা খুলে দিতেই হীরু ঘরে এসে ঢুকল, পিছনে ট্রে হাতে বনমালী।

মুখহাত ধুয়ে চা খাওয়া শেষ হতে হীরু আবার এসে দাঁড়াল দরজার গোড়ায়। ঘোরাফেরা দেখে মনে হল কিছু একটা যেন বলতে চায়।

কিছু বলবে হীরু?

হীরু মাথা চুলকাতে লাগল মাটির দিকে চেয়ে। কোন কথা বলল না।

কি, বল?

মানে ইয়ে, একটা চাকরির ঠিক করেছি মা।

চাকরি?

হ্যাঁ মা।

কোথায় হীরু, অফিসে নাকি? লীলার গলায় কৌতুকের মিশেল।

না মা। অফিসে চাকরি করার মতন বিদ্যে আর কোথায়! এক বাবুর বাড়ির দারওয়ানি।

দু-এক মিনিট লীলা একটু ভেবে নিল। যতটুকু সম্ভব সাহায্য করতে চায় হীরু। ভরতপুরের অবস্থা ওর অজানা নয়। হৃত-ঐশ্বর্য বাড়ির নিঃসম্বল বৌ। কতটুকু আর সঙ্গে আনতে পেরেছে। সামনে অফুরন্ত ভবিষ্যৎ। অসুখ বিসুখ আছে, মানুষের দায়-বিপদ আছে। সেই জন্যই বুঝি হীরু এই বয়সে নতুন করে চাকরির খোঁজ করেছে।

এই বয়সে আর নাই বা খাটলে হীরু।

মা। কি বলতে গিয়েও হীরু বলতে পারল না। ঢোক গিলল দুবার। কিন্তু বুঝতে লীলার একটুও অসুবিধা হল না।

আমার এখনও তেমন অভাব হয় নি হীরু। সে রকম অবস্থা হলে তুমি শুধু চাকরি করলেই হবে না। আমাকেও একটা যোগাড় করে নিতে হবে।

কান্নায় ভরে এল লীলার গলা। শেষদিকের কথাগুলো জড়িয়ে গেল। কিছু বোঝা গেল, কিছু গেল না।

হীরু আর কথা বাড়াল না। মাথা হেঁট করেই বাইরে চলে গেল।

স্নান সেরে ছাদে কাপড় মেলে দেবার সময় চোখাচোখি হল নিচের সেই মহিলাটির সঙ্গে। লীলাকে দেখেই সে ওপরে উঠে এল।

দিদি, একেবারে একলাটি রয়েছি। খাওয়া-দাওয়া সেরে আসুন না আমার ঘরে। একবার তো পায়ের ধুলো দিলেন না।

ও কি কথা ভাই, লীলা হাসল, পায়ের ধুলো-টুলো বললে তো যাওয়াই মুশকিল। ভারি তো মানুষ আমি।

যাবেন কি না বলুন?

যাব ভাই, কেন যাব না। আপনি দুপুরের দিকে এসে নিয়ে যাবেন।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মহিলাটি আবার এসে দাঁড়াল দরজার কাছে।

কই, হল দিদি?

কি ব্যাপার বলুন তো? লীলা প্লেটে রাখা পান নিয়ে মুখে দিল, নিয়ে যাবার এত তাড়া?

মহিলা এ কথার কোন উত্তর দিল না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল।

খাটের ওপর খুকু, মেঝেয় হীরু। দরজাটা টেনে দিয়ে লীলা নেমে এল।

ছোট বারান্দা। দুটো টবে পাতাবাহারের গাছ। তার সামনেই কামরা। দরজায় চিক ফেলা।

এক হাত দিয়ে মহিলা চিকটা তুলে ধরল। লীলার দিকে ফিরে বলল, আসুন দিদি।

ছোট ঘর, কিন্তু বেশ সাজানো। শুধু হোটেলের আসবাব নয়, নিজস্ব জিনিসও কিছু রয়েছে। টেবিলের ওপরেই কার্পেটে বোনা গোলাপফুল। লাল ফুলের ওপরে কালো ভ্রমর। তলায় কালো পশমে লেখা 'গৌরী'।

যাক, এতদিন পরে নামটা জানতে পারলাম আপনার।

আর বলবেন না। মার যেমন খেয়াল। মেঘের মতন রং অথচ নাম সৌদামিনী। দেখছেন তো গায়ের জৌলুস, এ চেহারায় ও নাম কখনও মানায়?

গায়ের রংয়ের চেয়ে মনের রং যে অনেক দামী ভাই। আপনার মনের রং যে সাদা এটুকু জানতে আমার একটুও দেরি হয় নি।

গৌরীর বয়স যেন কমে গেল কয়েক বছর। লীলাকে নিয়ে যে কি করবে ভেবেই পেল না। ফটোর অ্যালব্যাম খুলে বসল। তারপরই সেলাইয়ের নমুনা। সেগুলো রেখে নিয়ে এল নানা রংয়ের উলের বাণ্ডিল। এসব দেখানো শেষ হলে আস্তে আস্তে নীল রংয়ের ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করল ড্রয়ার থেকে। লীলার একেবারে গা ঘেঁসে বসল।

একটা কথা বলবার জন্য আপনাকে ডেকেছি দিদি।

লীলা অবাক। কি ব্যাপার। এমন করছে কেন গৌরী? ওকে ডেকে গোপনে বলবার মতন কি থাকতে পারে।

কি বলুন তো?

শতরঞ্চের ওপর বার কয়েক গৌরী নখ দিয়ে আঁচড় কাটল। তারপর ধীর গলায় বলল, আমি, মানে উনি একটা জমি কিনেছেন দিদি।

তাই নাকি, লীলা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠার ভান করল, এমন সুখবরটা এতক্ষণ পরে দিতে হয়? বেশ মানুষ তো আপনি!

না মানে, কেনা হয়েছে প্রায় দিন দশেক। ওঁর ইচ্ছে ছোটখাটো একটা বাড়ি করবেন। যতদিন পারি আমরা থাকব, তারপর যদি বদলীর হুকুম আসে ভাড়াটে বসিয়ে গেলেই হবে, কি বলেন দিদি?

খুব ভাল কথা। লীলা ঘাড় নাড়ল।

ততক্ষণে গৌরীর হাতের ভাঁজ করা কাগজটা মেলে ধরেছে লীলার সামনে। নীল জমির ওপর সাদা সাদা অনেকগুলো আঁচড়। বাড়ির নক্সা।

কাল উনি কাকে দিয়ে একটা নক্সাও করে এনেছেন। এমন ব্যস্তবাগীশ লোক আর দুটি নেই।

তাই বুঝি! লীলার ঠোঁটের কোণে হাসির ছিটে। নীড় বাঁধার স্বপ্ন মানুষের শোণিতকণায়। নিরাপদ আবাস রচনা। কোলাহল থেকে দূরে, জনতার আবিল স্পর্শ বাঁচিয়ে। সকলের স্বপ্ন সফল হয় না। কেউ নীড় গড়ে, কেউ সাজানো গৃহস্থালী ফেলে পথের ধুলোয় নেমে আসে। এই ভাঙাগড়ার খেলা সারা পৃথিবী জুড়ে।

আমাকে বুঝিয়ে দিন ভাই।' আমি হিজিবিজি আঁচড় ছাড়া কিছুই বুঝতে পারছি না।

ইচ্ছা করেই লীলা মাথা নিচু করল। কি জানি যদি আরক্ত চোখ গৌরীর নজরে পড়ে যায়। ঠোঁটের কাঁপন লক্ষ্য করে ফেলে!

গৌরী মহা উৎসাহে বোঝাতে শুরু করল। শোবার ঘর। বসবার ঘর। সামনে ফালি বারান্দা। লাল সিমেণ্টের সিঁড়ির ধাপ। একেবারে কোণের দিকে হাল ফ্যাসানের বাথরুম। এ পাশে রান্না আর ভাঁড়ার। আজ যেগুলো এলোমেলো রেখার সমষ্টি সেগুলোই রূপ নেবে একদিন। ইঁটের ওপর ইঁটই শুধু নয়, বাসনার ওপর বাসনা গেঁথে মানুষের পরিতৃপ্তির সৌধ।

গৃহ-প্রবেশের দিন বলবেন কিন্তু ভাই, এ হিজিবিজি নক্সা দেখে মন ভরছে না, ঘুরে ঘুরে আপনাদের আসল ঘরবাড়ি দেখব।

গৌরী কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। হাসির আওয়াজ। জলতরঙ্গের রেশ।

চিকের ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখা গেল। ঠিক বারান্দার ওপাশে। খোলা জানলার ধারে একটি মেয়ে। চোখে কালো চশমা। কোঁকড়ানো চুলের গোছা ঘাড় পর্যন্ত। পরনে ঝলমলে শাড়ি। কি একটা কথায় হেসে লুটিয়ে পড়ছে।

গৌরী ফিরে দেখেই জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হাসির যেন আর শেষ নেই।

চিনতে পারলেন দিদি?

লীলা উঠে গিয়ে দাঁড়াল চিকের এ পাশে। ভ্রূ কুঁচকে ভাল করে নিরীক্ষণ করল। চেনা মেয়ে নাকি যে চিনতে পারবে? অবশ্য হাসির স্বরের সঙ্গে মিল আছে আর একজনের হাসির। কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লীলা হাত বোলাল নিজের কপালের পাশে। দাগ রয়েছে এখনও। এ দাগ বুঝি জীবনে যাবার নয়।

কি জানি ভাই, চিনতে তো পারছি না।

গৌরী বিস্ময়ে বিস্ফারিত করল চোখের তারা। আর একবার বাইরের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, রেবা দেবী। আজকালকার সবচেয়ে বড় স্টার। কি চমৎকার অভিনয়ই করেছেন 'সমাধি' বইটাতে।

চমৎকার অভিনয় করে? কিসের অভিনয়! ছলনার! প্রতারণার! হাসিতেও যেন অভিনয়ের ছোঁয়াচ।

লীলা বিড়বিড় করে বলল, কি জানি ভাই, আমি তো বহুদিন দেখি নি সিনেমা। তাই চিনতে পারছি না।

আপনি সিনেমা দেখেন না বুঝি?

লীলা ঘাড় নাড়ল। না।

তারপর গৌরীর অবাক মুখের দিকে চেয়ে আবার বলল, আমার শ্বশুরবাড়িতে এসব দেখার রেওয়াজ নেই। তা ছাড়া আমাদের ভরতপুরে সিনেমা থিয়েটার ছিল না।

মেয়েটি এদিকে ফিরতেই দেখা গেল চুলে লাল টকটকে একটা বড় সাইজের গোলাপ। হাসি থেমে গেছে। হাতমুখ নেড়ে মেয়েটি কি বলে চলেছে। কিন্তু উনি এখানে যে? মানে এই হোটেলে?

ওই তো ডিরেক্টরের কামরা। প্রায়ই রেবা দেবী আসেন ওখানে।

সামনে প্রসারিত বাড়ির নক্সার দিকে লীলা চেয়ে চেয়ে দেখল, তারপর চোখ তুলে চাইল মেয়েটার দিকে। মিল খুঁজল বুঝি দুটোর মধ্যে। ভাবল ঘর গড়ার স্বপ্ন কোন দিগন্তে মিলিয়ে যায় এমনি সব মেয়েদের আবিল স্পর্শে। দত্তসায়েবের যেমন অভাব নেই, তেমনি রুনি বাইজিরাও ছড়িয়ে আছে সব জায়গায়। আগুনের সঙ্গে বাতাসের মতন এরা চলেছে দিকে দিগন্তে, ঘর ভাঙার, মানুষ ভাঙার কুটিল সংকল্প নিয়ে।

নক্সার কাগজটা গুটিয়ে গৌরীর হাতে দিয়ে লীলা উঠে দাঁড়াল। দু হাত

ওপরে তুলে হাই তুলল। তারপর নিচু গলায় বলল, আজ চলি ভাই। বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

দুপুরে ঘুমোনো অভ্যাস বুঝি? গৌরী নক্সাটা সাবধানে তুলে রাখল ড্রয়ারের ভিতর। হাসি মুখে বলল, আসবেন কিন্তু মাঝে মাঝে।

হাত দিয়ে চিক সরাতে সরাতে লীলা বলল, এই তো আমি এলাম, এবার আপনার যাবার পালা।

একটু এগিয়েই কিন্তু লীলা থেমে গেল। দাঁড়িয়ে পড়ল সিঁড়ির চাতালে।

ঠিক সিঁড়ির মাঝখানে নিচু হয়ে রেবা দেবী জুতো পরছে। দু পাশে পাম গাছের দুটো টব। পাশ কাটিয়ে যাবার উপায় নেই। একবার লীলা মনে করল ফিরে যাবে গৌরীর ঘরে। অপেক্ষা করবে কিছুক্ষণ। কিন্তু ঘুরে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই জুতো পরা শেষ করে রেবা দেবী সোজা হয়ে দাঁড়াল।

একেবারে মুখোমুখি।

চোখের চশমা রেবা হাত দিয়ে খুলে নিল। টানা দুটি চোখ। কাজল-কালো না কাজলে কালো বোঝা গেল না। দুচোখে অগাধ বিস্ময়। নিষ্পলক দৃষ্টি।

মাথার ঘোমটা সরে গিয়েছিল। হাত দিয়ে লীলা ঘোমটা ঠিক করে নিল। অনুভবে বুঝতে পারল, আতপ্ত হয়ে উঠেছে দুটি গাল। ঘামের ফোঁটা জমেছে কপালে।

দ্রুত পায়ে লীলা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। একেবারে ওপরে উঠে কি মনে করে মুখ ফিরিয়েই বিব্রত হয়ে পড়ল।

দুটো হাত সরু কোমরে রেখে তখনও রেবা দেবী দাঁড়িয়ে আছে। দু চোখে শুধু বিস্ময়ই নয়, মনে হল ঈর্ষারও ছিটে, কৌতূহলের মিশেল।

॥ এগার ॥

সে দিন সিঁড়ির মাঝবরাবর দেখা।

গৌরী আর লীলা সিঁড়ি দিয়ে নামছিল, চাতালে পা রাখতেই গম্ভীর গলার আওয়াজ, নমস্কার গৌরী দেবী।

লীলা মুখ তুলল। এবারে খুব কাছাকাছি। ঝলঝলে কোট আর প্যান্ট। চোখে কালো চশমা। হাতে মোটা খাতা। বাইরে যাচ্ছিলেন এদের দেখে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন।

নমস্কার। গৌরী দু হাত জোড় করল।

ডিরেক্টর আরো সরে এলেন। খুব কাছাকাছি।

আপনি একদিন সুটিং দেখতে চেয়েছিলেন। যদি সুবিধা হয় কাল যেতে পারেন। বেলা বারোটা নাগাদ। ভাল সুটিং আছে।

গৌরী আনন্দে উৎফুল্ল। কদিন ধরে ডিরেক্টরকে বলে রেখেছে। জমকালো সুটিং হলে যেন খবর পায়। সেলুলয়েডে আলোছায়ার খেলা দেখেছে, কিন্তু স্টুডিওতে রক্তমাংসের অভিনেতা-অভিনেত্রী কোনদিন দেখে নি। নকল হাসি, নকল প্রেমের মতন সেখানে সব কিছু নকল। রাজপ্রাসাদ থেকে উপবন শুধু পিচবোর্ডের পটভূমির কায়দা।

বেশ তো, যাব। আপনি নিয়ে যাবেন তো?

হ্যাঁ আমার গাড়িতেই যেতে পারেন। এগোতে এগোতে কি ভেবে ডিরেক্টর থেমে গেলেন, আড়চোখে লীলার দিকে চেয়ে বললেন, যদি কাউকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চান, কোন অসুবিধা নেই। আমার গাড়ি প্রায় খালিই যায়।

ডিরেক্টর আর দাঁড়ালেন না। মোটা খাতাটায় টোকা দিতে দিতে নেমে গেলেন।

ডিরেক্টর চলে যাবার অনেকক্ষণ পর গৌরী কথা বলল, দেখি কর্তাকে বলে কাল যদি অফিস কামাই করতে পারে। আপনিও যাচ্ছেন তো দিদি?

আমি? লীলা আভাসে বুঝতে পারল তার দুটি গাল লাল হয়ে উঠেছে।

হ্যাঁ, শুনলেন না ডিরেক্টর বললেন, আর কেউ গেলে কোন অসুবিধা নেই। আপনার মতন লোকেরই সেখানে যাওয়া সাজে দিদি। অপ্সরাদের রাজত্ব। আমাদের মতন কালপেঁচাদের সেখানে যাওয়াই উচিত নয়।

লীলা আর কথা বাড়াল না। গৌরীর সঙ্গে তার ঘরে এসে ঢুকল।

একথা সেকথার পর গৌরী আবার সিনেমার কথা পাড়ল। বেশ আছে ভাই এরা, না?

কথাটা লীলা ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। জিজ্ঞাসা করল, কারা?

এই সিনেমাতে যারা অভিনয় করে। এই তো রেবা দেবী আসেন।

প্রায়ই দেখি। যতটুকু থাকেন, কেবল হাসি, গান। রোজই পরনে জমকালো শাড়ি, নতুন নতুন ডিজাইনের গয়না। দুঃখকষ্টের বালাই নেই।

তা কি বলা যায়? লীলার মুখ থেকে আচমকা বেরিয়ে গেল।

গৌরী মুখ তুলল। কেমন ধরা গলা লীলার। দু চোখে বেদনার ছায়া।

লীলাই শুরু করল আবার, সব কিছু হারিয়ে তবে মেয়েরা এ পথে নামে। জীবনের সব রঙ খুইয়ে তবে গালে মুখে ধারকরা রঙ মাখে। নতুন শাড়ি আর হালফ্যাশানের গয়না তো শুধু বুকের আগুন চাপা দেবার চেষ্টা।

কিছুক্ষণ গৌরী কোন কথা বলল না। চেয়ে চেয়ে লীলাকে দেখল। এত অল্পদিনের পরিচয়ে অবশ্য মানুষ চিনতে পারার কথা নয়। কিন্তু লীলাকে যেন কেমন লাগে। এত রূপ, এত লাবণ্য, কিন্তু প্রাণের উচ্ছলতা নেই। এই বয়সেই জীবনে একটা নিস্পৃহ ভাব, নিরাসক্ত মন।

আজকাল ভদ্রঘরের অনেক মেয়ে কিন্তু এ লাইনে আসে দিদি। বড় বড় ঘরের বৌ।

তাদের কথাই বলছি। মেয়েছেলেরা শেষদিন পর্যন্ত স্বামী আর সংসার আঁকড়ে থাকতে চায়। খুব বড়ো আঘাত না পেলে এ সব ছেড়ে তারা বন্যার জলে গা ভাসায় না।

হঠাৎ সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হতেই লীলা থেমে গেল। গৌরী উঠে জানলার কাছে দাঁড়াল।

চাতালে এসে দাঁড়াতেই দেখা গেল। শাড়ি লাল, ব্লাউজ লাল, জুতোটি পর্যন্ত লাল টুকটুকে। হাতের লাল স্যাচেলটা ঘোরাতে ঘোরাতে সরু গলায় ঝঙ্কার তুলল, যা বাবা, দশ মিনিট দেরি হয়েছে আসতে, অমনি মানুষটা উধাও।

কথা শেষ করে মুখ তুলতেই রেবাদেবীর সঙ্গে গৌরীর চোখাচোখি হল।

হাতের ব্যাগটা ঘোরাতে ঘোরাতে রেবাদেবী জানলার কাছে এসে দাঁড়াল, আচ্ছা মিস্টার সিনহা বেরিয়ে গেছেন বোধ হয়, না?

উত্তর দিতে গৌরীর একটু দেরি হল। প্রশ্নটা ভাল করে কানেই যায় নি। ঠিক এমনি দাঁড়ানোর ভঙ্গী। কথা বলার ঢং প্রায় এই রকম। 'ভুলের বালুচরে'র নায়িকার ভূমিকায়। তা ছাড়া, মিস্টার সিনহা আবার কে?

প্রশ্নটা রেবাদেবী আবার করল।

মিস্টার সিনহা কি স্টুডিয়োতে বেরিয়ে গেছেন?

স্টুডিয়োতে? ও ডিরেক্টরের কথা বলছে রেবাদেবী। ডিরেক্টরের যে আর একটা নাম থাকতে পারে, একথা গৌরীর মনেই ছিল না। থতমত খেয়ে বলল, ডিরেক্টার, ও হ্যাঁ তিনি এই একটু আগে বেরিয়ে গেলেন।

অদ্ভুত মানুষ। সেই দুটোয় শুটিং শুরু, সাত তাড়াতাড়ি যাবার কি দরকার।

রেবাদেবী জুতোর হিল দুটো তালে তালে মেঝের ওপর ঠুকল, তারপর গৌরীর দিকে ফিরে বলল, হোটেলের ছোকরা চাকরটার কি যেন নাম? একটু ডেকে দিন না। জল খাব এক গ্লাস। কোনোরকমে খাওয়া সেরেই ছুটে আসছি। জলতেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ।

এমন একটা সুযোগ গৌরী কিছুতেই ছাড়ল না। হেসে বলল, জল খাবেন একগ্লাস্ তার জন্য ছোকরা চাকরকে ডাকার কি দরকার। আসুন না ভিতরে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে গৌরী হাত দিয়ে চিকটা সরিয়ে দিল। দরজাটা খোলাই ছিল, তবু গৌরী আরো ঠেলে দিল। রেবাদেবীর আসতে অসুবিধা না হয়।

দরজার পাশে রাখা চেয়ারে রেবাদেবী বসল। কিন্তু অল্পক্ষণের জন্য। তারপরই দাঁড়িয়ে উঠে দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলো দেখতে লাগল। তাও বেশীক্ষণের জন্য নয়, দু-একটা দেখেই ফিরে এল চেয়ারে। একেবারে লীলার মুখোমুখি।

লীলা মাথা নিচু করে নিজের শাড়ির পাড় পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত। পুরনো শাড়ি, পাড়ের নক্সার এমন কিছু নূতনত্ব নেই, কিন্তু তবু লীলার দেখা যেন আর শেষ হতে চায় না। মনে মনে গৌরীর ওপর বিরক্ত হল। আদর করে নিজের কামরায় ডাকবার কি দরকার। তা ছাড়া একগ্লাস জল আনতে এত দেরি!

আপনি এই হোটেলেই থাকেন বুঝি?

আচমকা প্রশ্নে লীলা বিব্রত হয়ে উঠল। অনুভবে বুঝতে পারল আঙুলের ডগাগুলো কাঁপছে। শাড়িটা মুঠো করে মুখ তুলল। মুখে কোন কথা নয়, শুধু ঘাড় নাড়ল।

আপনাকে দেখেছি দু-একদিন। রেবাদেবী আবার উঠে দাঁড়াল। দু-এক পা এগিয়ে এল লীলার দিকে, বলল, সত্যি হিংসা হয় আপনাকে। কি রূপ!

এমন রূপ থাকলে আমরা কি আর ছাইভস্ম মাখতে যাই।

শুধু আঙুলের ডগাগুলোই নয়, লীলার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। গরম নিশ্বাসের হলকা।

রূপ, রূপ, রূপ। এ ছাড়া লোকের আর কিছুই বুঝি বলবার নেই। রূপের আলোই দেখছে সবাই, তার দাহটুকু বুঝি সকলের নজর এড়িয়ে গেল। দীপ্তিটুকু সকলের, দাহটুকু শুধু লীলার একান্ত নিজস্ব। পুড়ে পুড়ে ছাই হচ্ছে সে আগুনে। অস্থি মজ্জা মেদ পঞ্জর সব কিছু বিবর্ণ, পাণ্ডুর হয়ে যাচ্ছে তিলে তিলে।

আর তা ছাড়া, এ রূপের আলোয় যাঁকে আরতি করার কথা, যাঁর পায়ের তলায় নিবেদিত করার কথা নিজেকে, তিনি সরে রইলেন দূরে—অবজ্ঞায়, উপেক্ষায়, নিস্পৃহতায় দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ব্যবধান সৃষ্টি করে।

শুধু রূপই আছে লীলার, মাদকতা নেই। তা না হলে শেখরনাথ এমন করে কখনই দূরে থাকতে পারতেন না। কি আছে বাইজির। ছলা, কলা, বিলোল কটাক্ষ। ধারকরা রঙে নিজেকে মোহিনী করে তোলার প্রয়াস, পরের মানুষকে ছিনিয়ে নেবার অপচেষ্টা। এত রূপ, এত লাবণ্য, এত যৌবন, সব নিয়েও তো লীলা নিঃস্ব, সর্বহারা।

গৌরী এসে দাঁড়াল। শুধু জলের গ্লাস নয়, এক হাতে রেকাবিতে দুটি বড় সাইজের সন্দেশ। এই জন্যই এত দেরি।

রেকাবি দেখেই রেবাদেবী লাফিয়ে উঠল, সর্বনাশ, একি করেছেন? মাপ করবেন, কিছু খাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। বললাম যে একটু আগে আমি খেয়ে আসছি।

কেন আর লজ্জা দিচ্ছেন? গৌরী আপত্তি করল, কিই বা আপনাকে দিয়েছি। নিন চট করে মুখে তুলে দিন। একটু থেমে কথাটা হঠাৎ মনে পড়াতে গৌরী আবার বলল, সেই যেমন করে 'রাঙা মেঘ' বইয়েতে টপাটপ মুখে পুরেছিলেন।

রাঙা মেঘ? রেবাদেবী একটু ভাবল, তারপর বোধ হয় দৃশ্যটা মনে পড়তে খিলখিল করে হেসে উঠল।

সে কিন্তু আলাদা ব্যাপার। সেখানে মিষ্টির থালা এগিয়ে দিচ্ছেন আমার প্রেমিক, সেটা মনে আছে তো?

তারপর গলাটা একটু নিচু করে রেবাদেবী বলল, এই একটা নিচ্ছি ভাই, আর পারব না।

আলগোছে একটা সন্দেশ তুলে মুখে ফেলে দিয়ে রেবাদেবী জলের গ্লাস হাতে নিল।

রঙীন রুমালে মুখ মুছে বেরিয়ে যাবার সময় গৌরীর দিকে চেয়ে বলল, চলি ভাই।

চৌকাঠ বরাবর গিয়ে রেবাদেবী ফিরে দাঁড়াল। চোখ ফেরাল লীলার দিকে, চলি, আপনি তো আর কথাই বললেন না। ভাগ্য আমার।

সিঁড়িতে উঁচু হিলের শব্দ মিলিয়ে যাবার পর গৌরীর চেতনা হল।

বেশ মেয়েটি, না দিদি?

লীলা কোন মত প্রকাশ করল না। ম্লান হাসল শুধু।

আচ্ছা, এদের দেখলে কি মনে হয় যে সব হারিয়ে, সংসার জ্বালিয়ে এরা এ পথে নেমেছে? পিছন দিকে চাইবার মতন এদের কিছু নেই।

উত্তরটা লীলার ঠোঁটের কাছে এল। খুব সাবধানে কথাটা চেপে গেল। চেপে রইল দুটো ঠোঁট। দুর্বলতার সুযোগে কোন রকমে না বেরিয়ে পড়ে। অসতর্ক মুহূর্তে জানাজানি না হয়ে যায়।

লীলাকে দেখলেই কি বোঝা যায়, স্বামী ছেড়ে, সংসার ছেড়ে, পালিয়ে এসেছে শহরে? অবশ্য স্বেচ্ছায় আসে নি, এ ছাড়া ওর আর কোন পথও ছিল না। স্বামী অপরের কুক্ষিগত, শয়তানের কালো হাত এগিয়ে আসছিল ওর দিকে, একটু দেরি হলেই নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে শ্বাস রুদ্ধ হত লীলার। হয়তো সতীর মতনই নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হত।

কথা বলছেন না যে দিদি? গৌরী অনুযোগ করল। আনমনা ভাবটা লীলা কাটিয়ে উঠল। আস্তে বলল, এদের কথা ভাবছি।

কি ভাবছেন?

ধূপ যেমন নিজে পুড়ে পরকে গন্ধ বিলোয়, এরাও সেই জাতের। নিজের দুঃখকষ্ট সব চেপে পরের মুখে হাসি ফোটায়, আনন্দ দেয়।

ঠিক বলেছেন দিদি। চমৎকার উপমা। গৌরী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপর এক সময়ে গৌরীই বলল, উনি বাড়ি এলে আজ কথাটা পেড়ে রাখতে হবে। যা ভুলো মন। কাল অফিস কামাই করে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। আপনি যাবেন তো দিদি?

দেখি, লীলা ইতস্তত করল, খুকীর জন্যই মুশকিল।

মুশকিল আর কি! হীরু তো রয়েইছে, ওর কাছে থাকবে। কতক্ষণের আর মামলা। ঘণ্টা তিন-চারের মধ্যেই আমরা ফিরে আসব।

ঘণ্টা তিন-চার ?

যেতে আসতেই তো প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় নেবে।

লীলা আর কিছু বলল না। এমন একঘেয়ে জীবন আর ভালও লাগছে না। সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে পরের দিন আবর্তিত হচ্ছে একই ছন্দে। ঠুলিপরা ঘোড়ার মতন বাঁধা শড়ক ধরে অবিরাম যাত্রা। বিরতি নেই, বিশ্রাম নয়।

সঙ্গে গৌরী থাকবে, গৌরীর স্বামী। অসুবিধা কিসের!

•

সকাল থেকে গৌরীর তাড়ার অন্ত নেই। বার তিন-চার লীলাকে মনে করিয়ে দিল। ঠিক সময় তৈরী থাকতে হবে। বহু কষ্টে গৌরীর স্বামীকে রাজী করান হয়েছে। এই সময় তার পক্ষে নাকি অফিস কামাই করাই মুশকিল।

বেলা বারটায় রওনা হবার কথা, কিন্তু গৌরী এগারোটার মধ্যেই সেজে গুজে তৈরী।

ওপরে এসে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দেখল, লীলা মেয়েকে কোলের কাছে নিয়ে শুয়ে রয়েছে চুপচাপ।

আপনার এখনও হয় নি দিদি ? আর সময় বেশী নেই হাতে ?

একটু আগে লীলা গির্জার ঘড়ি দেখে শুয়েছে। শুয়ে শুয়েও ঘড়ির কাঁটা নজরে আসে। সবে এগারটা পাঁচ। এখনও অঢেল সময়।

মাথাটা একটু তুলে লীলা গৌরীর সাজপোশাক দেখল। হেসে বলল, ব্যাপার কি! সাজের ঘটা দেখে মনে হচ্ছে আপনারই যেন সুটিং আছে ?

গৌরী লজ্জায় কুঁকড়ে গেল। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, কি যে বলেন দিদি, তার ঠিক নেই। একে তো এই চেহারা, এর ওপর আটপৌরে পোশাক পরে গেলে ঝি মনে করে হয়তো ঢুকতেই দেবে না। নিন উঠুন।

লীলা উঠল।

শাড়ি আগে থেকেই বের করে রেখেছিল। শাদা জমি, কমলা-পাড়। খয়েরী ব্লাউজ। সাজগোছ সারতে মিনিট কুড়ি। আয়নার সামনে থেকে সরে এসেই লীলা হেসে ফেলল। গৌরী এক দৃষ্টে তার দিকে চেয়ে রয়েছে। দু চোখে বিস্ময়ের ছিটে।

কি হল?

এমন কিছু সাজগোজ করেন নি দিদি। আটপৌরে পোশাক, তাতেই রূপ যেন ফেটে পড়ছে। এমন সোনার প্রতিমাকে ফেলে খুকুর বাপ কি করে বিদেশে আছেন তাই ভাবছি। আমি হলে একটি দিনের জন্যও ছেড়ে থাকতাম না।

শুধু দুটো চোখেই জল ভরে এল না, গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল জলের ধারা। সমস্ত প্রসাধন নষ্ট।

গৌরী অপ্রস্তুত হয়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে লীলার কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বলল, কিছু মনে করবেন না দিদি। আমি হঠাৎ কথাটা বলে ফেলেছি।

আঁচল দিয়ে লীলা দুটো চোখ মুছে নিল। গালের ওপর গড়িয়ে পড়া জলের ধারাও।

এত সব কথা চিন্তা করার অবসর কোথায় শেখরনাথের। বাইজির বীণার ঝঙ্কার আর সুরা-পাত্রের উচ্ছল মদিরা তরঙ্গে ভেসে যাওয়া জীবন। ছোট-খাটো দুঃখ, ছোটখাটো বেদনার অবকাশ নেই। নিভৃতে কোথায় কার হৃদয় গুঁড়িয়ে চূর্ণ হয়ে গেল সেদিকে চোখ ফেরাতে গেলে শেখরনাথের চলে না।

নিজেকে সামলে নিয়ে লীলা উঠে দাঁড়াল।

চলুন।

দুজনে নিচে নেমে দেখল ডিরেক্টর তৈরী। গৌরীর স্বামী হেমন্তবাবুও পায়চারি করছেন ঘরের সামনে।

ডিরেক্টর গৌরীর দিকে ফিরে বললেন, হাতে আর সময় নেই। নেমে পড়ুন।

গৌরী ক্ষিপ্রহাতে তালাটা লাগিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। লীলার পিছন পিছন।

বিরাট গাড়ি। ডিরেক্টর আর হেমন্তবাবু বসলেন পাশাপাশি। পিছনের সীটে লীলা আর গৌরী।

যেতে যেতেই ডিরেক্টর ব্যাপারটা ভাঙলেন। আউটডোর স্যুটিং। দক্ষিণেশ্বর গঙ্গার ধারে নায়িকা আত্মহত্যা করতে যাবে গঙ্গার জলে, টিউশনি সেরে সে পথে ফেরার সময় ব্যাপারটা নায়কের চোখে পড়ে যাবে। নায়িকা ঝাঁপিয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে নাটকীয়ভাবে নায়কের আবির্ভাব। আজকের দৃশ্যগ্রহণ এইটুকু।

আধঘণ্টার মধ্যেই গাড়ি দক্ষিণেশ্বর পৌঁছল। আরো দুটি গাড়ি গঙ্গার কোল ঘেঁষে। এদিকে ওদিকে ছড়ানো ছিটানো ভাবে আরও কিছু লোক। রাস্তার ওপারে জনারণ্য। কোথা থেকে ঠিক খবর যোগাড় করে পাড়া ঝেঁটিয়ে এসেছে।

গাড়ি থেকে লীলা আর গৌরী নামতেই গুঞ্জন শুরু হল। মৌচাকে ঢিল। এদের দুজনকেও বোধ হয় অভিনেত্রী বলেই ধরে নিল লোকেরা।

ঝাঁকড়া আমগাছের নিচে সারি সারি ফোল্ডিং চেয়ার। লীলা আর গৌরী পাশাপাশি বসল। পিছনের চেয়ারে হেমন্তবাবু।

ডিরেক্টর এগিয়ে গেলেন ক্যামেরাম্যানের কাছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরামর্শ হল। এদিক ওদিক স্থান নির্বাচন। সাউণ্ড ট্রাকের কাছে গিয়েও কিছুক্ষণ আলাপ করলেন।

বাহুমূলে চাপ পড়তেই লীলা গৌরীর দিকে ফিরে চাইল। কি ব্যাপার? গৌরী মুখে কিছু বলল না। আঙুল দিয়ে সামনে দেখাল। ঠিক দেবদারু গাছের নীচে মলিন শতছিন্ন পোশাকে একটি মেয়ে। আলুলায়িত রুক্ষ কেশ, দারিদ্র্যজর্জর মুখশ্রী, উদাসদৃষ্টি দুটি চোখের। চুপচাপ দাঁড়িয়ে গাছে হেলান দিয়ে।

লীলার কানের কাছে মুখ নিয়ে গৌরী ফিসফাস করে বলল, চিনতে পারলেন দিদি?

লীলা ঘাড় নাড়ল। না, চেনা মেয়ে নয়, চিনবে কেমন করে। কিন্তু তবু মনে হল কোথায় যেন দেখেছে।

চাপা গলায় গৌরী আবার বলল, রেবাদেবী।

রেবাদেবী! কালকের সুবেশা, রঙে, প্রসাধনে উজ্জ্বল মেয়েটির একি অবস্থা! লীলার মতন ওর জীবনেও বুঝি বিপর্যয় এল। এক রাতের বেগম সাজার শেষ। ঝলমলে চোখধাঁধানো জীবনের ইতি। তারপরেই লীলার কথাটা মনে পড়ে গেল। এতো শুধু ছদ্মবেশ। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। দারিদ্র্যের পীড়নে বেরিয়ে পড়েছে বাড়ি ছেড়ে। গঙ্গার অতল জলে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। দুঃখ-বেদনা-জ্বালার অবসান।

কথাটা মনে হতেই লীলা চমকে উঠে বসল। না না, এ শুধু অভিনয়। মানুষের কোমল প্রবৃত্তিকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। সত্যের ছলনা।

যাক আপনারা এসেছেন। মিস্টার সিনহা বলেছিলেন আপনাদের কথা।

রেবাদেবী সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দু হাত জোড় করে।

গৌরীই উত্তর দিল, হ্যাঁ। কিন্তু একি পোশাক আপনার। চেনাই দায়।

রেবাদেবী মুচকি হেসে পাশের চেয়ারে বসল। দু হাত দিয়ে কপালের ওপর এসে-পড়া চুলগুলো সরাতে সরাতে বলল, আমাদের নিজস্ব কোন পোশাক নেই। আজ বেগম, কাল বাঁদী। ডিরেক্টররা যেভাবে নাচান, সে ভাবে নাচি।

শুধু কি অভিনেত্রীদের বেলাতেই এটা প্রযোজ্য, সাধারণ মানুষের বেলায় নয়? লীলারই কি নিজস্ব পোশাক আছে কোন? কাল মহার্ঘ অলঙ্কারে মোড়া, বহুমূল্য পরিচ্ছদে বিভুষিতা মল্লিক-বাড়ির অসূর্যম্পশ্যা-অন্তঃপুরচারিণী, আর আজ জনতার হাজার দৃষ্টির সামনে আটপৌরে পোশাকে সামান্য মধ্যবিত্ত বধূ। কোন ডিরেক্টরের অদৃশ্য অঙ্গুলি-সংকেতে এ ভাবে নেচে চলেছে লীলা? স্থান থেকে স্থানান্তরে, ভিন্নরূপে, বিভিন্ন পরিবেশে?

রেবা! ডিরেক্টরের ভরাট গলার শব্দ।

রেবাদেবী চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে গেল।

তারপর স্যুটিং শুরু। প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে চলল। সকলেই খুব ব্যস্ত। ওরই ফাঁকে চা আর সিঙাড়া পরিবেশন করা হল। রেবাদেবী একবার ফিরে এসে দাঁড়াল ওদের কাছে।

কেমন দেখছেন?

খুব ভাল। চমৎকার। গৌরীর আনন্দ গলার স্বরে উপচে পড়ল।

কই, আপনি তো কিছু বলছেন না? রেবাদেবী লীলার দিকে ফিরল।

আমি, আমি। লীলা আমতা আমতা করল, আমি আর কি বলব। ভালই তো হচ্ছে। বেশ ভাল।

ডাক পড়তে রেবাদেবী আবার ফিরে গেল।

সব শেষ হতে বেলা গড়িয়ে পড়ল। ডিরেক্টর হেমন্তবাবুর সামনে এসে দাঁড়ালেন, আপনারা চলে যান, আমি একটু অন্যদিকে যাব। রেবা, তুমিও যাও না এঁদের সঙ্গে।

কথার মাঝখানেই রেবাদেবী এসে দাঁড়িয়েছিল। অপরিচ্ছন্ন পোশাকের বদলে ভাল শাড়ি-জামা অঙ্গে। দারিদ্র্য-নিপীড়িত দুঃখকাতর চেহারা আর নেই। স্নো পাউডার রুজ লিপস্টিকে চেহারা পালটে ফেলেছে।

হ্যাঁ, আমি একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি যাব। মাথাটা বড্ড ধরেছে।

এবারে ড্রাইভারের পাশে হেমন্তবাবু। পিছনে তিনজন। রেবাদেবী, গৌরী আর লীলা।

গৌরীর প্রশ্নের অন্ত নেই। খুঁটিনাটি জীবনযাত্রার সব কিছু সে জানতে চায়। বর্তমান জীবনই শুধু নয়, ফেলে-আসা জীবনের রহস্যও।

রেবাদেবী সিটের পিছন দিকে হেলান দিয়ে এক সময় বলল, যাই বলুন, পয়সা কিছু পাই বটে আর হৈ চৈ করে জীবনটা কাটিয়ে দিই, কিন্তু গলায় আঁচল দিয়ে তুলসীতলায় প্রণাম করা জীবনেই ফিরে যেতে চাই। নিজের লোকদের জড়িয়ে জীবনযাত্রার সে মাধুর্য এখানে কোথায় পাব। এ-তো জীবন নয়, জীবিকা।

চুপচাপ লীলা সমস্ত শুনছিল। একটি কথাও এতক্ষণ বলে নি। হঠাৎ রেবাদেবীর কথাটা কানে যেতেই চমকে সোজা হয়ে বসল। আচমকা মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে পড়ল, তবে সাধ করে নামলেন কেন এ জীবনে?

রেবাদেবী কিছুক্ষণ কোন উত্তর দিল না। বোধ হয় কথাগুলো ভাবল মনে মনে। কতটুকু বলবে, আর কতটুকু বলবে না, মনে মনে ঠিক করে নিল, তারপর খুব ধীর গলায় বলল, এ পথে সাধ করে খুব বেশী লোক আসে না, বিশেষ করে মেয়েছেলে। আমাদের সব দরজা বন্ধ হয়ে গেলে তবেই আমরা রোজগারের এই খিড়কি পথে এসে দাঁড়াই।

বাইরে পথে ঘাটে আলো জ্বলে উঠেছে। মোটরের ভিতরটা আবছা অন্ধকার। ভাল করে কারুর মুখ দেখার উপায় নেই। লীলা একটু ঝুঁকে রেবাদেবীর মুখ দেখবার চেষ্টা করল। কিন্তু অস্পষ্ট মুখের কাঠামো ছাড়া আর কিছু নজরে এল না।

যে রেবাদেবীকে লীলা চেনে, দেখেছে কদিন, এ কথাগুলো যেন তার মুখের নয়। ভাগ্য-বিড়ম্বিতা কোন অসহায় নারীর স্বীকারোক্তি।

দিন পনের পর।

বিকালের দিকে ঘরে বসে লীলা সেলাই করছিল। খুকুর ফ্রক আর নিজের কয়েকটা শাড়ি। বেশ কয়েক জায়গা ফেঁসে গেছে। সময় থাকতে সেলাই

করে রাখাই ভাল। এমনি আটপৌরে শাড়ি কম, কিন্তু দিনরাত বেশী দামী শাড়ি পরে ঘোরাফেরা করতেও কেমন লজ্জা করে।

দরজায় ঠুকঠুক শব্দ। খুব আস্তে।

সকাল থেকে গৌরীর সঙ্গে দেখা হয় নি। ভোর ভোর স্বামী-স্ত্রীতে বেরিয়ে গেছে। নতুন বাড়ি শুরু হয়েছে। সারাদিন সেখানে থাকবে। খাবার বন্দোবস্তও বাইরে।

এতক্ষণে বোধ হয় গৌরী ফিরে এল।

আসুন, আসুন, আপনাকে আর কড়া নেড়ে ঢুকতে হবে না।

জুতোর শব্দ হতেই লীলা পিছন ফিরে দেখে অবাক।

গৌরী নয়, ডিরেক্টর চৌকাঠের এপাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

আপনি! গায়ে মাথায় কাপড় ঠিক করে লীলা উঠে দাঁড়াল।

চুপচাপ বসেছিলাম। ছুটির দিন, কোন কাজকর্ম নেই, ভাবলাম আপনার সঙ্গে গল্প করে আসি একটু। বিরক্ত হলেন নাকি?

না, না, বিরক্ত কিসের! লীলা মাথায় ঘোমটা টেনে দিতে দিতে বলল। এমনভাবে ঘরের মধ্যে মানুষ এসে দাঁড়ালে, তাকে কিই বা বলা যায়! আয়নার সামনে রাখা চেয়ারটা এগিয়ে দিল ঘরের মাঝখানে।

খাটের ওপর থেকে শাড়ি আর ফ্রকগুলো সরিয়ে ফেলল। অবশ্য শতচ্ছিন্ন পরিধেয়গুলো সরিয়ে ফেললেই কি নিজের দুঃখ-জীর্ণ জীবনকেও আড়াল করা যায়?

সেদিন কেমন লাগল বলুন? ডিরেক্টর চেয়ার জাঁকিয়ে বসলেন।

ভালই তো, বেশ ভাল। খাটের এক কোণে বসতে বসতে লীলা থেমে থেমে বলল।

কিন্তু এসব কথা ওর কাছে কেন! চিত্রশিল্পের ভালমন্দ সম্বন্ধে ওর কি জ্ঞান আছে। কতটুকু। না, আলাপ জমাবার এটুকু বুঝি ভূমিকা!

জানেন, তবু মন ভরে না। ডিরেক্টর খেদোক্তি করলেন, এত খাটি এর পিছনে, উদয়াস্ত পরিশ্রম, কিন্তু তবু যা চাই তা ঠিক পাই না।

লীলার মুখে আবিরের ছিটে, ভয়-থমথম দুটি চোখ।

এরা যেন প্রাণহীন, যেটুকু শেখাই, সেটুকুই বলে। বাড়তি কিছু এদের কাছে আশা করা অন্যায়। রেবাকে আমি খুঁজে বের করেছি, প্রায় আঁস্তাকুড়

থেকেই। শিখিয়ে পড়িয়ে দাঁড় করাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু গা থেকে ভাল করে পাঁকের গন্ধ ঘোচে নি। চিত্রশিল্প মানুষের হাসি-কান্না ধরে রাখবার ফটোগ্রাফ নয়, তার চেয়ে বলিষ্ঠ আরো কিছু। সমাজের পাঁক আহরণ করেছি. পঙ্কজ ফোটাব বলেই। এর জন্য যদি দরকার হয়, মানুষের দোরে দোরে আমি ঘুরব, শিল্পী সংগ্রহ করব, কাহিনী সংগ্রহ করব, জীবন সংগ্রহ করব।

এতক্ষণে কথা বলল লীলা। জোর আনল মনে। মুখ তুলে একটু চড়া গলায় বলল, আমি তো এ-সবের কিছুই বুঝি না। আমাকে এসব বলা শুধু আপনার পণ্ডশ্রম।

ডিরেক্টর ঘাড় নাড়লেন, পণ্ডশ্রম নয় লীলাদেবী, আমি লোক চিনি। লীলাদেবী! চমকে উঠল লীলা। পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে তুহিন স্রোত। স্নায়ুতন্ত্রী ঝিম ঝিম করে উঠল অজানা আতঙ্কে। নামটাও সংগ্রহ করেছেন ডিরেক্টর। রেবাদেবী আর লীলাদেবীতে কোন প্রভেদ রাখতে চান না।

আপনি হয়তো জানেন না আপনার মধ্যে কত বড় একটা আর্টিস্ট লুকিয়ে আছে। আপনি হোটেলে আসার পর থেকেই আপনাকে আমি লক্ষ্য করেছি। আপনার চলা, দাঁড়ানো, কথার ভঙ্গী কিছুই আমার নজর এড়ায় নি। আপনার মতন মহিলারাই পারেন চিত্রশিল্পকে মহিমান্বিত করতে।

লীলা উঠে দাঁড়াল। আশা করেছিল ডিরেক্টরও এবার উঠে দাঁড়াবেন। বক্তব্য শেষ। তাঁর মনের কথা তো বলা হয়ে গিয়েছে, এবার নিচে নেমে গেলেই পারেন।

কিন্তু ডিরেক্টর বাইরে জানলার দিকে চোখ ফিরিয়ে ছিলেন। সে অবস্থাতেই বললেন, শুনেছিলাম আপনার স্বামী বিদেশে, তাঁর আসার অপেক্ষাতেই ছিলাম, কিন্তু বোধ হয় এখন শীঘ্র তিনি ফিরবেন না, কি বলেন?

এবার ডিরেক্টর লীলার দিকে মুখ ফেরালেন। আঁচলের খুঁটটা আঙুলে জড়াল লীলা। কাঁপছে গলার স্বর। নিমেষে সামলে নিয়ে সংযত কণ্ঠে বলল, আপনি গোড়াতেই একটু ভুল করেছেন। তিনি ফিরে এলেও এ পথে আমাকে নামতে দিতেন না, তা ছাড়া আমার নিজেরও কোন আগ্রহ নেই।

ডিরেক্টর উঠে দাঁড়ালেন। চেয়ারের হাতলে হাত রেখে বললেন, এ পথ

সম্বন্ধে আপনার নিজের কি ধারণা জানি না। এ লাইনে অনেক বড় ঘরের বৌঝিরাও আসবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। গাদা গাদা চিঠি রয়েছে আমার কাছে। আজ সকালেও মিসেস রাহা এসেছিলেন। ব্যারিষ্টার রাহার স্ত্রী। যে কোন ছোটখাটো পার্ট একটা করতে চান। সিভিলিয়ান অরুণ বসাকের স্ত্রী তো টেলিফোন করে করে অতিষ্ঠ করে তুলেছেন আমাকে। জানি এদের কৌলীন্য আছে, অর্থের সমারোহও কম নয় কিন্তু শুধু স্বর্ণসীতা প্রতিষ্ঠা করে তো লাভ নেই তাতে যদি প্রাণের স্পর্শই না রইল।

কথা শেষ হবার আগেই লীলা দু-এক পা এগিয়ে গেল দেয়ালের দিকে। আলনা থেকে তোয়ালেটা কাঁধে ফেলে বলল, আচ্ছা আসুন।

ইঙ্গিতটা বুঝতে ডিরেক্টরের দেরি হল না। যেতে যেতে পর্দা সরিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন, আপনাকে অযথা বিরক্ত করে গেলাম, কিছু মনে করবেন না। বুঝতেই পারছেন, এ আমার ধ্যান, জ্ঞান, আমার সাধনা। তবে একটা কথা বলে যাচ্ছি, কোনদিন যদি এ বিষয়ে ভেবে কিছু ঠিক করেন, নিঃসঙ্কোচে আমাকে জানাবেন।

ডিরেক্টর চলে যেতেই লীলা বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। বারবার খণ্ড খণ্ড আঘাতের চেয়েও বিরাট একটা আঘাত আসুক। নিশ্চিহ্ন করে দিক। এ অপমান, এ গ্লানির অবসান হোক। মর্যাদার আবরণ খসে পড়েছে, আভিজাত্যের বোরখার চিহ্নটুকুও নেই, তাই আজ সকলে হাত প্রসারিত করে স্পর্শ করার চেষ্টা করছে।

আসল পরিচয় পেলে হয়তো আশপাশের লোকেরা আরো উদ্দাম হয়ে উঠবে। আরো নির্ভয়। ভরতপুরের ছোট হুজুর, শেখরনাথের এ পরিচয় তো কবে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার, আজ যে পরিচয় জ্বলজ্বল করছে চোখের সামনে, সেটা হচ্ছে এক বাইজির আশ্রিত জীব, মদ্যপ, পরান্নপুষ্ট বিবেকহীন পুরুষ। তেমন একটা মানুষের ঘরণীর আবার আভিজাত্যবোধ, সম্মানের বালাই!

দিদি। বাইরে থেকে গৌরীর আওয়াজ শোনা গেল। ঘর অন্ধকার। অবেলায় শুয়ে রয়েছেন যে? শরীর খারাপ নাকি?

ততক্ষণে লীলা উঠে বসেছে বিছানার ওপর। আঁচলের কোণ দিয়ে রগড়ে মুছে ফেলেছে চোখের জল।

না, শরীর ঠিক আছে। হাত বাড়িয়ে বাতিটা জ্বেলে দিন না ভাই।

গৌরী আলো জ্বালিয়ে দিল। একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখল লীলার দিকে। থমথম করছে মুখ। কি ব্যাপার!

গৌরী লীলার পাশে এসে বসল, কি হয়েছে দিদি। মুখচোখের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে খুব খানিকটে যেন কেঁদেছেন।

লীলা ধরা গলায় বলল, মনটা ভাল নেই ভাই। অনেকদিন ওঁর চিঠিপত্র আসে নি। কোন খবর পাই নি।

তাই বুঝি? গৌরী আরো ঘন হয়ে বসল। এমন একটা কথা ওরও মনে এসেছে। নীচের বোর্ডে অনেকের চিঠি থাকে, নিজের চিঠি নিতে যাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে অনেকদিন গৌরী চোখ বুলিয়েছে অন্য চিঠির ওপর। লীলার চিঠি দেখে নি। অবশ্য, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। হয়তো হীরু পোষ্টঅফিস থেকে সোজা চিঠি নিয়ে আসে। কিন্তু চিঠি আসা না আসার কথা কোনদিন কিছু শোনে নি লীলার মুখে।

একটা কাজ করুন দিদি।

কি?

ঠিকানাটা আমায় দিন, ওঁকে দিয়ে না হয় একটা টেলিগ্রামই করে দিই।

অন্যদিকে লীলা মুখ ফেরাল। ধরা না পড়ে যায়। কেঁচোর বদলে প্রসারিত-ফণা ভুজঙ্গের না সাক্ষাৎ মেলে। স্বামীর চিঠি না পাওয়ার কথাটা হঠাৎই বেরিয়ে গিয়েছিল মুখ থেকে।

আজ সকালে হীরুকে দিয়ে আমি একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি।

কথাটা বলতে পেরে লীলা নড়েচড়ে সহজ হয়ে বসল। ফাঁড়া কেটে গেছে। আর বোধ হয় ভয় নেই।

উনি আছেন কোথায়? গৌরী জিজ্ঞাসা করল।

ওঁর তো ঘুরে বেড়ানোর ব্যাপার। এখন আছেন বেনারসে, অন্ততঃ তাইতো ছিলেন দিন পনেরো আগে।

সত্যি দিদি, স্বামী ছেড়ে থাকা বড় বিশ্রী ব্যাপার। আমার অবশ্য কখনও ওঁকে ছেড়ে থাকতে হয় নি। যেখানেই বদলী হয়েছেন, মালপত্রের মতন সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি।

আপনি ভাগ্যবতী। লীলা হাসল। কথা ঘোরাবার চেষ্টায় একেবারে অন্য প্রসঙ্গ পাড়ল। তারপর আজ সমস্ত দিনটা কি করলেন, বলুন? বাড়ি কতদূর?

গৌরী খাটের ওপর পা গুটিয়ে ভাল হয়ে বসল, বাড়ির কাজ খুব তাড়াতাড়ি চলেছে। বলছিল, বর্ষাটা আসার আগে সব শেষ করতে পারলেই ভাল। নয়তো বৃষ্টিবাদলে কাজের বড় অসুবিধা। গৃহপ্রবেশের দিন আপনাকে কিন্তু দিদি সকাল থেকে গিয়ে থাকতে হবে। সব চেয়ে ভাল হয়, সে সময় যদি আপনার কর্তাও এসে পড়েন, দুজনে গিয়ে দাঁড়াবেন শুভ কাজে।

ছোট্ট নিশ্বাস। বুক কাঁপিয়ে। জমাট কান্না কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে গলার কাছে। লীলার মনে হল আর বুঝি পারবে না। বাঁধভাঙা প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মতন সব বাধা, সব নিষেধ ভেঙে কান্নার ঢল নামবে। ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ওকে।

তার চেয়ে আর একটা কাজ করুন, লীলা আস্তে আস্তে বলল, আপনার বাড়ী হয়ে গেলে আমাকে খান দুয়েক ঘর বরং ভাড়া দিন।

আপনাকে ?

হ্যাঁ, ভাই, এ হোটেলে বেশীদিন আমার থাকা চলবে না। আপনাদের ওই ডিরেক্টরের জন্যই এ জায়গা আমাকে ছাড়তে হবে।

ডিরেক্টরের জন্য ? বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। গৌরী বিস্ফারিত করল দুটো চোখ।

একটু আগে এসেছিলেন আমার ঘরে। আমি এ পথে নামতে রাজী কিনা সে কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য।

এতক্ষণে ব্যাপারটা যেন গৌরী বুঝতে পারল, ও, সেইজন্যই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আপনার সম্বন্ধে অত খোঁজ নেন আমাদের কাছে। আপনি কোথা থেকে এসেছেন, সঙ্গে কে আছে, স্বামী ফিরবেন কবে, হোটেলে এসেই বা উঠেছেন কেন, এই সব। একটু দম নিল গৌরী। আঁচল দিয়ে ঠোঁট মুছে জিজ্ঞাসা করল, তা আপনি কি বললেন দিদি ?

এ লাইনে যাবার আমার একটুও আগ্রহ নেই, সেই কথাই বললাম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। এক সময়ে গৌরী উঠে দাঁড়াল, আজ উঠি দিদি। জামাকাপড় না ছেড়েই সোজা ওপরে চলে এসেছি।

॥ বার ॥

বরাত ভাল লীলার। ডিরেক্টর বাইরে গেছেন। মাসখানেকের জন্য। নতুন একটা বইয়ের ব্যাপারে সাঁওতাল পরগণায় আউটডোর সুটিং। লীলা অনেকটা নিশ্চিন্ত। উঠতে নামতে পাশ কাটাতে হবে না। কেউ কড়া নাড়লে ভাল করে জানলার কাচের মধ্যে দিয়ে দেখে তবে সন্তর্পণে দরজা খুলতে হবে না।

গৌরীদের বাড়ি প্রায় শেষ হয়ে আসছে। আর বড় জোর মাসখানেক। পরিহাসছলে লীলা যে কথাটা একদিন গৌরীর কাছে পেড়েছিল, সেদিন গৌরীই সে কথা তুলল।

আর মাসখানেক পরেই কিন্তু হোটেল ছাড়তে হবে দিদি।

আমাকে?

হ্যাঁ, আপনার জন্য যে নিচে দুখানা ঘর ঠিক করে রেখেচি। আলাদা সব বন্দোবস্ত। কোন অসুবিধা নেই।

লীলা মুখ টিপে হাসল, আপনার সঙ্গে এক জায়গায় থাকতে পাব, তাতে না হয় হলই বা একটু অসুবিধা। কিন্তু আপনারা কোথায় নির্জনে নীড় রচনা করছেন, সেখানে আমাদের ভিড় করাটা কি ঠিক হবে?

আহা, কি যে বলেন? গৌরী বলল, ওঁকে বলেছিলাম কথাটা, শুনে তো ভারী খুশী। বললেন, আমাদের বদলীর চাকরি, কখন কোথায় থাকি তার ঠিক নেই। উনি থাকলে তবু ঘরবাড়ি দেখবার একজন লোক থাকবে।

বেশ চালাক লোক তো, লীলা তরল করল কণ্ঠস্বর, নিজেরা ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন আর আমি আপনাদের বাড়ি আগলাব?

সত্যি দিদি, আপনাকে যেতেই হবে। হাজার হোক হোটেল তো, কতদিন থাকা যায় এখানে। নিজের একটা আলাদা রান্নাঘর, নিজের হাতে দুটো সামান্য তরি তরকারি রেঁধে ঘরের মানুষটাকে খাওয়াতে পারার আলাদা আনন্দ, ঠিক কিনা বলুন?

লীলা ঘাড় নাড়ল।

এ হোটেল থেকে সরে ওকে যেতেই হবে। যত শীঘ্র সম্ভব। যখন গৌরীরা থাকবে না, তখনকার অবস্থা কল্পনা করতেও লীলার ভয় হল। হুট হুট করে ডিরেক্টর ঘরে এসে ঢুকবে। সময়ে অসময়ে। চিত্রশিল্পের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে একটানা বক্তৃতা, সমস্ত চিত্রজগৎ লীলাদেবীর মতন মেয়েদের আগমন অপেক্ষায় উন্মুখ তারই আবেগপ্রবণ কাহিনী। মিস্টার সিনহার প্রতিভা আর লীলার রূপের স্পর্শে সিনেমার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আলেখ্য।

সব ভেবেই লীলা গৌরীকে কথা দিল। একতলায় গিয়ে উঠতে তার কোন আপত্তি নেই। অবশ্য ভাড়ার বিনিময়ে।

ওপরে উঠেই লীলা দাঁড়িয়ে পড়ল। খুকুকে নিয়ে হীরু বেড়াতে বেরিয়েছিল, এত তাড়াতাড়ি তো ফিরে আসার কথা নয়।

কি ব্যাপার হীরু ?

আজ্ঞে মা, একটা কথা বলতে এলাম।

সঙ্গে সঙ্গে লীলার বুক কেঁপে উঠল। দ্রুত স্পন্দন। কি আবার কথা ? সর্বনাশের আরো বুঝি কিছু বাকি আছে।

কি কথা হীরু, খারাপ কিছু নয় তো ?

হীরু মাথা চুলকাল। খবর একটা অবশ্য আছে, তবে শুভ কি অশুভ সেটা বলা মুশকিল।

লোচনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল মা। পার্কের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল।

কে লোচন ?

দত্তসায়েবের কারখানায় কাজ করত। আপনাদের প্রজা কৈলাস সামন্তের ছেলে।

তা হবে, এত সব লীলার জানবার কথা নয়। যখন মল্লিক-বাড়ির বৌ হয়ে ঢুকেছে, তখনই প্রায় পড়ন্ত জমিদারি। কোনরকমে ঠাটটুকু শুধু বজায় রাখার চেষ্টা। প্রজাদের কাছ থেকে কর নিংড়ে মহাজনের দেনা শোধ।

লোচন বুঝি ভরতপুরের কোন খবর জানাল ?

হ্যাঁ মা, বলল দত্তসায়েবের কারখানায় খুব গোলমাল সুরু হয়েছে। কে একজন ইঞ্জিনীয়ার রাগের মাথায় এক মজুরকে জুতোশুদ্ধ লাথি মেরেছিল, ব্যস সব মজুর ক্ষেপে উঠেছে। সবাই একজোট হয়ে কলকব্জা ভেঙে তচনচ। দত্ত-

সায়েব ব্যাপার দেখে থামাতে গিয়েছিলেন, ইঁট মেরে তাঁর মোটর ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। দত্তসায়েবের কপালে চোট লেগেছে।

উত্তেজনায় লীলার সমস্ত শরীর দুলে উঠল। ক্ষেপে উঠেছে দত্তসায়েবের কারখানার সমস্ত মজুর। শুধু দত্তসায়েবের বসানো কলকব্জাই নয়, খোদ দত্তসায়েবকেও আঘাত করেছে। পরম পরিতৃপ্তিতে লীলার মন ভরে গেল। ওরা শুধু কারখানার কুলি-মজুরই নয়, ভরতপুরের বাসিন্দা, মল্লিক-বাড়ির পুরনো প্রজা। নতুন মালিকের বিরুদ্ধে হাতিয়ার তুলেছে। যে আঘাত করা উচিত ছিল মল্লিক বংশের কুলপ্রদীপের, অন্তঃপুরের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, বংশের কলঙ্কমোচনের জন্য, সে আঘাত করার ভার নিয়েছে তাঁরই প্রজার দল।

তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে লীলা খাটের ওপর বসল, তারপর হীরুর দিকে ফিরে বলল, বল হীরু, ভরতপুরের খবর ভাল করে শুনি।

লীলার এমন আনন্দোজ্জ্বল মুখ বহুদিন হীরু দেখে নি। অন্ততঃ ভরতপুর ছাড়ার পর।

খবর ওইটুকুই মা। লোচন এখানে এসেছে চাকরির চেষ্টায়। ওর এক মামা এক চটকলে কাজ করে। তার কাছেই এসেছে। দত্তসায়েবের কারখানা এখন কতদিন বন্ধ থাকবে তার তো কিছু ঠিক নেই।

লোচন তোমাকে দেখে একটু আশ্চর্যই হয়ে গেল বোধ হয়?

আমাকে দেখে অতটা আশ্চর্য হয় নি, কিন্তু একদৃষ্টে খুকুর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে ছিল। খুকুর মুখের সঙ্গে ছোট বাবুর বড্ড মিল কিনা মা। ও জানে, আমি এখানে এক বাড়িতে দারওয়ানি করি।

আর কিছু বলে নি লোচন? ভরতপুরের আর কোন কথা? হীরু হয়তো খুঁটিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারে নি। এড়িয়ে গেছে লোচনকে, পাছে নিজের কথা বলতে হয়। হঠাৎ ভরতপুর ছেড়ে কলকাতায় কেন এল হীরু! সেই থেকে মল্লিক-বাড়ির বৌরানীই বা নিখোঁজ কেন! খুকুকে অবশ্য লোচন কোনদিন দেখে নি, কাজেই তাকে চেনা সম্ভব নয়। কিন্তু কিছুই কি আন্দাজ করতে পারে নি? মুখচোখের যখন এত মিল তখন ছোট বাবুর মেয়ে হওয়া তো বিচিত্র নয়।

হীরুই কথা বলল, মল্লিক-বাড়ি আর নেই মা। অর্ধেক তো গিয়েই ছিল। বাকি অর্ধেকটাও ভেঙে দত্তসায়েব মেয়েদের স্কুল তৈরী করেছেন। লোচনই বলল।

মল্লিক-বাড়ির কথা বলল লোচন কিন্তু মল্লিক বংশের সর্বস্বহারা মনিবের কোন কথা বলল না? ভরতপুরেই আছেন শেখরনাথ, দত্তসায়েবের সেই বাংলোতে, সেই বাইজির পাশাপাশি? না, আবার বেরিয়েছেন দত্তসায়েবের নতুন কোন উৎসবের আয়োজনে, আরো নামকরা বাইজি আর তবলচীদের আহরণ করতে?

অনেকক্ষণ হীরুর মুখের দিকে লীলা চেয়ে রইল। আশা করল, হয়তো নিজের থেকেই হীরু কিছু বলবে। লোচন যদি নাই বলে থাকে কিছু, কিংবা ভুলেই গিয়ে থাকে বলতে, হীরু তো অনায়াসেই তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারত। দত্তসায়েবের ঘায়েল হওয়ার সংবাদে হীরু কি এতই বিচলিত হয়ে পড়েছিল যে পুরনো মনিবের কুশলসমাচার জিজ্ঞাসা করার কথাও মনে হয় নি।

হীরু নির্বিকার। দু হাঁটু জড় করে চুপচাপ বসে আছে মেঝের ওপর। দৃষ্টি লীলার পায়ের দিকে।

লোচন আর কারুর কথা কিছু বলল নাকি হীরু?

আর কারুর কথা! হীরু কপাল কোঁচকাল। হাত দিয়ে মাথাটা চুলকে নিল। লোচনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা হয়েছিল। পার্কের রেলিংয়ের ধারে। জরুরী কাজে লোচন ছুটছিল, তার কথা বলবার অবসরই কম।

লীলাই বলল। কাঁপা গলায়, প্রায় ফিসফিসিয়ে, ইয়ের কথা, মানে তোমাদের ছোট বাবুর কথা লোচনের মুখে শুনলে না হীরু? তাঁর কথা কিছু বলে নি?

ছোট বাবুর কথা? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হীরু মাথা নাড়ল। মনে পড়েছে। লোচন ছোট বাবুর কথাও বলেছে। ভরতপুরে ছোট বাবু নেই।

ভরতপুরে নেই? কোন রকমে লীলা কথাগুলো উচ্চারণ করল।

না মা, লোচন বলল, ছোট বাবু নেই ওখানে। একটু থামল হীরু। বোধ হয় বাকি কথাগুলো আদৌ বলবে কি না, তাই মনে মনে ভেবে নিল, তারপর আস্তে বলল, সেই তিনিও নেই? তাঁর সঙ্গেই ছোট বাবু ভরতপুর ছেড়েছেন।

কথাটা বুঝতে লীলার একটুও অসুবিধা হল না। সম্পদ, অভিজাত্য সব গেছে শেখরনাথের, স্বাস্থ্য আর সম্মানেরও কণামাত্র অবশিষ্ট নেই, কিন্তু তবু বাইজি তাকে ছাড়ে নি। নিয়তির মত দুর্বার, দেবতার চেয়েও নিষ্ঠুর। টেনে নিয়ে যাবে অধঃপাতের শেষ সোপান পর্যন্ত। একেবারে শেষ না হওয়া অবধি শেখরনাথের মুক্তি নেই।

কিন্তু কোথায় গেলেন শেখরনাথ। এতদিন তবু এইটুকু আশা ছিল লীলার, তেমন প্রয়োজন হলে ভরতপুরে লোক পাঠাতে পারবে। অবশ্য তাতে কাজ কতটুকু হবে বলা শক্ত। আকণ্ঠ ডুবে আছেন সুরায়, লোকলজ্জার চেতনাটুকুও নেই, কিন্তু তবু দাঁড়াতে পারবে তার সামনে গিয়ে। যদি অসুখই হয় লীলার, বাঁচবার আশাই না থাকে। তবু তো খুকুকে নিয়ে হীরু ছোট বাবুর আশ্রয়ে গিয়ে উঠতে পারবে। লীলা না হয় তাঁর পথের জঞ্জাল, জীবনের কাঁটা, কিন্তু খুকু তো কোন দোষ করে নি। নিষ্পাপ, সরল শিশু, তাকে কাছে টেনে নিতে কিসের অসুবিধা!

অনেকক্ষণ পরে লীলা যখন মুখ তুলল, হীরু সরে গেছে সামনে থেকে।

লীলা ধীর পায়ে ছাদে এসে দাঁড়াল। এমন করে আর কতদিন চলবে, লুকোচুরি করে, মিথ্যা কথার পশরা সাজিয়ে? এখানকার সবাই জানে মানুষটা বিদেশে গেছে। আজ নয় কাল, কিংবা বড় জোর কমাস পরে ফিরে আসবে। কিন্তু মাসের পর মাস কেটে গেলে লীলা কি কৈফিয়ত দেবে? কার মুখে হাত-চাপা দেবে? রাজ্যসুদ্ধ লোক ওকে আঙুল দিয়ে দেখাবে। হাসবে মুখ টিপে টিপে। যে ইজ্জত বাঁচাতে লীলা সব কিছু ছেড়ে এল, হাজার অপমান, হাজার গ্লানি বুকে চেপে, সে ইজ্জতের কিছুই থাকবে না। মানুষের তির্যক চাউনি আর ব্যঙ্গোক্তিতে সম্ভ্রমের আবরণ ধুলোয় লোটাবে।

তার চেয়ে ভরতপুরে থাকলেই পারত। মল্লিক-বাড়িতে না ঠাঁই হয়, অন্য কোথাও, ভরতপুরের কোন এক নির্জন প্রান্তে পর্ণকুটির বেঁধে। তবু তো সেখানকার লোকেরা চিনত, মান্য না করুক, অবহেলাও করতে পারত না!

কিন্তু শুধু ভরতপুরের বাসিন্দার ওপর নির্ভর করে লীলা থাকতে পারত সেখানে? দত্তসায়েব থাকতে দিতেন? সতীকে আওতায় পান নি তাই দ্বিগুণ আক্রোশে লীলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। কোন উপায় নেই লীলার। একপাশে লেলিহান আগুনের শিখা, অন্যপাশে প্রলয়ঙ্করী বন্যার উচ্ছ্বাস, তারই মাঝখানে বালির চরে বাসা বাঁধা।

উদ্গত নিশ্বাস চেপে লীলা ঘরে এল।

মাস দুয়েক। ডিরেক্টর মাঝখানে ফিরেছিলেন, আবার গিয়েছেন বোম্বে।

এর মধ্যেই একবার লীলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। গৌরীর কামরার সামনে। মুখোমুখি।

ভাল আছেন? মাথার ফেল্টহ্যাট তুলে ডিরেক্টর অভিবাদন করলেন।

উত্তরটা লীলা এড়াতে পারে নি। পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে কেবল বলেছিল, হ্যাঁ ভাল।

কিন্তু নিস্তার নেই। ডিরেক্টর একগাল হেসে আবার প্রশ্ন করেছিলেন, আমার কথাটা কিছু ভেবেছেন নাকি এর মধ্যে? হাতে একটা কাজ ছিল।

লীলা দ্রুতপায়ে পালিয়ে বেঁচেছে। ছুটে গৌরীর ঘরে ঢুকে বলেছে, গৌরী একগ্লাস জল দাও শীগগির। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। গৌরীর অনুরোধেই লীলা সম্পর্কটা সহজ করে এনেছে। আপনি থেকে তুমি।

জল এনে গৌরী জিজ্ঞাসা করছিল, কি ব্যাপার, হাঁপাচ্ছেন যে?

বাঘে তাড়া করেছিল। চুমুক দিয়ে জল শেষ করে লীলা বলল।

বাঘে! কথাটা যে গৌরী একেবারে বোঝে নি, এমন নয়।

তার চেয়েও ভয়ঙ্কর! তোমাদের ডিরেক্টর। মুখে হাসির রেখা টানল বটে লীলা, কিন্তু তার বুকের ধুকপুকুনি একটুও কমে নি।

আর কটা দিন দিদি, গৌরী হাসল, তারপর আর আপনার নাগাল পাচ্ছে না।

কথাটা লীলার মনে ছিল না। সত্যিই তো, আর কটা দিন। তারপরে গৌরীদের গৃহপ্রবেশ হবে। বাড়ি প্রায় তৈরী। টুকিটাকি যা বাকি আছে সেগুলো আস্তে আস্তে করে নিলেই চলবে। বাড়িতে বসে বসে।

লীলা গৌরীদের সঙ্গে উঠে যাবে, একথা প্রায় ঠিক।

বড় ভাল হত দিদি, পানের ডিবে থেকে পান তুলে নিয়ে মুখে দিতে দিতে গৌরী বলল, এই সময় বেশ খুকুর বাপ এসে পড়তেন। একসঙ্গে নতুন ঘরে ঢোকা যেত।

এমনভাবে গৌরী কথাগুলো বলল যেন এ গৃহের ওরাও অংশীদার। লীলা আর খুকুর বাপ। তাই একসঙ্গে শুভলগ্নে সকলে গৃহপ্রবেশ করবে।

চিঠি লিখে দিন না দিদি। অনেকদিন তো বাইরে রয়েছেন। গৌরীর প্রশ্নে লীলা চমকে উঠল। এই একটি প্রসঙ্গে শুধু লীলার ভয়। গৌরীর কাছে ওর সঙ্কোচের আর কোন কারণ নেই।

মুখ নিচু করে লীলা আস্তে আস্তে বলল, কাল রাত্রেই চিঠি একটা লিখে দিয়েছি ভাই। আসতেও লিখেছি।

নববধূর লজ্জা লীলার চোখে মুখে। গৌরী একদৃষ্টে চেয়ে রইল অপরূপ শোভার দিকে।

কই দেখি, উলের কি নতুন প্যাটার্ন যোগাড় করেছ। সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে লীলা সোজাসুজি প্রশ্ন করল। এ ছাড়া উপায়ও নেই। এ প্রসঙ্গ বেশীক্ষণ চলতে দিলে লীলা আত্মরক্ষা করতে পারবে না। এমনিতেই দুচোখে জল ভরে এসেছে। কাঁপছে দুটো ঠোঁট।

ওপরে ফিরে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে লীলা ভাবল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে। এ খেলা আর কতদিন চালাবে, বিশেষ করে গৌরীর কাছে। সত্যি যদি গৌরীর আস্তানায় গিয়ে উঠতে হয়, ক্রমে ক্রমে তো সবই গৌরী জানতে পারবে। দিনের পর দিন এক কথা বলে কতদিন ভুলিয়ে রাখবে মানুষজনকে। বাইরে গেছেন শেখরনাথ। ব্যবসার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মানুষটা নিজের স্ত্রী-কন্যার কাছে ফিরে আসবে না? তা ছাড়া এ কেমন অজ্ঞাতবাস! চিঠি নেই, পত্র নেই, যতই লীলা সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করুক মাঝে মাঝে ঠিক খোঁজ খবর দিচ্ছেন শেখরনাথ, কিন্তু মানুষ তো আর অন্ধ নয়। হোটেলে থাকবার সময় না হয় কিছু একটা বুঝিয়েছে, কিন্তু কি বলবে গৌরীর বাড়িতে গিয়ে ওঠার পর!

তার চেয়ে লীলা, অনেক ভেবে ঠিক করল, সব কথা গৌরীকে জানানোই ভাল। যতটুকু রেখে ঢেকে সম্ভব। কথাগুলো বলতে লীলার বুক ফেটে যাবে, লজ্জায় হেঁট হয়ে আসবে মাথা, কিন্তু তবু বিশ্রীভাবে ধরা পড়ে যাওয়ার চেয়ে, একদিনেই সব কথা বলা ভাল। গৌরী যদি কিছু মনে করে তবে বলুক মুখ ফুটে। বিন্দু বিন্দু করে সন্দেহ জমিয়ে রেখে বিস্ফোরণ হওয়ার চেয়ে, আগে ভাগে সব কিছু বলে দেওয়াই উচিত। লীলা যদি বোঝে গৌরীর চোখে অবি-শ্বাসের ছিটে, ঠোঁটের কোণে সন্দেহের বাঁকা হাসি, তাহলে সাবধান হতে পারবে। কোন ছুতোয় এড়িয়ে যাবে গৌরীকে, তার বাড়ি গিয়ে ওঠার প্রস্তাব বাতিল করে দেবে। সারাটা জীবন এখানেই কাটাবে। হাজার মানুষের কুৎসিত সন্দেহ আর ব্যঙ্গের হাসির ঝিলিকের মধ্যে। মনে মনে গড়ে তোলা

স্বামীর কল্পিত বিদেশযাত্রার কাহিনীতে হেলান দিয়ে জীবন কাটাবে দিনের পর দিন।

পরের দিন সকালে লীলা গৌরীর খোঁজ করল। গৌরী নেই। ভোর-বেলা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই নতুন বাড়িতে গেছে। আর কদিন বাদেই গৃহপ্রবেশ, বোধ হয় তারই বন্দোবস্ত করতে।

দুপুরবেলা হোটেলে ফিরেই গৌরী ওপরে উঠে এল।

ডেকেছেন দিদি?

স্নান-খাওয়া হয়েছে? এই ফিরলে বুঝি?

গৌরী ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল। পা তুলে বসল সামনের চেয়ারে।

স্নান সেরেই বেরিয়েছিলাম। বাইরেই খেয়ে নিয়েছি। উনি ওখান থেকে অফিসে চলে গেছেন, আমি চলে এলাম হোটেলে।

লীলা হাসল, আমিও তাই ভাবছিলাম। কর্তা-গিন্নী দুটিতে ভোরেই উধাও। তারপরই গলার স্বরে গাম্ভীর্যের মেঘ ঘনিয়ে এল। সারারাত শুয়ে শুয়ে লীলা ভেবেছে। কি ভাবে বলবে কথাগুলো তাও গুছিয়ে নিয়েছে, কিন্তু বলবার মুখেই কোথা থেকে রাজ্যের জড়তা এসে বাসা বাঁধল, সঙ্কোচ আর শঙ্কা। তিল তিল করে যে বিষ এতদিন লীলা নিজের মর্মকোষে সঞ্চিত করে রেখেছিল, দহনে নিজে জ্বলেছে অহোরাত্র, কিন্তু এক বিন্দু বাইরে ছিটোয় নি, আজ গৌরীর সামনে রাখতে হবে সে বিষের পাত্র। করুণা সহানুভূতির পরিবর্তে হয়তো বরাতে জুটবে ঘৃণা আর উপেক্ষা। কিন্তু তবু লীলা নিরুপায়।

তোমার সঙ্গে দরকারী কথা আছে গৌরী। লীলা খাটের ওপর বসল।

দরকারী কথা? আমার সঙ্গে? গৌরী সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। ভাবটা যেন ওর সঙ্গে কেউ কখনো দরকারী কথা বলে নি। কেউ পরামর্শ চায় নি ওর কাছে।

উঠে গৌরী লীলার পাশে বসল।

কি বলুন?

অত সহজেই যদি বলা যেত কথাগুলো। লীলা ঢোঁক গিলল বার দুয়েক। তারপর আস্তে আস্তে বলল। শেখরনাথের শিকার করতে যাওয়ার কাহিনী থেকে লীলার ভরতপুর ছাড়ার ইতিহাস। শুধু সতীর কথাটুকু লীলা বাদ দিল। যে মানুষটা আর নেই, তার সম্বন্ধে কিছু জেনে কোন লাভ নেই গৌরীর।

সে কলঙ্কের কথা চাপা থাক ভরতপুরের মাটিতে। বাতাসে এদিক ওদিক ছাই ওড়ার মতন তার সর্বনাশের কথা এখানে ওখানে ছড়িয়ে কি প্রয়োজন।

গৌরী চুপ করে শুনল। রূপকথা শোনার মতন।

এতদিন ধরে তোমাদের মিথ্যা কথা বলেছি গৌরী। স্বামী আমার বিদেশে সত্যি কথা, কিন্তু কোনদিন বুঝি আর ফিরে আসবেন না আমার কাছে। কথা শেষ করে লীলা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে।

আপনি অন্যায় কিছু করেন নি দিদি। যে কোন মেয়েই এইভাবে কথাটা বলত। স্বামীর কলঙ্কের কথা মুখ ফুটে কোন মেয়েই বলতে পারে না। আমার কিন্তু দিদি গোড়া থেকেই কেমন একটা সন্দেহ হয়েছিল।

সন্দেহ? লীলা আঁচল সরিয়ে মুখ তুলল, সন্দেহ আবার কিসের?

আমার ঠিক মনে হয়েছিল আপনি খুব বড় ঘরের মেয়ে।

এরপরেও তোমাদের বাড়িতে থাকতে দেবে তো? চোখে জল কিন্তু লীলা মুখে হাসি ফোটাল।

ছি, ছি, ওভাবে কথা বলবেন না দিদি। আমাদের অকল্যাণ হবে। আপনার পায়ের ধুলো পাওয়া কত ভাগ্যের কথা।

তোমায় তো আগেই বলেছি গৌরী, এ হোটেল আমি ছাড়তে চাই। ডিরেক্টর আমার প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলবে। তোমাদের আস্তানায় গিয়ে উঠলে আমার এইটুকু সান্ত্বনা যে হঠাৎ যদি আমার কিছু হয়, অন্তত খুকুকে তুমি ফেলতে পারবে না।

ও কি কথা বলছেন দিদি। গৌরী লীলার দুটো হাত চেপে ধরল।

অনেকক্ষণ দুজনে চুপচাপ বসে রইল। বলবার মত কথা লীলার আর নেই। গৌরীও হতবাক্।

এক সময়ে হাত ছাড়িয়ে গৌরী উঠে দাঁড়াল, চলি দিদি, আপনি একটু বিশ্রাম করুন। বিকালে আবার আসব।

লীলা ম্লান হাসল। গৌরী চলে যেতে দরজা বন্ধ করে ফিরে এল বিছানায়।

হীরু নেই। ঘরের এক কোণে মাটি আর কাঠের খেলনা নিয়ে খুকু খেলা শুরু করেছে। নতুন খেলাঘর বারবার ভাঙছে আর গড়ছে। কিছুতেই বুঝি হচ্ছে না মনের মতন। পাতানো সংসার সাজাচ্ছে আর সরাচ্ছে।

বালিশে বুক চেপে লীলা একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখল। কত সুবিধা খুকুর। একটু অপছন্দ হলেই ভেঙে ফেলছে, মনের মতন গড়ার চেষ্টা করছে আবার, কিন্তু সে সুবিধা লীলার ছিল না। চোখের সামনে অল্প অল্প করে ভেঙে পড়েছে সংসার, মনের মানুষ সরে গিয়েছে একটু একটু করে। লীলা কিছু করতে পারে নি। অবাক-দৃষ্টি মেলে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেছে সর্বনাশের পালা। অন্তর-মথিত দীর্ঘশ্বাস, দু-এক ফোঁটা অশ্রু, শুধু এইটুকুতেই সে ভাঙনের তর্পণ করেছে।

আজ নিজেকে লীলার অনেকটা হালকা মনে হল। এতদিনের জমানো পাষাণ-ভার নেমে গেল বুকের ওপর থেকে।

সকাল থেকে ব্যস্ততার আর অন্ত নেই। অবশ্য লীলার তো জিনিসপত্রের বালাই নেই। আগের দিনই বাক্স গুছানো শেষ। বিছানাটা হীরু গুটিয়ে রেখেছে, যাবার সময় বেঁধে নেবে।

ব্যস্ত গৌরী আর তার স্বামী। মালপত্র আগেই চলে গেছে। পূজার সমস্ত ব্যবস্থা তাদের করতে হচ্ছে। খুঁটিনাটি অজস্র জিনিস। কলাগাছ থেকে শুরু করে মঙ্গলঘট আর ডাব। ভটচাজ মশাইয়ের বিরাট ফিরিস্তি। তার ওপর শুভক্ষণ বেলা নটা পঞ্চাশ থেকে দশটা দশ। তাই তাড়াহুড়ো চলেছে।

একটা গাড়িতে জিনিসপত্র নিয়ে গৌরীর স্বামী, আর ভটচাজ, অন্যটিতে হীরু, খুকু, গৌরী আর লীলা।

এর আগে কয়েকবার গৌরী বলেছে লীলাকে, বাড়ি দেখতে নিয়ে যাবার জন্য টানাটানিও করেছে, কিন্তু লীলা হেসে এড়িয়ে গেছে। আগে থেকে দেখলে পুরনো হয়ে যাবে, একেবারে আনকোরা বাড়িতে লীলা ঢুকবে।

ছোট বাড়ি, কিন্তু পরিপাটি। চারপাশে ফালি জমি। ইতিমধ্যেই দু-একটা ফুলের গাছ বসানো হয়েছে। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা অল্প। গৌরীর আত্মীয়স্বজন ধারে কাছে কেউ নেই, গৌরীর স্বামীরও নয়, কাজে কাজেই হোটেলের বাসিন্দারাই ভিড় জমাল। হোটেলের ম্যানেজারও বাদ গেলেন না। হেমন্তবাবু পরিবেশন করলেন, গৌরী রইল সঙ্গে সঙ্গে। লীলা ভাঁড়ার আগলাল।

খাওয়া-দাওয়া চুকতে বেলা গড়িয়ে এল। গৌরী সারাদিন উপোস করেছে। তাকে খাইয়ে তবে লীলা খেতে বসবে। তাই নিয়ে কথা কাটাকাটি। গৌরীর

ইচ্ছা, তিনজন একসঙ্গে বসে, লীলা, গৌরী আর হেমন্তবাবু। লীলা রাজী নয়।

আচমকা মোটরের হর্নের শব্দে তিনজনেই চমকে উঠল। ঠিক গেটের সামনে কালো মোটর। হেমন্তবাবু এগিয়ে যাবার আগেই দরজা খুলে ডিরেক্টর নামলেন। পিছন পিছন রেবাদেবী।

চুরুটে টান দিয়ে ডিরেক্টর ধোঁয়া ছাড়লেন কিছুক্ষণ তারপর হেসে বললেন, আজ বম্বে থেকে ফিরেই আপনার নিমন্ত্রণের চিঠি পেলাম। হোটেল একেবারে খালি। সব শুনলাম এখানে এসে জুটেছে, তাই সোজা চলে এলাম এখানে।

বেশ করেছেন, না এলে ভারি দুঃখ পেতাম। হেমন্তবাবু বিনয়ে বিগলিত।

আমি কিন্তু বিনা নিমন্ত্রণেই চলে এসেছি হেমন্তবাবু। রেবাদেবী হাসির লহর তুলল।

আসুন এদিকে আসুন। গৌরী রেবাদেবীর একটা হাত আঁকড়ে ধরল। তাকে টেনে নিয়ে এল ঘরের ভিতর।

বাইরে ডিরেক্টরের উচ্চ কণ্ঠ শোনা গেল, উঁহু, খাওয়ার কোন ব্যবস্থা করবেন না। আমরা দুজনেই খেয়ে এসেছি।

তা কি হয়, অন্তত একটু মিষ্টিমুখ তো করতেই হবে। হেমন্তবাবুর ক্ষীণ কণ্ঠ। অতিথি-সৎকারের প্রাণপণ প্রয়াস।

জানলার কাছে লীলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। গালে হাত দিয়ে। এতক্ষণ খুব ভাল লাগছিল। পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণ, আমের পল্লব দিয়ে সাজানো মঙ্গল ঘট, অভ্যাগতদের কলগুঞ্জন, সব মিলিয়ে শান্ত সমাহিত পরিবেশ। কিন্তু ডিরেক্টর গেট ঠেলে ঢোকার মুহূর্তে আবহাওয়া আবিল হয়ে উঠল।

চৌকাঠে পা দিয়েই রেবাদেবী চেঁচিয়ে উঠল, আরে আপনি। রেবাদেবী দুহাত জোড় করার সঙ্গে সঙ্গে লীলাও দুটো হাত জোড় করল, প্রতিনমস্কারের ভঙ্গীতে।

আসন পেতে দুজনের কেউই বসল না। না ডিরেক্টর, না রেবাদেবী। ছোট এক টেবিলে দুজনকে ফল আর মিষ্টি দেওয়া হল।

খেতে খেতেই ডিরেক্টর বললেন, বম্বের পালা চুকে গেছে। এবার এখানে কাজ আরম্ভ করব, ভাল একটা বইয়ের খোঁজে রয়েছি। নতুন বই আর নতুন মুখ।

কথার শেষে চোখ তুলে লীলার দিকে চাইলেন। লীলা দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল, চোখে চোখ পড়তেই ঘরের মধ্যে চলে গেল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে বেশি দেরি হল না। রুমালে মুখ হাত মুছে ডিরেক্টর উঠে দাঁড়ালেন। পিছন পিছন রেবাদেবী। বিদায় দেবার জন্য গৌরীও ওদের সঙ্গে সঙ্গে এল। লীলা দাঁড়াল গৌরীর পাশে।

হেমন্তবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে ডিরেক্টর থেমে গেলেন। আঙুলের টোকা দিয়ে চুরুটের ছাই ঝেড়ে হঠাৎ লীলার দিকে ফিরে বললেন, আপনি যদি যেতে চান তো আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন। আমরা হোটেলেই ফিরব।

লীলা উত্তর দিল না। ঘোমটা টেনে একটু শুধু পিছিয়ে দাঁড়াল। উত্তর দিল গৌরী, দিদি আর হোটেলে ফিরবেন না। উনি তো এখানেই থাকবেন, আমাদের কাছে।

চুরুটে টান দিচ্ছিলেন ডিরেক্টর। ছাই সরে আগুনের দীপ্তি। কিন্তু লাল দীপ্তি কেবল চুরুটের মুখেই নয়, ডিরেক্টরের দুটি চোখেও। কালো পুরু ঠোঁটের কবল থেকে চুরুট বের করে নিয়ে বললেন, ওঃ, উনিও আস্তানা বদলালেন। I see. তা হলে গৃহপ্রবেশ আপনারও? Very good. চল রেবা, বড্ড দেরি হয়ে গেছে। Producer হয়তো এসে বসে থাকবেন।

বাঁকের মুখে মোটর অদৃশ্য না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত লীলা একদৃষ্টে চেয়ে রইল। পুচ্ছদেশে আলোর রক্তবিন্দু। বিধাতার ভ্রূকুটির মতন।

মাস তিনেক। ইতিমধ্যেই লীলার গায়ের অনেক অলঙ্কার খসেছে। হীরুর মারফত পোদ্দারের দোকানে। এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি। হাতের জমানো টাকা নিঃশেষ। খুকু বড় হয়েছে। তার খরচও অনেক বেড়েছে। কিন্তু এরপর? অঙ্গের সামান্য সোনাটুকুও যখন আর থাকবে না, তখন? মল্লিক-বাড়ির বৌরানী দাঁড়াবে রাস্তার মোড়ে। ঘোমটায় মুখ ঢেকে, শতচ্ছিন্ন শাড়ির প্রান্ত থেকে জীর্ণ শিরাবহুল হাত প্রসারিত করে। পথচারীর করুণা-নির্ভর, ভিখারিণীর জীবন।

গৌরী আর হেমন্তবাবুর যত্নের সীমা নেই। সবসময় খোঁজখবর নেওয়া, দেখাশোনা করা।

এমন কি গৌরী একথাও বলেছে, আপনি যদি অনুমতি দেন দিদি, তবে উনি

বলছিলেন একবার ভরতপুরে যাবেন। যদি সম্ভব হয় শেখরনাথবাবুর সঙ্গে দেখা করে বুঝিয়ে বলবেন সব কথা।

করুণা-ছলছল দুটি চোখের দৃষ্টি লীলা মেলে ধরল গৌরীর দিকে। গৌরী বুঝি ভুলে গেছে? মান সম্ভ্রম লাজ-লজ্জা সব খুইয়ে লীলা দাঁড়িয়েছিল শেখরনাথের সামনে। তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য হাজার কাকুতি-মিনতি। কোন ফল হয়নি। স্বামী-দেবতার নির্মম-স্বাক্ষর কপালে নিয়ে ফিরে এসেছে মাথা নিচু করে। লীলা খুব আস্তে বলল, তিনি তো ভরতপুরে নেই ভাই। লোচনের মুখে শুনলাম, কোথায় চলে গেছেন। সারা পৃথিবী কোথায় খুঁজে বেড়াবেন বল?

যদি ফিরে এসে থাকেন ভরতপুর? একটা কথা দিদি, ঝড়ঝাপটা কেটে গেলে মানুষটার শান্ত জীবনের কথা মনে আসে। কাজেই হয়তো ফিরেও আসতে পারেন ভরতপুরে। কিছু বলা যায় না।

সেই আশার ওপর নির্ভর করেই তো লীলা বেঁচে আছে। সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা ব্যথাবেদনার অন্তরালে ক্ষীণশিখা প্রদীপ। কতটুকু তার দীপ্তি, কতটুকু অন্ধকার দূর করার শক্তি, কিন্তু তবু সেই আলোর দিকে চেয়ে লীলা এগোচ্ছে। কাঁটাছাওয়া পথে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে অঙ্গ, ধুলোকাদায় শরীর ঢেকে যাচ্ছে কিন্তু সে আশাটুকু শেষ হয়ে গেলে, বাঁচবার লীলার আর কোন সম্বলই থাকবে না।

মাঝে মাঝে, লীলা হীরুর দিকেও ফিরে দেখেছে। হীরুর বয়স হয়েছে। মাথার চুল আর বিশেষ কাঁচা নেই। শক্ত সরল কাঠামো একটু নুয়ে এসেছে। প্রায়ই দুহাঁটুর ওপর মাথা রেখে চুপচাপ সিঁড়ির পাশে বসে থাকে। দুচোখে উদাস-দৃষ্টি। হয়তো নিজের ফেলে-আসা জীবনেরই স্বপ্ন দেখে। মল্লিক-বাড়ির ঐশ্বর্যের স্বপ্ন। ছোটবাবুর শিকারের সঙ্গী। হাতে শুধু বন্দুকের বাক্সই বইত না, আর এক হাতে থাকত বেহালার বাক্স। টিগার টেপার আঙুল দিয়ে ছড়ও টানতেন শেখরনাথ। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিকারের নেশা হয়তো ফিকে হয়ে এসেছে হীরুর। কিন্তু, পূরবী, ছায়ানট আর সোহিনী মায়া বিস্তার করেছে বুঝি জীর্ণ মনের ওপর? তাই এই অন্যমনস্ক ভাব!

তুমি ফিরে যাও হীরু। আমার জন্য তোমার জীবন কেন নষ্ট করবে? কোন কিছু না ভেবে, আচমকা লীলা বলে ফেলেছে।

হীরু চমকে উঠেছে। দাঁড়িয়ে দুহাত জোড় করে বলেছে, মল্লিক-বাড়ির

জীবনের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই যে আমার জীবন জড়ানো মা। আলাদা করে তো নিজেকে ভাবতে শিখি নি।

লীলা ম্লান হাসল, কিন্তু মল্লিক-বাড়ির কিছুই তো আমার নেই হীরু।

যদি মল্লিক-বাড়ির কিছু কোথাও থাকে মা তো আপনারই আছে।

আমার আছে? লীলা আশ্চর্য হয়ে গেল। কি বলছে হীরু। সে ঝলমলে আভিজাত্যের কি অবশিষ্ট আছে। জড়োয়া গহনা তো নিজের হাতে করে হীরু শেষ করে এসেছে। সম্ভ্রমের শেষ কণাটুকুও উধাও। দু-একটা দামী শাড়ি পড়ে আছে বাক্সের কোণে। সে শাড়িগুলো মরে গেলেও লীলা হাতছাড়া করতে পারবে না। খুকু বড় হচ্ছে। কিছুই তো পেল না জীবনে, মার স্মৃতি-চিহ্ন হিসাবেই শুধু নয়, মল্লিক-বাড়ির আভিজাত্যের প্রতীক হিসাবে এই কখানা শাড়ি অন্তত তার প্রাপ্য।

আমার কি আছে হীরু? আমি তো নিঃস্ব।

হীরুর স্তিমিত দুটি চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক। আঙুল দিয়ে খুকুর দিকে দেখিয়ে বলল, খুকুদিদি রয়েছে মা। মল্লিক-বাড়ির সবচেয়ে বড় সম্পদ।

মল্লিক-বাড়ির সম্পদ!

লীলা চোখ তুলে দেখল। সামনের লনে খুকু দাঁড়িয়ে আছে। ভোরের রোদ এসে পড়েছে কোঁকড়ানো, সোনালী চুলে, সুগৌর মুখে। কখন সকলের অগোচরে খুকু বড় হয়ে পড়েছে। নিটোল হাত-পা। টানা দুটি চোখ রহস্যের শেষ দেখতে চায়। পাতার ফাঁকে ঢাকা কুঁড়ির হঠাৎ প্রকাশের মত খুকু আচমকা বেড়ে উঠেছে।

লীলা ভরতপুর ছেড়েছে কম দিন হল। আর কয়েকটা বছর, তারপর অনেক কিছু খুকু জানতে চাইবে। নিজের ছোট পরিবেশে আর মন ভরবে না। নিজের পরিচয় জানতে চাইবে, বংশের ঐতিহ্যের সঠিক খবর। হয়তো ওখানেই থামবে না, জানতে চাইবে, ভরতপুর ছেড়ে আসার ইতিহাস। হোক টলমলে জীর্ণ-পাটাতন পানসী, সহস্র ছিন্ন পাল, তবু তো আভিজাত্যের ক্ষয়িষ্ণু প্রতীক। সে ঐতিহ্য থেকে খুকুকে কেন টেনে আনল লীলা? তবু তো একটা পরিচয় ছিল ভরতপুরে, নিভে আসা দীপদণ্ডের বনেদী সম্ভ্রম। এভাবে অপরিচয়ের পথের ধুলোয় টেনে ফেলল খুকুকে কোন অধিকারে।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সত্যিই কি খুকু একদিন জানতে চাইবে সব কিছু, এত সব কথা?

এতদিন লীলা শুধু নিজের সমস্যার কথাই ভেবেছে, নিঃসঙ্গ দিন আর অন্ধকার ভবিষ্যৎ। কিন্তু এইবার থেকে মেয়ের কথাও ভাবতে হবে। লেখাপড়াই শুধু নয়, মল্লিক-বাড়ির মেয়েকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কিন্তু তারপর যখন সে পিতৃপরিচয় চাইবে, কি পরিচয় লীলা দেবে? তার আগে যেমন করে হোক শেখরনাথের সন্ধান করতে হবে। লীলা নিজে করবে সে খোঁজ। অন্য কাউকে দিয়ে খোঁজ-খবর করার মধ্যে কোথায় যেন সঙ্কোচের ছিটে আছে, সে লীলা কিছুতেই পারবে না।

লীলাকে শেখরনাথ স্বীকার না করুন, মেয়ের ব্যবস্থা তাঁকে করতেই হবে। এ ভাবনার পাশাপাশি আরো একটা কথা লীলার মনে পড়ে গেল। শেখরনাথ নিজে অন্যের অন্নদাস, অন্ততঃ দত্তসায়েবের ছড়ানো ছিটানো কৃপার ওপর নির্ভরশীল। মেয়েকে মানুষ করার রসদ তিনি কোথা থেকে জোগাড় করবেন?

চারপাশে অন্তহীন অন্ধকার। সমস্যার যেন কোন সমাধান নেই।

সমাধান নেই, কিন্তু সমস্যা আরো জটিল হয়ে উঠল। প্রায় বিনামেঘে বজ্রাঘাত।

দরজা ভেজিয়ে লীলা শুয়ে ছিল দুপুরবেলা। হঠাৎ শিকলের আওয়াজ হতেই ধড়মড় করে উঠে পড়ল।

কে?

আমি গৌরী।

দরজা খুলতেই চৌকাঠের ওপরে গৌরীকে দেখা গেল। আলুথালু চুলের রাশ। কপালে ঘামের ফোঁটা।

কি হল গৌরী?

উনি এইমাত্র অফিস থেকে ফিরে এলেন। ওঁর নাকি গোরখপুর বদলীর হুকুম এসেছে।

গোরখপুর?

হ্যাঁ দিদি। সাতদিনের মধ্যে রওনা হতে হবে। অবশ্য ওঁর তো বদলীরই চাকরি, যে কোন মুহূর্তেই হুকুম আসতে পারত, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে আসবে আমরা ভাবতেও পারি নি। এখনও ভাল করে ঘরগুলোও সাজিয়ে উঠতে পারি নি। দেখেছেন তো দিদি?

গৌরীর গলা অশ্রুসিক্ত।

তা তো দেখেছে, কিন্তু ওরা চলে গেলে লীলার কি অবস্থা হবে। কেমন করে থাকবে এ বাড়িতে। গৌরীরা চিরকাল থাকবে না এমন আভাস আগেও পেয়েছিল কিন্তু লীলা আশা করেছিল হয়তো বদলীর হুকুম আসবে অনেকদিন পর। ততদিনে অনেক অসুবিধা লীলা কাটিয়ে উঠতে পারবে।

উনি আজকেই সব বন্দোবস্ত করে এসেছেন। অফিসের এক মাদ্রাজী এ বাড়িতে এসে উঠবেন, আপনার কোন কষ্ট হবে না দিদি। বরং আপনি থাকলে জানব নিজের লোক একজন আছেন দেখাশোনা করবার।

আমার কষ্টের কথা আমি যেন বড্ড ভাবছি গৌরী, লীলা মুখে হাসি আনার ভান করল, আহা নতুন বাড়ি, নিজের বাড়ি ফেলে কোথায় বিদেশ বিভুঁয়ে পড়ে থাকবে বল তো ?

এ তো অনেকটা জানা কথাই দিদি। উনি বাড়ি তৈরীর সময়ই বলেছিলেন এ বাড়ি ভোগ করতে পারব রিটায়ার করার পর। কিন্তু বাড়ির চেয়ে আপনাকে ছেড়ে যেতে যে আরো কষ্ট হবে দিদি।

লীলার দুটি চোখ জলে ভরে এল। গৌরীর তুলনা নেই। আপদে বিপদে বুক দিয়ে এমন করে কেউ আর এসে পড়বে না। নিজের বাড়িতে এমনভাবে কে আশ্রয় দিত ? কটা দিনের বা পরিচয়, এই অল্প সময়ের মধ্যে এমন নিজের করে নিতে পারা দরাজ অন্তঃকরণের পরিচয়। কিন্তু নিয়তি যেখানে বিমুখ, সেখানে এত সুখ লীলার কপালে বুঝি সহ্য হবার নয়।

পরের দিন থেকে টুকিটাকি বাঁধা-ছাঁদা শুরু হল। নেই নেই করেও কম আবর্জনা জমে না সংসারে। প্রথম দিকে গৌরী কিছুই নিয়ে যেতে চায় নি। বলেছিল, থাক এ সব পড়ে, দিদির দরকার হয় তিনিই নেবেন, নয়তো তোমাদের অফিসের মাদ্রাজী এসে ভোগ করবে।

কিন্তু পরে কি ভেবে গৌরী সবই গুছিয়ে নিয়েছে।

গাড়িতে ওঠার সময় হেমন্তবাবু লীলার দিকে ফিরে দু হাত জোড় করলেন, চলি বৌদি। যত শীঘ্র সম্ভব ফিরে আসার চেষ্টা করব।

এই প্রথম। ঠিক এভাবে মুখোমুখি হেমন্তবাবু আর কথা বলেন নি। প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু এই দরদী মানুষটার সমস্ত পরিচয় লীলা পেয়েছিল গৌরীর কাছ থেকে। আজ এই বৌদি সম্বোধনে মানুষটা আরো কাছে এগিয়ে এল।

মোটরে উঠে হেমন্তবাবু মুখ বাড়ালেন, কোন নতুন খবর থাকলে জানাবেন বৌদি।

নতুন খবর! মোটর চলে যাবার পর লীলা অনেকক্ষণ পথের ওপর দাঁড়িয়ে রইল। লীলার জীবনের নতুন খবর। হেমন্তবাবুর গলার স্বরে তাই তো মনে হল। এ নতুন খবর মানে শেখরনাথের খবর। শেখরনাথের ফিরে আসার, কিংবা বোধ হয় পথ হাতড়ে হাতড়ে লীলার শেখরনাথের কাছে গিয়ে পৌঁছানোর খবর।

চোখ মুছে লীলা ঘরে ফিরে এল।

পরের দিন ভোরেই আবার মোটর এসে দাঁড়াল। একটি মাদ্রাজী পরিবার। প্রৌঢ় ভদ্রলোক, বিরাটবপু স্ত্রী আর বছর সাতেকের একটি ছেলে। হীরুর হাত থেকে চাবি নিয়ে তারা ওপরে গিয়ে উঠল।

দুপুরের দিকে লীলা বসে বসে খুকুর একটা জামা সেলাই করছিল, দরজায় ছায়া পড়তেই ফিরে চাইল।

মাদ্রাজী ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে। লীলা মুখ ফেরাতেই বলল, একটু ওপরে আসবেন? মা ডাকছে। পরিষ্কার বাংলা। কোন জড়তা নেই। দু-এক মিনিট লীলা ভাবল। চেনা নেই শোনা নেই, নতুন লোক, ডাকছেন বলেই ওপরে গিয়ে উঠতে হবে? উনিও তো নেমে আসতে পারতেন। সেটাই তো উচিত হত। কিন্তু এ চিন্তা লীলা জোর করে মন থেকে সরিয়ে দিল। আপদে, বিপদে ওঁরাই তো সহায়। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ওদের কাছে গিয়েই দাঁড়াতে হবে, কাজেই এ ঠুনকো অভিমানের কোন দাম নেই।

খুকুর জামাটা সরিয়ে রেখে লীলা উঠে দাঁড়াল। ওপরে যেতে হলে শাড়িটা বদলানো দরকার। শতচ্ছিন্ন জীবনের পরিচয় তো সঙ্গে থাকতে থাকতে ওঁরা পেয়েই যাবেন, প্রথম দিনেই শতচ্ছিন্ন আবরণের পরিচয়টা নাই পেলেন।

শাড়ি বদলে লীলা বেরিয়ে এসে দেখল ছেলেটি ঘুমন্ত খুকুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। লীলা সামনে দাঁড়াতেই বলল, ও বুঝি আপনার মেয়ে?

লীলা ঘাড় নাড়ল। হেসেও ফেলল ছেলেটির বলার ভঙ্গীতে।

আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন তো। এখানে আমি একেবারে একলা। খেলার সঙ্গী কেউ নেই। আগে যেখানে ছিলাম সেখানে কত বন্ধু ছিল আমার, শঙ্কর, মিনি, আইজাক।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটি ওপরে উঠতে আরম্ভ করল। শব্দ করে করে। নিঃশব্দচরণে লীলা পিছন পিছন উঠল।

বারান্দায় বেতের চেয়ারে মাদ্রাজী মহিলাটি বসে। হাতে একটা বই। লীলা এসে দাঁড়াতেই মহিলা একবার ওঠার বৃথা চেষ্টা করলেন। তারপর ছেলের দিকে চেয়ে বললেন, রাজু, তোমার মাসীমাকে একটা মোড়া এনে দাও তো।

মোড়ার ওপর লীলা বসতেই মহিলা বলতে শুরু করলেন, এই শরীর নিয়ে নড়াচড়া করতে বড় অসুবিধা হয়। তাছাড়া ওঠানামা করা ডাক্তারের বারণ। কিন্তু বসে থাকবার কি উপায় আছে ভাই। তামিল সম্মিলনীর আমি সেক্রেটারী, দক্ষিণভারত নারী সমিতির আমি ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, তার ওপর কর্ণাট-সাঙ্গীতিকী রয়েচে, ওঁর অফিসের ক্লাবেও মাঝে মাঝে যেতে হয়।

লীলা বসে রইল। নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে। ভর দুপুরে ওকে ডেকে আনার উদ্দেশ্য কি নিজের বিরাট ব্যক্তিত্ব আর কর্মব্যস্ত জীবনের সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়া! কিন্তু এ সব শুনে লীলা কি করবে!

আপনি মিসেস করের কি রকম বোন?

আচমকা প্রশ্নে লীলা বিব্রত বোধ করল। মিসেস কর মানে গৌরী। কিন্তু গৌরী কি ভাবে পরিচয় দিয়েছে তা তো জানা নেই লীলার। একটু ভেবে নিয়ে লীলা বলল, রক্তের সম্পর্ক কিছু নেই, গাঁ সম্পর্কে সুবাদ।

মিসেস করের সঙ্গে আমার আলাপ নেই। মিস্টার কর ওকে বলেছিলেন। শহর থেকে এত দূরে আসার আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। আমাদের তো মোটর নেই, যাতায়াতের বড় অসুবিধা। তবে খোলা জায়গা আছে চারদিকে, বাড়িটাও নতুন, তাই আসা।

কিছুক্ষণ কোন কথা হল না। মহিলা কোলের ওপর রাখা বইটা নাড়াচাড়া করলেন। লীলা বসে রইল চুপচাপ। অনেক দূরের গাছপালার দিকে চেয়ে।

একটু পরে লীলা উঠে দাঁড়াল, আজ উঠি। নিচে কতকগুলো কাজ রয়েছে।

মহিলা হাসলেন, আসুন। আলাপ তো হল, এবার মাঝে মাঝে আসবেন ওপরে। বলেই মহিলা দুহাত ঘুরিয়ে মুখ চোখের অদ্ভুত ভঙ্গী করলেন, আসতে তো বলছি আপনাকে। কিন্তু কতটুকুই বা আমি বাড়ি থাকি। কখনই

বা কথা কইব। আজ এই নাড়ানাড়ি করাতে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তাই কোথাও বেরোই নি। বিকালে মিস্টার রাজনের বাড়ি উৎসব আছে। মিস্টার রাজনের নাম শুনেছেন? বিখ্যাত বীণাবাদক?

লীলা ঘাড় নাড়ল। না শোনে নি?

আচ্ছা আমাদের বাড়ি যেদিন আসর বসাব, সেদিন আপনাকে জানাব। অপূর্ব বাজান ভদ্রলোক।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই লীলা সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল। উঃ, অসহ্য। মাঝে মাঝে ওপরে এসে এই ধরনের কথাবার্তা যদি লীলাকে শুনতে হয়, তো সর্বনাশ।

সিঁড়ির মাঝবরাবর এসেই লীলার চোখে পড়ল। শেষ ধাপে রাজু বসে আছে। বগলে একটা বই।

লীলাকে নামতে দেখেই রাজু উঠে দাঁড়াল। লীলা সামনে এসে দাঁড়াতে বলল, কই, আপনার মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন।

কিন্তু ও যে ঘুমুচ্ছে এখন? উঠলে আলাপ করিয়ে দেব। তুমি বিকালবেলা এস।

রাজু একটু মনঃক্ষুণ্ণ। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বিকেলে? বেশ ডাকবেন কিন্তু। আমি এ বইটা ওকে দেবার জন্য এনেছিলাম।

বলার ভঙ্গী দেখে লীলা হেসে ফেলল। শ্যামবর্ণ ছেলেটি। আয়ত দুটি চোখ। দুষ্টুমি-ভরা।

বিকেল হবার অনেক আগেই রাজু এসে দাঁড়াল। খুকু জামাকাপড় পরে বাইরে যাবার জন্য তৈরী। রোজ বিকেলে হীরুর সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসে।

খুকু, এস তোমার সঙ্গে এর আলাপ করিয়ে দিই। লীলা খুকুকে কাছে ডাকল।

আমার নাম রাজু। এই নাও তোমার জন্য একটা বই এনেছি। রাজু হাত বাড়িয়ে খুকুর হাতে বইটা দিল।

লজ্জায় খুকুর দুটি চোখ বুজে এল। সমবয়সী বা বয়সের কাছাকাছি সঙ্গী এর আগে আর তার জোটে নি। ছেলেবেলার সঙ্গী ছিল সতী, সতী চলে যেতে খুকু আর একটু বড় হলে সঙ্গী হল নিস্তার। তারপর ভরতপুর ছাড়ার পর খুকু মাকে জড়িয়ে ধরল। ওর জগতে আর কেউ রইল না।

রাজু আর খুকু দুজনকে নিয়ে হীরু বেরোল। সিঁড়ির ধাপে চুপচাপ লীলা বসে রইল। অনেক দূরে কোথায় ঘণ্টার শব্দ। পশুপতিনাথের মন্দিরে আরতির সময় ঠিক এমনি স্বরে ঘণ্টা বাজত। কোমল একটানা শব্দ।

পিছনে আওয়াজ হতেই লীলার আবেশ কেটে গেল। মুখ ফিরিয়ে দেখল রাজুর মা নামছেন সিঁড়ি দিয়ে। খুব সাবধানে হাতল ধরে ধরে।

কি কর্তার অপেক্ষায় বসে আছেন বুঝি? রাজুর মা শেষ ধাপে পা দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন।

লীলা উঠে দাঁড়াল। সরে এসে বলল, উনি নেই এখানে।

নেই? কোথায় গেছেন? জানলার গরাদে ভর দিলেন রাজুর মা। লীলার সমস্ত মন বিষিয়ে উঠল। একই নাটকের পুনরাবৃত্তি! এক প্রশ্ন, এক মনগড়া উত্তর। কবে এর অবসান হবে? কবে? কিন্তু উপায় নেই। কিছু একটা বলতেই হবে। নয়তো রাজুর মার ঔৎসুক্য ঘুচবে না।

ব্যবসার জন্য নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়। এখন আছেন দিল্লীতে।

কিসের ব্যবসা? প্রশ্ন শেষ করে রাজুর মা এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেন, যদি বসবার কিছু একটা জায়গা পাওয়া যায়। এভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন?

লীলা ব্যাপারটা বুঝল। উঠে গিয়ে ঘরের মধ্যে থেকে একটা আসন নিয়ে এল।

আসন দেখে রাজুর মা হেসে উঠলেন, উহুঁ, ওতে সুবিধা হবে না। চেপে বসতে পারব না। দাঁড়ান আমি ব্যবস্থা করছি।

থেমে ওপর দিকে মুখ করে চেঁচালেন, ভেঙ্কটু, ভেঙ্কটু। সিঁড়ির চাতালে একটি মাদ্রাজী ছোকরা এসে দাঁড়াতেই তাকে তামিল ভাষায় কি বললেন। একটু পরে ছোকরাটি বেতের মোড়া এনে রাজুর মার সামনে রেখে দিল।

জুতসই হয়ে তার ওপর বসে রাজুর মা পুরনো প্রশ্নের খেই ধরলেন।

ব্যবসাটা কিসের?

অনুভবে লীলা বুঝতে পারল, সারা দেহের রক্ত মুখে এসে জমেছে। ঝিমঝিম করছে কপালের দুটো পাশ। আঁচলের কোণ দিয়ে ঠোঁট মুছে নিয়ে লীলা বলল, বাদ্যযন্ত্রের। সেতার, এসরাজ, মন্দিরা থেকে শুরু করে পিয়ানো অর্গ্যান পর্যন্ত।

তাই তো, তা ছাড়া আর কি। মনে মনে লীলা একবার ভেব নিল। দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাইজি আহরণ করে, জীবন কাটাচ্ছেন তাদের কামনা-কলুষ ছায়ায়, এমন একটা কথা সদ্য-আলাপ-হওয়া কাউকে কি বলা যায়! যন্ত্রী শেখরনাথ যন্ত্রের পশরা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আসরে আসরে গানের সঙ্গে সঙ্গত করার জন্য, সুরের সঙ্গে তাল দেবার চেষ্টায়। নিজের জীবনের তার ছিঁড়ে গুটিয়ে গেল, বেসুরো হ'ল হৃদয়ের মূর্ছনা, দৃকপাত নেই, একটু ভ্রূক্ষেপও নয়। পিছন ফিরে শেখরনাথ আর চাইবেন না।

তাই নাকি? রাজুর মার সুগোল চোখ দুটিতে বিস্ময় ফুটে উঠল। আপনার স্বামীকে দক্ষিণ ভারতে যেতে হয় না কখনো?

ঠিক নেই। দরকার পড়লে যেতে হয় বই কি?

বেশ এবার এলে—আমাকে বলবেন। আমার বাবার মস্ত দোকান মাদ্রাজ শহরের মাঝখানে। অবশ্য বাদ্যযন্ত্রের নয়, তেল আর ছোবড়ার। কিন্তু তিনি খুব মানী লোক। শহরের সকলে একডাকে চেনে। তিনি ইচ্ছা করলে অনেক অর্ডার পাইয়ে দিতে পারেন। মৃদঙ্গ, বীণা, বাঁশী, নানারকমের।

এবার এলে দেখা করিয়ে দেব আপনাদের সঙ্গে। লীলা ঘাড় নাড়ল।

রাজু কোথায় গেল? এতক্ষণে রাজুর মার খেয়াল হল। ছেলেটা নিচে নেমেছিল, কিন্তু গেল কোথায়?

আপনার ছেলে আর আমার মেয়েকে নিয়ে দারওয়ান বাইরে বেড়াতে গেছে। বেশীদূর নয়, কাছেই একটা ময়দান আছে, সেখানেই গিয়ে বসবে।

ও, রাজুর মা কি ভাবলেন, উনি আবার ওসব পছন্দ করেন না।

পছন্দ করেন না? কি সব পছন্দ করেন না?

এই ময়দানে তো শুধু ওরা নয়, আশপাশের ছেলেরাও আসবে। যার তার সঙ্গে রাজুকে মিশতে দিতে উনি মোটেই রাজী নন। আগে আমরা যেখানে ছিলাম, সেখানে বেছে বেছে রাজুর বন্ধু যোগাড় করে দিয়েছিলাম। সবাই অফিসারদের ছেলেমেয়ে। বাজে ছেলেদের কাছেই ঘেঁসতে দেই নি।

লীলার বুকটা টনটন করে উঠল। বাদ্যযন্ত্র ফেরি করে বেড়ায় যার বাপ শহর থেকে শহরে, তার মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের মেশাটা বোধ হয় ভাল চোখে দেখছেন না। অফিসারের মেয়ে না হলে যার তার সঙ্গে তার ছেলের বেড়ানো বোধ হয় সম্ভ্রমের পক্ষে হানিকর, আঘাত লাগে মর্যাদায়।

অনেকদিনের কথা, শেখরনাথের কাছেই শোনা। শেখরনাথের পিতামহ শিবনারায়ণ মল্লিক। পালকির সামনে এক নীলকর সায়েব পড়াতে পালকি থেকে নেমে তাকে খড়মপেটা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁকে শিকার শেখাবার জন্য ছিল এক খাস বিলিতি সায়েব। শিকারে যাবার সময়ে বন্দুক, কার্তুজ, সাজসরঞ্জাম সব বয়ে নিয়ে যেত। একবার শিবনারায়ণ মল্লিকের নিশানা করা এক বাঘকে গুলি করার অপরাধে ঘাড় ধরে সায়েবকে চণ্ডীডাঙার সীমানা পার করে দেওয়া হয়।

সে সব অনেক বছরের কথা। এত দিন পরে আজ রাজুর মাকে সে সব কথা বলা যায় না।

॥ তের ॥

কথাটা প্রথমে হীরুই বলল। খুকুকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল, অন্যদিন ফেরে সন্ধ্যার ঝোঁকে, কিন্তু সেদিন রোদ থাকতেই এসে দাঁড়াল।

মা!

লীলা বসেছিল দেয়ালে হেলান দিয়ে, হীরুর গলার স্বরে চমকে উঠে দাঁড়াল।

কি হীরু?

খুকুসোনার গাটা যেন ভাল ঠেকছে না।

হীরুর কথা শেষ হবার আগেই লীলা খুকুর গায়ে হাত দিয়ে দেখল। একটু গরম। চোখদুটোও বেশ লাল। সর্দির ভাবও রয়েছে। ঋতুপরিবর্তনের সময় এমন হয়ে থাকে। তবু সাবধানের মার নেই। লীলা মেয়েকে চাপাচুপি দিয়ে শুইয়ে রাখল।

ভোরের দিকে মেয়ের গায়ে হাত দিয়েই লীলা নিজের গালে হাত দিয়ে বসে পড়ল। হাত রাখা যায় না এমন তাপ। মেয়ে বেহুঁশ।

ওপরের ঘর তালা-দেওয়া। ছুটিতে রাজুরা মাদ্রাজ গিয়েছে। এক মাসের আগে ফিরবে এমন আশা কম। আশেপাশে ডাক্তারখানা অবশ্য আছে কিন্তু

কোন ডাক্তার ভাল কিছুই জানে না। এমনভাবে তা বলে চুপচাপও থাকা যায় না।

হীরুকে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে লীলা মেয়ের পাশে বসল।

জ্বরের ঘোরে মাঝে মাঝে খুকু চমকে উঠছে। কানের কাছে মুখ নিয়ে লীলা অস্ফুট গলায় বলল, খুকু, খুকু।

চেতনা নেই। একটা হাত দিয়ে খুকু সবলে লীলার শাড়ি আঁকড়ে ধরল।

মিনিট কুড়ি। ডাক্তার নিয়ে হীরু ফিরল। কোটপ্যাণ্ট-পরা প্রৌঢ় ভদ্রলোক। অনেকক্ষণ ধরে বসে খুকুর বুকপিঠ দেখলেন। চোখের কোল, জিভ। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে লীলার দিকে মুখ ফেরালেন, দুটো বুকেই সর্দি বসেছে। নিউ-মোনিয়া বলেই মনে হচ্ছে।

শাড়ির আঁচল দুহাতে জড়িয়ে লীলা সামনে দাঁড়িয়েছিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলল, কি হবে ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার হাসলেন, কি হবে ডাক্তারবাবুরা বলতে পারে না মা। দেখা যাক চিকিৎসা করে।

ডাক্তারের সঙ্গে হীরু বেরিয়ে যেতেই লীলা বাক্স খুলে বসল। শাড়ি আর জামা সরিয়ে বাক্সের তলা হাতড়ে দেখেই মাথায় হাত দিল। জমানো পুঁজি প্রায় নিঃশেষ। যা সামান্য কটা টাকা পড়ে আছে, বাড়িভাড়া আর এ মাসেই খরচ হয়ে যাবে। উপায় ! লীলা নিজের দেহের দিকে চোখ ফেরাল। সোনার শেষটুকরোও উধাও। হাতে শুধু এয়োতির লক্ষণ শাঁখা। প্রাণ থাকতে এ তো খোলা সম্ভব নয়। কিন্তু খুকুর চিকিৎসার খরচ ! পথ্য ! ডাক্তার-বিদায় !

বাক্সের ডালা বন্ধ করে লীলা ফিরে এল খুকুর বিছানায়।

দিন তিনেক। তারই মধ্যে বেশ কয়েক মুঠো টাকা খরচ হয়ে গেল।

অনেক হিসাব করে লীলা সরিয়ে-রাখা বাড়িভাড়ার টাকায় হাত দিল। গৌরীকে একটা চিঠি লিখে দিলেই হবে। খুকুর অসুখে এ মাসে সব খরচ হয়ে গেছে। সামনের মাসে একসঙ্গে দুমাসের ভাড়া দিয়ে দেবে। কিছু যেন মনে না করে গৌরী। অবস্থা বুঝে ক্ষমা করে ওকে। গৌরী তো কিছুই মনে করবে না, কিন্তু সামনের মাসেই বা অত টাকা লীলা কোথা থেকে জোগাড় করবে ! কার কাছে দাঁড়াবে হাত পেতে !

এখনও কতকগুলো ইনজেকশন! একরাশ ওষুধ! তার আগে ডাক্তার ভরসা দিতে পারছেন না। বিপদের যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। সারাদিনের মধ্যে কতটুকুই বা জ্ঞান হয় খুকুর। যেটুকু চোখ চায়, কেবল আবোল তাবোল কথা, অর্থহীন প্রলাপ। বিছানার সঙ্গে যেন মিশিয়ে গেছে মেয়েটা। কঙ্কালসার।

দুহাতে কপাল টিপে লীলা বসে রইল। ইজ্জত বাঁচাবার চেষ্টায় খুকুকে কোলে নিয়ে ভরতপুর ছেড়েছিল। মল্লিক-বাড়ির আওতা থেকে টেনে মেয়েকে এনে তুলেছিল নির্মম শহরে। নিজের মান বাঁচাতে আত্মজার প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কি অধিকার ছিল তার! ভরতপুরে কিছু হলে শেখরনাথ ছিলেন। মদ্যপ, বারনারী-আশ্রিত, উদাসীন কিন্তু তবু এমন একটা খবর কানে গেলে সুরার পাত্র হাত দিয়ে সরিয়ে চমকে উঠে বসতেন। যেমন করেই হোক মল্লিক-বাড়ির একমাত্র মেয়ের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতেন। নাই যদি কিছু করতেন শেখরনাথ, সুরার ফেনিল স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিতেন, দিগ্বিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে, সংসারের আর্তনাদ তাঁর বধির কানে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসত; তবু তো প্রজারা ছিল। ভরতপুর, গড়বিষ্ণুপুর আর চণ্ডীডাঙার অজস্র প্রজা। তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াত লীলা রুগ্নশীর্ণ মেয়েকে কোলে নিয়ে। পাট্টা হাতবদল করেছে, জমিদারী স্বত্বও আর নেই, কিন্তু জমিদার আর প্রজার সম্পর্ক বুঝি সীমিত দলিল হস্তান্তরের ওপর? শুধু একটা দস্তখতেই বংশানুক্রমিক সম্বন্ধ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার! কর দিতে হবে না বলে, দয়া মায়া, মমতা এসবও দেবার কোন অধিকার নেই!

কথাটা মনে হতেই লীলা হীরুকে ডাকল। হীরু বাইরের চাতালে দাঁড়িয়ে ছিল, লীলার ডাকে ভিতরে এল।

কি মা?

তোমাকে একটা কাজ করতে হবে হীরু।

ডাক্তারবাবুকে কি একবার খবর দিতে হবে মা?

না, হীরু, ডাক্তারবাবু বিকেলে আসবেন, সে কথা বলে গেছেন। তা নয়, তোমাকে একবার ভরতপুর যেতে হবে।

কথাগুলো ঠিক কানেই যায় নি হীরুর, কিংবা গেলেও ঠিকমত বুঝতে পারে নি। দু কানের পাশে হাত রেখে হীরু আরো একটু এগিয়ে এল। বলল, কোথায় যেতে হবে বললেন মা?

ভরতপুরে ছোটবাবুর কাছে। লীলা গলা একটু চড়াল।

ছোট হুজুরের কাছে? হীরু বিড়বিড় করে বলল।

হ্যাঁ হীরু, এ ছাড়া তো আর উপায়ও দেখছি না। আমার হাতে যা টাকা-পয়সা আছে তাতে বড় জোর আর দিন চার-পাঁচ ডাক্তার খরচ জোগাতে পারব। তারপর?

তারপর! হীরু মুখ তুলেই চোখ নামিয়ে নিল। লীলার দু চোখে জলের ধারা। দুটো ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠছে। হীরুর গলার মধ্যেও কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠল অব্যক্ত বেদনা। কবে শেষ হবে এ দুঃখ! বেদনার মেঘ কেটে আবার কবে সূর্যের ছটায় চারদিক আলোকিত হবে?

কিন্তু ছোট বাবু যদি ভরতপুরে না থাকেন মা? লোচন তো তাই বলেছিল।

সে তো অনেক দিনের কথা, এতদিনে ফিরেও তো আসতে পারেন। লীলার কণ্ঠে অতলে তলিয়ে যাওয়া মানুষের আকুতির ছোঁয়াচ। এমন একটা কথা তারও মনে এসেছিল। ভরতপুরে শেখরনাথ নেই। বাইজির পিছন পিছন এক আসর থেকে অন্য আসরেই শুধু নয়, এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছুটে বেড়াচ্ছেন। তবলা সঙ্গত করছেন, সারেঙ্গীর তার বেঁধে দিচ্ছেন, প্রয়োজনমত সুরার পাত্রও এগিয়ে দিচ্ছেন।

দেখা হলে কি বলব মা? হীরু খুব আস্তে উচ্চারণ করল কথাগুলো।

কি বলবে! কিছুই কি নেই বলবার? এতদিন শুধু বুকের ব্যথা চেপে মুখ লুকিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে মল্লিক-বাড়ির বৌরানী। যন্ত্রণায় নীল হয়েছে মুখ, কিন্তু কোন অভিযোগ নয়, অভিশাপ নয়, সামান্য শব্দও করে নি। আশা ছিল শেখরনাথের বুকে মুখ লুকিয়ে উজাড় করে দেবে জমানো কান্নার স্রোত, ব্যথার অংশ দেবে ভাগ করে। কিন্তু নীল আকাশের বুকে কোথায় লুকানো ছিল বজ্র। এক আঘাতে শুধু আশা-আকাঙ্ক্ষাই নয়, মানুষটাকেও ধূলিসাৎ করে দিল। প্রচণ্ডতম আঘাত এল শেখরনাথের কাছ থেকেই।

তবু বারবার তটের বুকে লুটিয়ে পড়া ফেনিল তরঙ্গের মতন, লীলার মনও ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় শেখরনাথের বুকে। কিন্তু লীলার ব্যথা-বেদনার কথা বলার

দিন ফুরোয় নি, তার আগে জানাতে হবে মল্লিক-বাড়ির একমাত্র দুহিতার রোগ-জর্জর কাহিনী। শেখরনাথ নিঃস্ব, সামান্য সম্বলও তাঁর নেই, তবু এমন একটা সময়ে জীবন পণ করে মানুষ, শেষ রক্তবিন্দুর পরিবর্তে আহরণ করে সন্তানের জীবনী-শক্তি।

দেখা হলে, লীলা একটু দম নিল, খুকুর কথাটা বুঝিয়ে ব'লো। কি অবস্থার মধ্যে রয়েছি আমরা, তাও ব'লো। কথা শেষ করে লীলা আঁচলে চোখ মুছল।

কিন্তু আপনি একলা থাকবেন মা?

ভগবান সঙ্গে রইলেন হীরু, একলা থাকব কেন। তুমি আর দেরি ক'রো না, কালই বেরিয়ে পড়।

হীরু বেরিয়ে যাবার পর ছটফট করে বেড়াল লীলা। কোথাও মন বসে না। অদৃশ্য দুটো হাত কেবল যেন ঠেলে নিয়ে বেড়ায়। খুকুর পাশে একটু বসেই লীলা উঠে পড়ে। নিশ্বাস নেবার কি প্রাণান্তকর চেষ্টা। ছোট্ট বুকটা ফুলে ফুলে ওঠে। রক্ত-রাঙা দুটি ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক। ডাক্তার পরীক্ষা করে মুখ বেঁকিয়েছেন। অবস্থা মোটেই ভালর দিকে নয়। আরো কোন বড় ডাক্তারকে দেখালেই ভাল হয়, আভাসে এমন কথাও বলেছেন। লীলা কোন উত্তর দেয় নি। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে পাষাণ-প্রতিমার মতন। বড় ডাক্তার ডাকা মানেই আরো কয়েক মুঠো টাকার খেলা। বাক্সের তলায় যা সামান্য কটা টাকা অবশিষ্ট আছে, বড় জোর আর দিন কয়েক। তারপর কি হবে লীলা জানে না, ভেবেও কোন কূলকিনারা পায় না।

একমাত্র ভরসা হীরু। দু হাত অঞ্জলি পেতে যদি দাঁড়াতে পারে ভরতপুরের ছোটবাবুর কাছে। সহানুভূতি জাগাতে পারে, অপত্য-স্নেহের ফল্গুধারা। যদি উঠে বসেন শেখরনাথ। এত বছরের ক্লান্তি, জড়তা, ঔদাসীন্য সব ছেড়ে আবার নীড়ের দিকে মুখ ফেরান। শুধু মুখ ফেরানো নয়, মন ফেরানো।

বাইরে একটু শব্দ হলেই লীলা চমকে উঠে বসে। এ-কদিন তো ঘুমের বালাই নেই। খুকুর পাশে মুড়িসুড়ি দিয়ে একটু ঝিমনো। সারাটা দিন বিশ্রামের একটু অবকাশ নেই। কোন রকমে নিজের জন্য কিছু রান্না করা, কোনদিন বা তারও খেয়াল থাকে না। এ-কদিন খুকু কেবল এপাশ ওপাশ করেছে। এত দুর্বল, জোরে চেঁচানোর পর্যন্ত শক্তি নেই।

কি হবে লীলার! যদি শেখরনাথ মুখ ফিরিয়ে থাকেন। খুকুও সরে যায় লীলার কাছ থেকে। তবে কি নিয়ে বাঁচবে লীলা, কাকে নিয়ে!

খুকুর পাশে লীলা বসেছিল, আচমকা দরজার শব্দ। এত রাত্রে ডাক্তার আসবার কথা নয়, তবে কে আবার এসে দাঁড়াল।

বাইরে দমকা হাওয়া। কিন্তু হাওয়ার শব্দ ছাপিয়ে শিকল নাড়ার আওয়াজ।

কে? লীলা গলা বাড়াল।

আমি, মা। হীরুর কণ্ঠ।

সেই মুহূর্তে মনে হল লীলার সমস্ত শরীরে বিদ্যুতের তীব্র দাহ। দুটো হাত বুকে চেপে দরজার ওপর হেলান দিয়ে দাঁড়াল। সত্য হোক ভগবান। লীলা এ-কদিন ধরে বুকের রক্ত দিয়ে যে কামনা লালন করেছে, তা সত্য হোক। হীরুর পিছনে পিছনে শেখরনাথ এসে দাঁড়াবেন। দীর্ঘ কাঠামো, অবসন্ন মুখের রেখা, ক্লান্ত দুটি ঠোঁটে ম্লান হাসি। আর ভয় থাকবে না লীলার। মল্লিক-বাড়ির ক্ষয়িষ্ণু আভিজাত্যের আওতা থেকে চুরি করে আনা মল্লিকবংশের উত্তরাধিকারিণীকে ছোটবাবুর হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত নিশ্বাস ফেলবে লীলা। তার দায়িত্ব শেষ।

মা। এবার হীরুর গলার আওয়াজ আরো জোর।

দরজা খুলে লীলা একপাশে সরে দাঁড়াল।

শুধু হীরু, পিছনে আর কেউ নয়।

ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা হল না মা। ক্লান্ত, অবসন্ন গলার স্বর। হীরু কথা শেষ করে মেঝের ওপর বসে পড়ল।

উনি বুঝি ওখানে নেই হীরু?

না মা, নেই। যে ব্যাপার শুনলাম তাতে কোনদিন যে ওখানে ফিরবেন, এমন আশা কম।

কি ব্যাপার? সব ভুলে লীলা মেঝেয় বসে পড়ল। হীরুর পাশাপাশি।

দত্তসায়েবের সঙ্গে ছোটবাবুর গোলমাল হয়েছে মা। কথা বলেই হীরু উঠে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে পা ফেলে খুকুর বিছানার পাশে গিয়ে বসল। জিজ্ঞাসা করল, খুকু এখন কেমন আছে মা?

মোটেই ভাল নেই হীরু। এ ডাক্তার প্রায় জবাব দিয়ে গেছেন, বলে গেছেন আরও বড় ডাক্তার দেখাতে। কিন্তু দত্তসায়েবের সঙ্গে কি গোলমাল হয়েছে বলছিলে?

মাথার পাগড়ি খুলে একটু হাওয়া খেল হীরু, চোখ ফিরিয়ে এদিক ওদিক চাইল। কথাটা কিভাবে শুরু করবে, তাই ভাবল বসে বসে। এমন একটা কথা।

হীরু।

মা।

কথাটা বলতে তুমি ইতস্তত করছ তা বেশ বুঝতে পেরেছি, কিন্তু এটুকু তো বুঝতে পার এমন অবস্থায় এসে আমরা দাঁড়িয়েছি, কোন রকম লুকোচুরির আর কোন মানে হয় না। কথাটা হয়তো মনিবানীর কাছে বলবার যোগ্য নয়, কিন্তু তুমি কোন দ্বিধা ক'রো না হীরু, এর চেয়েও সর্বনাশের কথা আমি শুনেছি তা তো জান? শুধু শোনা নয়, নিজের সর্বনাশের চেহারা নিজের চোখেও দেখেছি।

কিছুক্ষণ হীরু একটু মাথা নিচু করে রইল তারপর ধীর গলায় বলল, গোলমাল বাইজিকে নিয়েই শুরু হয়।

কোন বাইজি?

যাকে দত্তভিলায় আপনি দেখেছেন মা।

লীলা আর কিছু বলল না। দু হাঁটুর ওপর মুখ রেখে বসে রইল।

হীরু মুখটা ঘুরিয়ে নিল। লীলার দিকে মুখ ফিরিয়ে কিছুতেই বলতে পারবে না এসব কথা।

দত্তসায়েব বাইজিকে বুঝি মাসোহারা দিতেন। কেন তা জানি না।

কেন তা আমি জানি হীরু, তুমি বলে যাও। কথার ফাঁকে লীলা অল্প হাসল। প্রাণহীন হাসি, ব্যথার অন্ত নেই।

মাসোহারা বন্ধ করতেই বাইজি চটে গেল। ছোটবাবুকে যা মুখে আসে তাই বলে গালি দিতে শুরু করল। তাঁর মুখের ওপর দত্তভিলার গেট বন্ধ করে দিল। ছোটবাবু কাছারিতে দত্তসায়েবের সঙ্গে দেখা করলেন। সেখানেও অপমানের একশেষ। দত্তসায়েব আপনার কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

আমার কথা?

হ্যাঁ মা, দত্তসায়েবের ধারণা ছোটবাবু আপনাকে সরিয়ে দিয়েছেন ভরতপুর থেকে। দত্তসায়েবের কথায় ছোটবাবুর খেয়াল হল। তিনি বললেন, কেন অন্তঃপুরের বৌ আবার যাবে কোথায়? মল্লিক-বাড়িতে আছে। দত্তসায়েব মুখ টিপে হাসলেন, বললেন এই বুদ্ধি নিয়ে আপনি প্রজা ঠ্যাঙাতে পারেন, বুকের রক্ত নিংড়ে নিতে পারেন তাদের, কিন্তু আমায় ভোলাতে পারবেন না। মল্লিক-বাড়ি আর মল্লিক-বাড়ি নেই, সেখানে আমার স্কুল হয়েছে। মার নামে প্রতিষ্ঠিত স্কুল। এ-কমাস আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, তাঁকে। আমার এলাকার প্রত্যেকটি বাড়ি খুঁজেছি, যদি কোন ভক্ত প্রজা তাঁকে লুকিয়ে রেখে থাকে। কিন্তু বুঝেছি তাঁকে আপনি সরিয়ে নিয়ে গেছেন আমার এলাকা থেকে।

তাঁকে এত খোঁজ করার কারণ?

সম্পত্তি হাতবদল করার সঙ্গে সঙ্গে জমিদারি বুদ্ধি এমন ভোঁতা হয়ে যাবে তা কিন্তু ভাবি নি। আপনি ফুর্তিবাজ লোক। বাইজি আর মদে আকণ্ঠ ডুবে রয়েছেন। উপভোগ করছেন জীবন। কাজেই তিনিই বা মল্লিক-বাড়ির অন্ধকার কোণে মুখ লুকিয়ে বসে থাকবেন এ কেমন কথা। মল্লিকবংশের নিভে-আসা সমারোহের রোসনাই দেখতে দেখতে ক্লান্তি আসা তো স্বাভাবিক! তাই ভেবেছিলাম তাঁকে খুঁজে নতুন জীবনের সন্ধান দেব। যে জীবনে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অনন্ত সম্ভোগের জীবন।

এইখানে ছোটবাবু ক্ষেপে উঠলেন মা। হাতের কাছে পেতলের ফুলদানি ছিল, তাই ছুঁড়লেন দত্তসায়েবের দিকে।

দত্তসায়েবকে মারলেন ফুলদানি ছুঁড়ে? তারপর হীরু?

হাতখানেক দূরে খুকুর রোগশয্যা, নিজের অসহায় অবস্থা, সব ভুলে লীলা চীৎকার করে উঠল। দু কান জুড়িয়ে গেল। দিনের পর দিন ধরে এমন কথা শুনতে একটু ক্লান্তি আসবে না তার, সামান্য নিশ্চেষ্টতা নয়।

দত্তসায়েবের লাগে নি মা। পাশে-দাঁড়ানো মোসায়েবেরা ধরে ফেলল ছোট বাবুকে। ফুলদানি কাঠের আলমারির ওপর গিয়ে পড়ল। ছোটবাবুর কি গর্জন। চার-পাঁচজন লোক কিছুতেই তাঁকে ধরে রাখতে পারল না। সবাই বলছে হাতের কাছে বন্দুক থাকলে নির্ঘাত সেদিন ভয়ঙ্কর রকম কিছু একটা হয়ে যেত। ছোটবাবুর এ চেহারার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে মা। বনেজঙ্গলে

ওঁর সঙ্গে অনেকবার তো ঘুরেছি। শিকার দেখলে একেবারে পাগল হয়ে যেতেন। গুলি না ছোঁড়া পর্যন্ত বিরাম ছিল না। অবিশ্রাম ছটফটানি।

এ কথা আগেও শুনেছে লীলা। শেখরনাথই বলেছেন। জানোয়ারের বুকের রক্ত না দেখা পর্যন্ত আহার-নিদ্রা ঘুচে যেত। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত গাছে মাচা বেঁধে কাটাতেন।

ঠিক তেমনিই হয়তো আছেন শেখরনাথ। একটু বদলান নি। আঘাতে ঘুমন্ত রক্তে তেমনি বুঝি জোয়ার আসে। বাইজির নূপুর-নিক্কনের স্বরে, সুরার মদির উচ্ছ্বাসে কিছুই নষ্ট হয় নি। যদি ঠিক তেমনিই থাকেন শেখরনাথ, তবে জানোয়ারের বুকের রক্ত না দেখা পর্যন্ত কিছুতেই নিশ্চিন্ত হবেন না।

তারপর? দু চোখে কৌতূহলের দীপ্তি। নতুন এক রূপকথা যেন শুনছে লীলা।

তারপর ছোটবাবু মল্লিক-বাড়িতে ফিরে এলেন।

মল্লিক-বাড়িতে?

হ্যাঁ মা। মল্লিক-বাড়ি অবশ্য আর নেই। দত্তসায়েবের মেয়ে-স্কুল হয়েছে সেখানে। কিন্তু ছোট একটা ঘরে নিস্তার এখনও আছে। ছোট ছোট মেয়েদের সে-ই স্কুল থেকে নিয়ে আসে। তার থাকবার জন্য ছোট একটা কুঠুরির বন্দোবস্ত হয়েছে। ছোটবাবু নিস্তারকে ডেকে পাঠালেন। বাকি কথাগুলো আমি নিস্তারের কাছেই শুনেছি।

নিস্তার বলল, হীরু, ছোটবাবুর চোখে জল। সব শুনে দুহাত দিয়ে বুক চেপে দাওয়ার ওপর বসে পড়লেন। অনেকক্ষণ বসে রইলেন সেই ভাবে, তারপর একসময়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিস্তারকে বললেন, আমি একটু ঘরের মধ্যে যাব। আপনার ফেলে-দেওয়া জিনিসগুলো নিস্তারই নিজের ঘরের মধ্যে জমা করে রেখেছিল। ছোটবাবু ঘুরে ঘুরে সব দেখলেন। আলমারি পাল্লা খুলে, বাক্সের ডালা সরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখে দেখে বেড়ালেন, তারপর বেরিয়ে যাবার সময় দুটো জিনিস তুলে নিয়ে গেলেন।

দুটো জিনিস?

হ্যাঁ মা। শুধু দুটো জিনিস তুলে নিয়ে গেলেন। নিস্তার তাই আমাকে বলল।

কি দুটো জিনিস হীরু? অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও লীলার গলা কেঁপে কেঁপে উঠল।

ছোটবাবুর বেহালার বাক্স আর—বলতে গিয়েও হীরু ইতস্তত করে থেমে গেল।

কি আর একটা জিনিস যা মুখ ফুটে বলতে এত দ্বিধা হীরুর, এত সঙ্কোচ!

আর একটা?

হীরু নিজের পায়ের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলল, আর আপনাদের বিয়ের পরে তোলা ফটোটা মা।

চোখের সামনে তরল অন্ধকারের স্রোত। দু কানে অবিশ্রান্ত ভ্রমর-গুঞ্জন। লীলা বসেছিল তবুও মেঝে ধরে টাল সামলাল।

তারপর থেকে ছোটবাবুকে ভরতপুরে আর কেউ দেখে নি।

এতক্ষণ পরে, এই প্রথম কথাটা লীলার মনে এল। ছোটবাবুর দেখা যদি না পেয়ে থাকে তাহলে কি হবে খুকুর চিকিৎসার? কোথা থেকে যোগাড় হবে অর্থ। আর কার কাছে দাঁড়াবে হাত পেতে?

মুখ ফুটে লীলা মনের কথাটা বলেই ফেলল, তাহলে খুকুকে বড় ডাক্তার দেখাবার কি হবে হীরু?

কিছু আমি যোগাড় করেছি, খুব সামান্য কিছু। কথার সঙ্গে সঙ্গে হীরু কোমর থেকে লম্বা কাপড়ের থলে বের করে লীলার হাতে দিল, গোটা পঞ্চাশেক টাকা আছে মা, এর বেশী আর সুবিধা হল না।

অনটনের সংসারে, লীলার বর্তমান অবস্থায় এই পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ মোহরের সামিল। কিন্তু এ-টাকাই বা হীরু কোথা থেকে সংগ্রহ করল। দত্তসায়েবের কাছ থেকে নিশ্চয় নয়।

এ-টাকা তুমি কোথা থেকে যোগাড় করলে হীরু? এমন কারুর কাছে হাত পেতে দাঁড়াও নি তো—

লীলার কথা শেষ করার আগেই হীরু বুঝতে পারল। সবেগে ঘাড় নেড়ে বলল, না মা, কারুর কাছে আমি হাত পাতিনি। নিজের খুব সামান্য জিনিস-পত্রই পড়েছিল, চেষ্টা করেও এর বেশী দাম পেলাম না।

দু-এক মিনিট। লীলা একটি কথাও বলতে পারল না। এমনি করে ওদের জন্য সর্বস্বান্ত হল হীরু। নিজের বলতে কিছুই রাখল না।

তোমার ঋণ কোনদিনই শোধ করতে পারব না হীরু।

অমন কথা বলবেন না মা। শুনলেও আমার পাপ হবে। হীরু সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। লীলার পা ছুঁয়ে।

ভোরের দিকেই ডাক্তার এসে দাঁড়ালেন। অনেকক্ষণ ধরে খুকুর বুকপিঠ পরীক্ষা করলেন, তারপর হাত নেড়ে লীলাকে বাইরে ডাকলেন।

আমি বড় ভাল বুঝছি না। অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে। আপনারা বরং অন্য কাউকেই দেখান।

অন্য কাউকে? জলভরা ছলছল চোখ মেলে লীলা চেয়ে রইল।

কাকে দেখাব আপনিই বলুন?

একবার ডাক্তার বাসুকে দেখাতে পারলে হত। এসব কেসে তাঁর খুব নাম। তবে তাঁকে পাওয়া মুশকিল, আর ফিও একটু বেশী।

এ-কদিনে ঘরদোরের অবস্থা আর মানুষগুলোর সাজ-পোশাক দেখে' বুঝতে ডাক্তারের কিছু বাকি নেই। পরিমিত সামর্থ্য। কোন রকমে সংসারযাত্রা নির্বাহ। মাপাজোপা, তার একটু বেশী হলেই সব বানচাল। নামী ডাক্তারের রসদ জোগাবার মতন অবস্থা নয়।

ফি বেশী! লীলা ফিসফিসিয়ে বলল, কত টাকা?

ডাক্তার স্টেথসকোপটা গলায় জড়িয়ে নিলেন, একবার মনিবন্ধে আঁটা ঘড়ির দিকে নজর দিলেন, তারপর বললেন, বত্রিশ টাকা।

বত্রিশ! লীলার গলার স্বরে মনে হল আচমকা যেন তার আগুনে হাত ঠেকে গেছে।

হ্যাঁ। উনি কোথাও এ টাকা কমান না। চৌকাঠ পার হতে হতে ডাক্তার ফিরে দাঁড়ালেন, যদি ডাকা প্রয়োজন মনে করেন, আজ বিকেলের মধ্যে খবর দেবেন, ওঁর সঙ্গে টেলিফোন করে ঠিকঠাক করে রাখতে হবে।

ডাক্তার চলে যেতেই লীলা হীরুর সামনে এসে দাঁড়াল, সব শুনলে তো হীরু?

শুনলাম মা।

এখন উপায়?

আজ বিকেলে গিয়ে ডাক্তারবাবুকে একবার জানিয়ে আসি, যাতে কাল সকালেই বড় ডাক্তারকে খবর দিতে পারেন।

কিন্তু বড় ডাক্তারের ফিয়ের কথা তো শুনলে?

একটা ফি দেওয়ার মতন টাকা তো আছে মা। পরের কথা পরে ভাবা যাবে।

সারাটা রাত বিনিদ্র কাটল। মাঝে মাঝে খুকুর দেহ হিমশীতল। নিশ্বাস মৃদু, মুখ যন্ত্রণায় নীল। চীৎকার করে লীলা কেঁদে উঠেছে। ছুটে গিয়ে দাঁড়িয়েছে হীরুর সামনে। কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। অসহায় দুটি নরনারী মৃত্যুর বিকৃত মুখভঙ্গী শুধু দেখেছে, জীবন-মরণের লুকোচুরি খেলা।

ভোর হতেই হীরু ছুটল ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তার বাসু এলেন প্রায় নটায়। অনেক সময় নিয়ে খুকুকে দেখলেন। মাঝে মাঝে ঘোমটা-টানা কাছে-দাঁড়ানো লীলাকে খুঁটিনাটি প্রশ্ন। তারপর কাগজ টেনে খসখস করে লিখলেন কলম দিয়ে। রাজসূয় চিকিৎসার ব্যবস্থা।

ডাক্তার সরে আসতে লীলা শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, ডাক্তারবাবু, খুকু বাঁচবে তো?

কেন বাঁচবে না মা। ডাক্তার আশ্বাস দিলেন, অনেকরকম নতুন ওষুধ বেরিয়েছে, দামী ইনজেকশন, ভয় পাবার কিছু নেই।

বাঁচবে খুকু! লীলার মনে হল অফুরন্ত আলো-বাতাসে আবার ছোট ঘর ভরে উঠেছে। কোথাও অন্ধকার নেই। একবার মনে হল ডাক্তার বাসুর পা জড়িয়ে ধরে। চীৎকার করে বলে, আপনি বাঁচিয়ে দিন খুকুকে। সব কিছুর বিনিময়ে ওর পরমায়ু দিন।

লীলার খেয়াল হল ডাক্তার বাসু চলে যাবার পর। প্রকাণ্ড ফর্দ। ওষুধ, ইনজেকশন, নানা রকমের।

হীরু এটা একবার কাছাকাছি কোন ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়ে দেখ তো, আমার তো মনে হচ্ছে অনেক টাকা লাগবে।

হীরু বেরিয়ে যাবার পর আবার লীলা বাক্সের ডালা খুলে বসল। সামান্য পুঁজি। বার দুয়েক ডাক্তার বাসুর ফি দেওয়া চলবে, কিন্তু কতবার ডাক্তার বাসু আসবেন তা কি ঠিক আছে। আজ বিকেলেই একবার আসবেন, তার মধ্যে ওষুধপত্র সব ঠিক করে রাখতে হবে।

একবার লীলা ভাবল গৌরীকে একটা চিঠি লিখে কিছু চাইবে। কিন্তু চিঠি পেতে, টাকা পাঠাতে অনেক দেরি হবে। খুকুর শরীরের যা অবস্থা, প্রত্যেকটি

মুহূর্ত মূল্যবান। অপচয় করার মত বাড়তি সময় হাতে নেই। তাছাড়া এ মাসের বাড়িভাড়া এখনও পাঠিয়ে উঠতে পারে নি। মানুষের কাছে সুযোগ নেবারও একটা সীমা থাকা প্রয়োজন।

হীরুর ডাকে চমক ভাঙল।

মা।

কি হীরু?

অনেক টাকা লাগবে। সব দামী দামী ওষুধ আর ইন্‌জেকশন। দোকানে হিসাব করে বলল এই প্রেসক্রিপশনেই প্রায় সত্তর টাকার মতন পড়বে।

সত্তর টাকা!

হ্যাঁ মা।

উপায়! লীলার গলা কান্না-জড়ানো।

হীরু এদিক-ওদিক চাইল। শক্ত দেয়াল, তার চেয়েও শক্ত ছাদ, কঠিন মেঝে। কোথাও আশার সামান্য আলোও নেই।

বিকেলের মধ্যে সব যোগাড় করে রাখতে হবে নয়তো ডাক্তার বাসু ফিরে যাবেন, আর ডাক্তার বাসু ফিরে যাওয়া মানেই—লীলা আঁচলে মুখ ঢাকল। রোগীর ঘরে কাঁদতে নেই, তাই রান্নাঘরে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝের ওপর। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে নয়, কান্নার বন্যায় নিজেকে ভাসিয়ে দিল।

দু হাতে কান চেপে হীরু বাইরে চলে এল। কোন উপায় নেই। ঝাঁপিয়ে পড়া যায় না কোন পথচারীর ওপরে। তার সর্বস্ব অপহরণ করা যায় না। মল্লিক-বাড়ির একমাত্র কন্যা এইভাবে বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করবে আর মল্লিকবংশের অন্নভোজী দাস তাই দেখবে নিশ্চেষ্ট হয়ে। কোন উপকার করতে পারবে না। রুদ্ধ আক্রোশে সজোরে নিজের বুক চাপড়াল। অসহায় বন্দী পশুর মতন আর্তনাদ-সম্বল!

একটু ঝিমুনি এসেছিল হীরুর, আচমকা পায়ের শব্দে চমকে চোখ চাইল। চেয়েই অবাক!

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আটপৌরে শাড়ি লীলা অঙ্গে জড়িয়েছে। সযত্নে চুল আঁচড়েছে। মনে হল বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত।

একবার দেখেই হীরু দাঁড়িয়ে উঠল। বাড়িতে মরণাপন্ন মেয়ে, এমন সময়

সাজগোজ করে কোথায় চলেছেন? মাথার ঠিক আছে তো? কদিন ধরে অনাহার, অনিদ্রা, তার ওপর প্রাণান্তকর চিন্তা। মানুষের পাগল না হওয়াই আশ্চর্য।

আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে পারবে হীরু, আমি একটু বেরোব।

কিন্তু খুকুর এই অবস্থায়?

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই আমি ফিরে আসব, তুমি একটু খুকুর কাছে বসবে। ওষুধ আর ইনজেকশনগুলো কিনেই আমি ফিরব।

সে কি, এরই মধ্যে এত টাকা কোথা থেকে জোগাড় হল। কথাটা জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও হীরু কি ভেবে থেমে গেল। মনিবানীর সঙ্গে টাকা-পয়সার কথা বলতে সঙ্কোচের প্রাচীর, লজ্জার বাধা। এমন দুরবস্থাতেও সে বাধা পার হওয়া যায় না।

আর দেরি ক'রো না হীরু। উঠে একটা ট্যাক্সির বন্দোবস্ত কর।

হীরু ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে দেখল খুকুর মাথাটা কোলে নিয়ে লীলা নিস্পন্দ হয়ে বসে আছে। সযত্নে আঁচড়ানো চুল এলোমেলো। দু চোখে অশ্রুর ধারা।

গাড়ি এনেছি মা।

লীলা সাবধানে মেয়ের মাথা কোল থেকে নামিয়ে দিল। চৌকাঠ পার হবার আগে আর একবার ফিরে দেখল খুকুর দিকে। তারপর দু হাত দিয়ে অগোছাল চুলগুলো ঠিক করে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠল।

ড্রাইভারকে হোটেলের নামটা বলবার সময় লীলা নিজেই চমকে উঠল। অনেকক্ষণ থেকে মনে মনে নাম আর গলিটা ঠিক করেছিল কিন্তু উচ্চারণ করার সময় সব গোলমাল হয়ে গেল। ড্রাইভার ফিরে চাইতে আবার লীলা আস্তে আস্তে হোটেলের নামটা বলল। গলির পাত্তাও দিল।

হোটেলের সামনে ট্যাক্সি থামবার পর কিছুক্ষণ লীলা নামতে পারল না। সমস্ত শরীর থরথরিয়ে কাঁপছে। পথে পা রাখতে গেলেই ছিটকে পড়বে মাটিতে।

ভাড়া মিটিয়ে লীলা নেমে দাঁড়াল। দুপুরের দিকে সব নিঝুম। কেউ কোথাও নেই। সিঁড়ি দিয়ে দুতলায় উঠে লীলা একটু দাঁড়াল। যদি ডিরেক্টর না থাকেন। স্যুটিংয়ের ব্যাপারে কোথায় কখন ঘুরে বেড়ান ঠিক আছে। তাহলে কি হবে! কি করবে লীলা!

মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। এসব ভাবতেও লীলার আর ভাল লাগল না। সারা পৃথিবী চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলে, ভাবনার আর কোন অবকাশ থাকে না।

হঠাৎ দরজায় খুট করে শব্দ। প্যান্ট আর সবুজ সোয়েটারে নিজেকে সাজিয়ে ডিরেক্টর বাইরে এসে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ পলক পড়ল না। চোখ থেকে সান-গ্লাশ খুলে এগিয়ে এসে দেখলেন লীলার আপাদমস্তক তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন, বাই জোভ! আপনি এখানে?

দাঁতে ঠোঁট চেপে লীলা নিজেকে সামলাল। সব যেন দুলছে। সিঁড়ির রেলিং, পাম গাছের টব, সামনে দাঁড়ানো মানুষটা। কিন্তু এভাবে লজ্জা আর সঙ্কোচে নষ্ট করার মতন সময় মোটেই নেই। বিকেলে ডাক্তার বাসু আসবেন, তার আগেই ওষুধ আর ইনজেকশন ঠিক রাখতে হবে।

আপনার একটু সময় হবে? লীলা থেমে থেমে বলল।

আপনার জন্য আমার অফুরন্ত সময়। আসুন। ঘুরে ডিরেক্টর নিজের কামরার দরজা খুলে দাঁড়ালেন। লীলা আস্তে আস্তে চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ডিরেক্টর বিছানার ওপর বসলেন। বালিশে হেলান দিয়ে।

আপনাকে বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আপনি কি অসুস্থ?

লীলা মাথা নাড়ল, তারপর টেবিলের ওপর দুটো হাত রেখে একটু একটু করে সব বলল। খুকুর অসুখের কথা, নিজের অসহায় অবস্থা। আজ বিকেলের মধ্যে ওষুধপত্র জোগাড় করতে না পারলে, সারাজীবনের মতন খুকুকে হারাতে হবে সেকথা বলতে গিয়ে লীলা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

এ শহরে আমার জানাশোনা আর কেউ নেই। গৌরীরাও এখানে নেই, ওরা থাকলে কিছু একটা বন্দোবস্ত হয়ে যেত।

ডিরেক্টর খুব মন দিয়ে সব শুনলেন। লীলার দিক থেকে একবারও চোখ না ফিরিয়ে।

ওরই ফাঁকে দু-তিনবারের চেষ্টায় পাইপটা ধরিয়ে নিলেন। লীলার কথা শেষ হতে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন টেবিলের কাছাকাছি।

সব সময় আপনি আমাকে বন্ধু বলে মনে করতে পারেন, আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব, সেটুকু করতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত জানবেন। তবে একটা কথা

আপনাকে জানানো দরকার। আপনার আমার মধ্যে কোন ভুল বোঝাবুঝি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

বেতের মোড়া টেনে নিয়ে ডিরেক্টর লীলার সামনাসামনি বসলেন।

আমি নিজে অর্থবান নই। প্রডিউসারের টাকাই নাড়াচাড়া করি, এ টাকা আমি লোকজনকে দিতে পারি বিশেষ প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে। নিজে যা আমি উপার্জন করেছি, এক কপর্দকও সঞ্চয় করার চেষ্টা করি নি। একথা স্টুডিয়ো মহলে কারো অজানা নেই। আপনাকে আগেও বলেছি লীলাদেবী, পর্দায় নামতে সাহায্য আপনাকে আমি করতে পারি। আপনার রূপ আছে, যৌবন আছে, অভিনয় করার শক্তি থাকাও বিচিত্র নয়, যদি আপনি রাজী থাকেন, আজই আমাদের অফিসে চলুন, শুধু একটা কন্ট্রাক্ট সই, তারপরে অর্থের দিকটা আপনাকে খুব ভাবতে হবে এমন মনে হয় না।

ডিরেক্টর এখানে একটু থামলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন লীলাকে। ব্যাধের শাণিত দৃষ্টি। রজ্জুজালে বাঁধা পড়েছে হরিণী। ছটফটানি কমে গেছে, ক্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। অবসাদ নামবে দেহে আর মনে। নিজের ইচ্ছাশক্তি বলে কিছু থাকবে না। তখন আর কোন অসুবিধা নেই। দৃঢ়তর হবে রজ্জুর বাঁধন। যেখানে খুশি শিকারকে অপসারিত করা যাবে।

এখানে আসবার আগে এমন একটা সম্ভাবনার কথা লীলা ভেবেছে। বরং এ কথাটা মোটেই মনে করে আসে নি যে ডিরেক্টারের কাছে হাত পেতে দাঁড়ালেই অর্থ সাহায্য জুটে যাবে। তেমন সাহায্য তার কাম্যও নয়। চুল-চেরা হিসাব, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে দেখবার মতন মন নেই লীলার। বিরাট একটা সর্বনাশ বাঁচাবার জন্য যদি নিজেকে আহুতি দিতে হয়, তাই দিতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

আপনার যা প্রয়োজন হয় করুন। আমার অবস্থা সবই আপনাকে খুলে বলেছি।

ঠিক আছে। অবশ্য আজ টাকা নিলে এখনি যে আপনাকে পর্দায় অভিনয় করতে হবে এমন নয়। উপস্থিত আমাদের একটা ছবি উঠছে, সেটা শেষ হতে আরো মাস ছয়েক, তবে এ-ছমাস আপনি টাকা মাস মাস পেয়ে যাবেন।

ডিরেক্টরের পিছন পিছন সিঁড়ি দিয়ে লীলা নেমে এল। রাস্তা থেকে ট্যাক্সি

থামিয়ে দুজনে পাশাপাশি বসল। তারপর বড় এক অফিস ঘর। জন তিনেক বাঙালী ছাড়াও দুজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক। ডিরেক্টরই কথাবার্তা সব বললেন, শেষকালে একটা কাগজে শুধু সই করতে হল লীলাকে। হাতটা অসম্ভব কাঁপছে। দুবার আঁকাবাঁকা হয়ে গেল অক্ষর। কালি ছিটকে পড়ল। তবু পড়া গেল। লীলা দেবী।

চেক নয়, ডিরেক্টরই আপত্তি করলেন। এক মুঠো টাকা লীলা আঁচলে বেঁধে নিল।

রাস্তায় নেমে ডিরেক্টর বললেন, ডাক্তার বাসু ছাড়া যদি আপনার আপত্তি না থাকে, মেজর চৌধুরীকে নিয়ে যেতে পারি। খুব নামকরা ডাক্তার।

লীলা ঘাড় নাড়ল। ঠিক আছে, যা ভাল মনে করেন, তাই করুন।

শুধু মেজর চৌধুরীই নয়, দোকানে নেমে নেমে ডিরেক্টর ওষুধ আর ইনজেকশনগুলোও কিনে নিলেন। টাকা অবশ্য লীলাই দিল।

হীরু খুকুর পাশেই বসেছিল, মোটরের শব্দে বাইরে এসেই অবাক। ডিরেক্টর আর লীলাকে কোনদিন পাশাপাশি নামতে দেখবে এ বোধ হয় কল্পনাও করে নি। সঙ্গে অবশ্য মেজর চৌধুরীও ছিলেন।

তারপর দিন পনের প্রায় যমে-মানুষে টানাটানি। ইনজেকশনে ইনজেকশনে খুকুর শরীরের কোন অংশ বাদ রইল না। দামী সব ওষুধ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে মেজর চৌধুরী আর ডাক্তার বাসুর পরামর্শ। ওষুধ বদলে নতুন ওষুধ। জানাল খুলে খুলে চিকিৎসার আধুনিকতম প্রক্রিয়া।

পনের দিনের পর ডাক্তার বাসু আশ্বাস দিলেন, আর ভয় নেই মা। মেয়ের ফাঁড়া কেটে গেছে।

দরজায় হেলান দিয়ে লীলা শুনল। মেয়ের ফাঁড়া এতদিনে কাটল, এবার মায়ের ফাঁড়া শুরু। এর মধ্যে সপ্তাহে একবার করে ডিরেক্টর এসেছেন। খুকুর খোঁজ-খবর নিয়েছেন। ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনা। লীলার সঙ্গে খুব অল্প কথা বলেছেন। শরীরের খবর কিংবা শুধু স্বল্প হাসি।

বুঝতে লীলার একটুও অসুবিধা হয় নি। যোগাযোগ ঠিক রেখেছেন ডিরেক্টর, নয় তো এ কটা টাকা নিজের তহবিল থেকে দেওয়া তাঁর পক্ষে খুব অসাধ্য ছিল না, মুখে তিনি যাই বলুন না। কিন্তু এমন একটা সুযোগ বৃথা যেতে

দিতে চান নি। লীলার অসহায়তার সুযোগের পুরো মাত্রায় তিনি সদ্ব্যবহার করেছেন।

কায়া না হোক তার ছায়াকে বন্দী করার সব আয়োজন সম্পূর্ণ। এ চুক্তি থেকে বাইরে যাবার কোন ক্ষমতা নেই লীলার। দিনের পর দিন তিল তিল করে ঋণ পরিশোধের মহড়া চলবে। হয়তো জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

॥ চৌদ্দ ॥

সেদিন ডিরেক্টর খুব ভোরের দিকে এসে দাঁড়ালেন।

শুনুন, এক মিনিট। ডিরেক্টর গলা ঝাড়লেন।

লীলা কাছে যেতেই হাতের চামড়ার ব্যাগ খুলে গোটানো কাগজ বের করে লীলার দিকে এগিয়ে দিলেন, মাস খানেকের মধ্যেই আমরা নতুন বই নামাচ্ছি। আপনি এগুলো সময়মত পড়ে রাখুন। এর পরে এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব।

আলোচনা? খুব নিস্তেজ গলার স্বর লীলার।

দুটি ভাল চরিত্র আছে অবশ্য নায়িকা ছাড়া। যেটি আপনার পছন্দ হবে সেটার সম্বন্ধেই আপনার সঙ্গে কথা বলব। ডিরেক্টর চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের মধ্যে এলেন, কেমন আছ খুকু?

খুকু ম্লান হাসল। এ-কদিনে ডিরেক্টরের সঙ্গে খুকুর কিছু কিছু আলাপ হয়েছে।

আচ্ছা আমি চলি লীলাদেবী। দিন দুয়েকের জন্য বাইরে যাচ্ছি। পরশু বিকেল নাগাদ আসব।

ডিরেক্টর চলে যাবার পর অনেকক্ষণ লীলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কাগজের বাণ্ডিল নয়, ডিরেক্টর যেন জলন্ত অঙ্গারই গুঁজে দিয়ে গেলেন তার হাতে। হাতের চামড়াই শুধু পুড়ে যাচ্ছে না, অসহ্য দাহ বুকের মাঝখানে। আস্তে আস্তে কাগজগুলো লীলা তাকের ওপর রেখে দিল।

কিসের কাগজ মা? থেমে থেমে আস্তে আস্তে খুকু জিজ্ঞাসা করল।

নিজেকে বিক্রি করার দলিল, মুখে এলেও মেয়েকে লীলা এমন একটা

কথা বলতে পারল না। কিন্তু আজই না হয় বলতে পারল না, কথাটা কি পারবে লুকিয়ে রাখতে? আরো বড় হয়ে খুকু সব বুঝতে শিখবে, চিনতে পারবে কঠোর পৃথিবীকে। সিনেমা-অভিনেত্রীর মেয়ে—এই পরিচয়, এমন একটা পরিচয় বুকে নিয়ে তাকে ঘোরাফেরা করতে হবে। হয়তো দারুণ ঘৃণা, অপরিসীম ঔদাসীন্য নিয়ে সরে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে মায়ের সান্নিধ্য থেকে। শুধু লীলার অন্ধকার দিকটাই দেখবে, জানবেও না খুকুর পরমায়ু ভিক্ষা করতে গিয়েই অঞ্জলি পেতে এই নীল বিষ সে নিয়েছে।

দু চোখে জল আসতেই লীলা সরে দাঁড়াল।

কিন্তু আর কোন উপায় নেই? মুক্তির কোন পথ! এমন কেউ নেই পৃথিবীতে যে একমুঠো টাকা দিয়ে ঋণমুক্ত করতে পারে লীলাকে। হয়তো আছে, কিন্তু অর্থের বদলে নতুন কোন প্রতিশ্রুতি দিতে হবে লীলাকে। আগুন থেকে বাঁচতে গিয়ে ঝাঁপ দিতে হবে অতলান্ত সাগরে।

দুপুরের দিকে কাজ সেরে শোবার মুখে কি ভেবে লীলা হাত বাড়িয়ে কাগজের বাণ্ডিল টেনে নিল। চোখ বুলিয়ে নেবে একবার। ঘুম আসার আগে পর্যন্ত পড়বে শুয়ে শুয়ে।

মামুলী কাহিনী। এক শৈলনিবাসে আলাপ একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে দুটি বোনের। দুজনেই প্রথম দৃষ্টিতে বাঁধা পড়ল মদনের জালে। ভদ্রলোকের হাবেভাবে মনে হল ছোটটির প্রতিই আকৃষ্ট। সব জানতে পেরে বড় বোন নিজের হাতে ছোট বোনকে সঁপে দিল নিজের প্রেমাস্পদের হাতে। এ ছাড়াও একটি নারী চরিত্র রয়েছে। ভদ্রলোকের স্ত্রী। যাকে ভদ্রলোক বিনাদোষে বর্জন করেছেন। কোন সম্পর্কের বালাই রাখেন নি। শেষদিকে ভদ্রলোকের পুনর্বিবাহের খবর পেয়ে আত্মহত্যা করে তাকে সকল জ্বালা জুড়োতে হল।

মনে মনে ভাবতে লাগল লীলা। ডিরেক্টর হয়তো এই দুটি চরিত্রের কথাই তাকে বলেছেন। একটি বড় বোনের চরিত্র, অন্যটি বিবাহিতা স্ত্রীর। অবশ্য ভাগ্য-বিড়ম্বিতা শেষের চরিত্রটির সঙ্গেই লীলার জীবনের মিল বেশী। নিজের হাতে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন শেখরনাথ। ভেসে চলেছেন বিলাসের দুর্বার স্রোতে। কিন্তু পরিণতি! স্বামীর সঙ্গে কোনদিন আর দেখা হবে না। নিজের জীবনকে নিজের হাতে শেষ করতে হবে লীলাকে। না, না, মাথাটা সবলে নেড়ে লীলা বিছানার ওপর উঠে বসল। এত নিষ্ঠুর হবেন পশুপতিনাথ!

এত কষ্ট, এত দুঃখের পরেও শেখরনাথ কাছে এসে দাঁড়াবেন না। দুহাতে ধুলো ঝেড়ে লীলাকে টেনে নেবেন না নিজের বুকের আতপ্ত সান্নিধ্যে।

কিন্তু এ জীবন গ্রহণ করা মানেই কি তিলে তিলে আত্মহত্যা করা নয়। নিজের বলে আর কি থাকল লীলার! যে সম্মান, যে সম্ভ্রম অটুট রাখার জন্য ভরতপুর ছেড়েছিল, তার কতটুকু অবশিষ্ট রইল!

ডিরেক্টর আবার এলেন দিন তিনেক পরে। একলা নয়, সঙ্গে আধা-বয়সী আর একটি ভদ্রলোক। আলাপ করিয়ে দিলেন সহপরিচালক বলে।

কি, পড়ে দেখেছেন?

অনেকক্ষণ পরে লীলা ঘাড় নাড়ল।

আজ একবার আপনাকে স্টুডিয়োতে যেতে হবে।

আমাকে? কথা বলার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ।

হ্যাঁ, কতকগুলো ফটো নিতে হবে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে। গলার স্বরটাও একবার পরীক্ষা করতে হবে। অবশ্য এসব মামুলী। আমি যখন রয়েছি তখন ভাবনার কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে একটা প্রথা যখন রয়েছে, বুঝছেন না?

খুব শব্দ করে ডিরেক্টর হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে চুরুটটা ঠোঁটে ছুঁইয়ে বললেন, তা হলে ওই কথা রইল, চারটে নাগাদ গাড়ি পাঠিয়ে দেব।

ডিরেক্টর চলে যাবার পরও লীলা একভাবে দাঁড়িয়ে রইল। প্রথা! বলির পশুকে যূপকাষ্ঠে টেনে আনার আগে তার কপালে সিঁদুর ছুঁইয়ে দেওয়ার একটা প্রথা আছে। এও বুঝি তাই! কোন উপায় নেই বাঁচবার, নিষ্কৃতির কোন পথ নেই। আর একবার খুকুকে বুকে জড়িয়ে পালিয়ে যাওয়া যায় না কোথাও! ডিরেক্টরের নাগালের বাইরে, সেলুলয়েডের সর্বনাশা পরিধি ছাড়িয়ে! কিন্তু কোথায়! আবার ভরতপুরে! সেখানে গিয়ে দাঁড়াবার শেষ চিহ্নটুকুও তো বিলুপ্ত। তাছাড়া, শেখরনাথও আর নেই সেখানে।

আস্তে আস্তে লীলা ঘরের মধ্যে ফিরে এল। সমস্ত দিন ছটফটানি। খেতে বসে একগ্রাস ভাতও মুখে তুলতে পারল না। বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করল। রোদ পড়তেই উঠে পড়ল ধড়মড় করে। একটু পরেই হয়তো মোটর এসে দাঁড়াবে। ডিরেক্টর আর সহপরিচালক দুজনে নেমে আসবেন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে।

তারপর ? তারপর কালো-মেঘে চারদিক অন্ধকার। কাদার ছিটেয় সমস্ত শরীর কলঙ্কিত। মুখ তোলার উপায় থাকবে না লীলার।

মোটর এসে দাঁড়াল প্রায় সন্ধ্যার ঝোঁকে। অপেক্ষা করে করে লীলা খুশিই হয়ে উঠেছিল। যাক্ কোন একটা বাধা হয়তো পড়েছে মাঝখানে। ডিরেক্টর মত বদলেছেন। লীলার চেয়েও যোগ্যতর কোন শিকার জুটে গেছে। লীলাকে দয়া করেছেন ডিরেক্টর।

কি হল, আপনি এখনও তৈরি হন নি ? ডিরেক্টরের দেহের ছায়া চৌকাঠের ওপর।

লীলা খুকুর কাছে বসে ছিল। নীচে হীরু বসে বসে বাজারের হিসাব দিচ্ছিল। দুজনেই চমকে উঠল।

লীলা আমতা আমতা করল, আপনাদের দেরি দেখে ভাবলাম বুঝি আর এলেন না।

সে কি, কথা যখন দিয়েছি লীলাদেবী তখন আসব ঠিকই, তবে পথের মাঝ-খানে মোটরটা বিগড়ে যাওয়াতেই দেরি হয়ে গেল। নিন আপনি তৈরি হয়ে নিন।

প্যাণ্টের পকেটে দুহাত ঢুকিয়ে ডিরেক্টর পায়চারি করতে শুরু করলেন। বুটের জোরালো আওয়াজ, মুখে অস্ফুট গানের কলি। মনের কানা ছাপিয়ে আনন্দ উপচে পড়ছে।

মুখ হাত ধোয়ার নাম করে লীলা কলঘরে গিয়ে ঢুকল। কল খুলে দিয়ে আবার কাঁদতে বসল। এই মুহূর্তে কিছু একটা হয়ে যেতে পারে না ? দুর্বলতার জন্য মাথা ঘুরে অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারে, কিংবা যে কোন রকমের একটা বিপদ, যাতে লীলাকে ঠেলে হিঁচড়ে কেউ স্টুডিয়োতে না নিয়ে যেতে পারে।

অনেকক্ষণ পরে লীলা বাইরে এল। কোনরকমে সাজগোজ সেরে হীরুর সামনে এসে দাঁড়াল।

হীরু, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসব।

হীরু কোন উত্তর দিল না। একদৃষ্টে লীলার মুখের দিকে চেয়ে রইল তারপর চোখ ফেরাল ডিরেক্টরের দিকে। অসহিষ্ণু ডিরেক্টর গোটা দুয়েক চুরুট শেষ করে আর একটি জ্বালাবার বৃথা চেষ্টা করছেন।

লীলা আর মুখ তুলে চাইতে পারল না হীরুর দিকে, চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আস্তে বলল, আমি তৈরী।

ডিরেক্টর হাতঘড়ির ওপর একবার ব্যস্ত-চোখ বুলিয়ে নিলেন, কেশে বললেন, বড্ড দেরি হয়ে গেল। নিন, আসুন।

ডিরেক্টর পাশেই বসলেন, কিছুটা লীলার গা ঘেঁষে।

এতদিন পরে আমার স্বপ্ন সফল হল।

ডিরেক্টর একটু যেন হাসবারও চেষ্টা করলেন। খুশির আমেজ গলার আওয়াজে। গাছের ডালে বসা পাখি একেবারে মুঠোর মধ্যে। খুশি হবার দিনই তো বটে।

সারাটা পথ ডিরেক্টর সিনেমা-শিল্পের কাহিনী বলে চল্লেন, মাঝে মাঝে নিজের কৃতিত্বের কথা। লীলার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবিও তুলে ধরলেন সামনে। রংয়ে রেখায় প্রোজ্জ্বল। কিছু লীলার কানে গেল, অনেকখানিই গেল না। দু গালে দু হাত রেখে লীলা চুপচাপ বসে রইল। নিস্পন্দ, নিথর! ভাবল, এমন হয় না, হঠাৎ পথের বাঁকে সংঘর্ষ মোটরে মোটরে। গুঁড়িয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে ওদের মোটর। দুর্ঘটনার শেষে লীলার শতচ্ছিন্ন দেহের কোন নিশানা থাকবে না। কৌতূহলী পথচারীর সামনে ভরতপুরের বৌরানীর সামান্য চিহ্নটুকুও নয়।

মোটর থামতেই লীলার খেয়াল হল। উর্দিপরা এক দরোয়ান দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে। লীলাকে নামতে হবে।

স্টুডিয়োর ফ্লোরে ঢোকবার মুখেই রেবাদেবীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আর একটি ভদ্রলোকের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, লীলাকে দেখে এগিয়ে এল।

আসুন, আসুন, আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।

এই রকম অপেক্ষা করার একটা কথা গাড়িতে ডিরেক্টরও বলেছিলেন। রেবাদেবীর কথা নয়, সমস্ত সিনেমাজগৎ অপেক্ষায় রয়েছে, সমস্ত শিল্পীসমাজ। লীলার আসার অপেক্ষায়।

লীলা পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে সলজ্জ হাসল।

মেকআপ রুম থেকে বেরোতে প্রায় ঘণ্টাখানেক। আয়নার সামনে বসে লীলা নিজেকেই চিনে উঠতে পারল না। তুলির আঁচড়ে ভরতপুরের বৌরানীর বদলে জেগে উঠল লাস্যময়ী অভিনেত্রীর রূপ। চটুল চোখ, অধরের বঙ্কিম

ভঙ্গিতে মৃদু হাসির আভাস, দু গালে রক্তিম প্রলেপ। অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে লীলা দেখল। জন্মান্তর। গৃহবধূর নির্মোক খসে পড়ছে ধীরে ধীরে, কিন্তু তার পরিবর্তে এ কার রূপ ফুটে উঠেছে সামনের দর্পণে!

কাজ শেষ হতে আরো দু ঘণ্টা। ডিরেক্টর সারাক্ষণ পাশে পাশে রইলেন। ঝুঁকে পড়ে নির্দেশ দিলেন। দাঁড়াবার ভঙ্গী দেখিয়ে দিলেন, কণ্ঠস্বর মোলায়েম করার কসরত। সবশেষ হতে লীলার একটা হাত নিজের হাতে টেনে নিয়ে আবেগ-বিহ্বল স্বরে বলে উঠলেন, অপূর্ব। আপনার গলার আওয়াজ মাইকে ভারি মিষ্টি শোনাচ্ছে। আমার মনে হয় আপনার 'স্টিল'ও খুব ভালই আসবে।

খুব আস্তে লীলা হাত ছাড়িয়ে নিল। আরো আস্তে বলল, আমার বাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।

হ্যাঁ, আর দেরি কিসের। গাড়ি তো রয়েছে বাইরে, চলুন। ডিরেক্টর এগিয়ে যেতে যেতে বললেন।

কয়েক পা এগিয়েই লীলা দাঁড়িয়ে পড়ল। এমন ভাবে রং আর কাজল লেপে কি করে গিয়ে দাঁড়াবে খুকুর সামনে। রং তো নয়, সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করে কালি নিয়েই বুঝি মাখিয়ে দিয়েছে লীলার দু গালে, রং মুছে ফেললেও, এ কালি ওঠবার নয়।

কি, দাঁড়িয়ে পড়লেন যে লীলাদেবী?

মুখের রংগুলো ওঠাবার ব্যবস্থা করে দিন।

ডিরেক্টর সামনে এসে দাঁড়ালেন, বাইরে অন্ধকার। পথে কেউ দেখতে পাবে না। তাছাড়া মেক-আপে আপনাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।

লীলার কঠিন দৃষ্টির সামনে ডিরেক্টর থতমত খেয়ে গেলেন। সব কথা আর বলা হল না। ঢোঁক গিলে আমতা আমতা করে বললেন, মানে, ইয়ে, একটা কাজ করুন। আচ্ছা আমিই বলে দিচ্ছি। এই নটবর, মেক আপটা তুলে দাও তো শীগগির করে। আপনি ওঘরে যান লীলাদেবী।

স্টুডিয়োর বাইরে এসে ডিরেক্টর পাইপ ধরালেন। ভীষণ কাঁপছে হাতটা। দু-তিনবারের চেষ্টায় তবে অগ্নি-সংযোগ করলেন।

লীলাকে নামিয়ে দিয়ে পিছন পিছন ডিরেক্টরও নামলেন। বসলেন না, দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে শুধু বললেন, আজ তা হলে আমি চলি লীলাদেবী। পরশু নাগাদ আপনাকে 'স্টিল'গুলো দেখিয়ে নিয়ে যাব।

লীলা কোন উত্তর দিল না। এ-কটা কথা মোটরেও বলা চলত। এর জন্য পিছন পিছন বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াবার দরকার ছিল না।

খুকু বালিশে হেলান দিয়ে বিছানায় বসে কি একটা ছবির বই দেখছে। লীলার মনে হল আসবার সময় দাওয়ায় হীরুকে যেন বসে থাকতে দেখেছে। কিন্তু ডেকে কথা বলবার সময় নেই। এই মুহূর্ত্তে রান্নাঘরে না ঢুকলে সময়মত খাবার দেবার অসুবিধা হবে।

মা।

খুকুর ডাকে লীলা ফিরে দাঁড়াল।

কি রে?

তুমি সিনেমায় নামবে মা?

কে বললে? লীলা ছুটে এসে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরল। সমস্ত শক্তি দিয়ে কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করছে, বারবার নিজের মনকে বোঝাচ্ছে কিছু একটা ঠিক হয়ে যাবে, যাতে চরম সর্বনাশের মুখোমুখি কোনদিন হতে হবে না লীলাকে। এসব কথা কে বলল খুকুকে! আগামী দিনের সর্বনাশের ছবি কে তার সামনে তুলে ধরল!

আমি জানি মা। মার বুক থেকে মুখ তুলে খুকু একদৃষ্টে চেয়ে রইল। মেয়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে বেশীক্ষণ লীলার সাহস হল না। কি জানি হয়তো চোখের কোণে অস্পষ্ট কাজলের রেখা রয়ে গিয়েছে, দু গালে ক্ষীণ রক্তিম আভা।

আমি রান্নাটা সেরে আসছি খুকু, তুই একটু বোস।

লীলা পালিয়ে বাঁচল। মেয়ের কাছ থেকে পালাল, কিন্তু নিজের কাছ থেকে পালাবার কোন উপায় নেই। জ্বলন্ত উনুনের সামনে বসে অঝোরে কাঁদল। তরকারী পোড়ার গন্ধে চমক ভাঙল। কড়া নামিয়ে রেখে আবার কাঁদতে বসল। পৃথিবীর কেউ বুঝবে না, কেউ জানতে চাইবে না। ভরতপুরের বৌরানী ঘোমটা ফেলে কেন নিজের দেহের ছায়া ফেলছে রুপালী পর্দায়, সে দুঃখের কেউ খোঁজ রাখবে না।

মা!

গলার শব্দে লীলা চমকে উঠল। রান্নাঘরের ওধারে হীরু এসে দাঁড়িয়েছে। আঁচলে চোখ মুছে লীলা উঠে এল, কিছু বলবে হীরু?

হীরু হাঁটু মুড়ে মাথাটা নিচু করল লীলার পায়ের কাছে। প্রণাম শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কদিন ধরে একটা কথা বলব ভাবছি মা।

কি কথা হীরু?

বয়স হয়ে গেছে; তীর্থধর্ম কিছুই করা হল না। কবে মরে যাব। তাই ভাবছি কাল ভোরেই বেরিয়ে পড়ব।

কালই! কথা বলতে গিয়ে লীলার গলা ধরে এল।

হ্যাঁ মা, ঠিক করে ফেলেছি। খুকুসোনার জন্য ভয় ছিল, সে তো সেরে উঠেছে। আমি কাল ভোরে চলে যাব।

একটি কথাও বলল না লীলা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। শুধু হীরুর ভয় ছিল খুকুর জন্য। আর কারো জন্য ওর ভয় নেই, উদ্বেগও নয়। লীলাকে সাহায্য করার লোক জুটেছে, জীবিকার সন্ধান পেয়েছে লীলা। বাড়ি বযে লোক মুঠো মুঠো টাকা দিয়ে যাচ্ছে। তার জন্য ভয় করার কোন মানে হয় না। সব বুঝেই সরে যাচ্ছে হীরু। তীর্থযাত্রার এ সংকল্প কটা দিনে গড়ে উঠেছে। ডিরেক্টর এ বাড়ীতে ইদানীং আসার সঙ্গে সঙ্গে। হয়তো এ-কটা দিন হীরু দোটানার মধ্যে ছিল। আশা করেছিল ভরতপুরের অন্তঃপুরচারিণী ফিরে আসবে। স্বার্থান্ধ মানুষের বিস্তৃত করা জালে পাখা আটকাবে না। কিন্তু সমস্ত সংশয়ের নিরসন হয়েছে হীরুর, সব সন্দেহের অবসান। মুখে গালে রংয়ের ছিটে, ডিরেক্টরের সঙ্গে এক গাড়ি থেকে নামা কিছুই বুঝি হীরুর চোখ এড়ায় নি। যতদিন দারিদ্র্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করেছে বৌরানী, ততদিন হীরু পাশে ছিল। সংগ্রাম করেছে একতালে, বুক পেতে আঘাত নিয়েছে, কিন্তু এবার তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। হীরু বাগ্দীর সাহায্যের আর দরকার হবে না।

লীলা আশা করেছিল ভোরবেলা একবার হীরু দেখা করে যাবে। পা ছুঁয়ে আর একবার প্রণাম করবে। কিন্তু ভোরে উঠে লীলা অবাক। হীরু নেই, তার গোটানো বিছানাপত্রও দেখা গেল না। এতদিনের একটা সম্পর্ক এমনি করেই নিঃশেষ হল! মুখে আঁচল চাপা দিয়ে লীলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। এই তো শুরু। ঠিক এইভাবে চেনা-জানা সবাই সরে যাবে একে একে। পরিচিত লোকও অপরিচয়ের ভান করবে। মুখোমুখি হবার আগেই মুখ ফিরিয়ে নেবে। বলা যায় না, শেখরনাথ যদি কোন দিন খুঁজে

খুঁজে দরজায় এসে দাঁড়ান, ভরতপুরের বৌরানীর নতুন পরিচয় পেয়ে তিনিও হয়তো সরে যাবেন পা টিপে টিপে।

বিকেলের দিকেই ডিরেক্টর এসে দাঁড়ালেন, সঙ্গে রেবাদেবী। অন্য দিনের চেয়েও আজ যেন আরো উচ্ছ্বসিত মনে হল ডিরেক্টরকে, আরো আবেগ-বিহ্বল।

দেখুন লীলা দেবী, আমার কথা ঠিক কিনা? কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফটোগুলো লীলার দিকে এগিয়ে দিলেন। খুব নিস্পৃহভাবে লীলা ফটো-গুলোর ওপর একবার চোখ বোলাল। এ ফটো বাইরের রূপের প্রতিকৃতি নয়, রঞ্জনরশ্মি-প্রতিফলিত প্লেটে ওর বুকের পাঁজরের ছবিই যেন ফুটে উঠেছে। রোগদষ্ট পঞ্জর। মৃত্যু বাসা বেঁধেছে। তিলে তিলে গ্রাস করছে জীবনীশক্তি।

সত্যি এমন প্রফাইল সচরাচর দেখা যায় না। রেবাদেবী লীলার পাশে এসে দাঁড়াল।

আর গলার আওয়াজও ভালই এসেছে। যেটুকু দোষ আছে ওটা ঠিক করে নিতে বিশেষ সময় নেবে না। ডিরেক্টর মুখ নিচু করে চুরুট ধরাবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু আমি তো ভারি মুশকিলে পড়েছি। লীলা খুব আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল কথাগুলো। স্বরে তলিয়ে যাওয়া মানুষের আর্তনাদ।

মুশকিল, কিসের মুশকিল? চুলের মত সরু খাঁজ ফেললেন ডিরেক্টর দু ভ্রূর মাঝখানে। হাতের দেশলাইয়ের কাঠি আস্তে আস্তে নিভে এল, সেদিকে নজরও নেই।

শরীরটা কদিন বড় খারাপ যাচ্ছে। লীলা নিজের কপালে একবার হাত বুলিয়ে নিল।

শরীরের আর দোষ কি, ডিরেক্টর এগিয়ে এলেন। কণ্ঠে দরদের মিশেল, দু চোখের দৃষ্টি সমবেদনায় মেদুর।

মেয়ের অসুখের সময় প্রাণপাত পরিশ্রম করলেন, তার ওপর সংসারের সব কিছু নিজের হাতে করছেন, এক মিনিট অবসর নেই। মানুষের শরীর তো! কথা শেষ করে ডিরেক্টর একবার দীর্ঘশ্বাসও ফেললেন।

সত্যি লীলাদি, এত পরিশ্রম করলে শরীর থাকে কখনো। রেবা লীলার পাশে এসে দাঁড়াল।

লীলাদি! তা ছাড়া আর কি। গোত্রান্তর ঘটেছে লীলার, আগের পরিচয়ের ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই। নেমে নেমে রেবাদের পাশে দাঁড়িয়েছে।

হীরুকে দেখছি না যে? ডিরেক্টর ইতস্তত চোখ ফেরালেন।

হীরু চলে গেছে।

চলে গেছে? কোথায়?

তীর্থ করতে।

তীর্থ করতে? পাইপ সরিয়ে ডিরেক্টর উচ্চরোলে হেসে উঠলেন। ছাদ কাঁপিয়ে। হাসি থামতে বললেন, আপনাকে ভালমানুষ পেয়ে যার যা ইচ্ছা বুঝিয়ে দিচ্ছে। ব্যাটা বোধ হয় কোথাও চাকরি-টাকরি জোগাড় করেছে। ছোটজাতের কাণ্ডই তো এই।

লীলার অগ্নিগর্ভ চোখে চোখ পড়তেই ডিরেক্টর থেমে গেলেন। আবার তিনি ভুল করছেন। যেখানে পা টিপে টিপে এগোবার কথা, সেখানে আবার দ্রুতপদক্ষেপ করে নিজের সর্বনাশের মাত্রা বাড়িয়ে তুলছেন। নিজের মনকে বারবার তিনি বোঝালেন।

গলার আওয়াজ বদলে ধীর কণ্ঠে ডিরেক্টর এবার বললেন, তা হলে আপনার তো খুব অসুবিধা। বাইরের কাজ টাজ কে করবে। আমার হাতে একটা নেপালী ছোকরা রয়েছে। তাকেই গিয়ে পাঠিয়ে দেব।

লীলা কোন উত্তর দিল না। কোন মানুষের দিকে নয়, দৃষ্টি ফেরাল সামনের মাটির ওপর। কঠিন জমাট সিমেণ্ট। সেখানে সহানুভূতির আশা করাই বৃথা।

চল আজ আমরা উঠি, ডিরেক্টর রেবাদেবীর দিকে চোখ ফেরালেন, অনেক জায়গা ঘুরতে হবে!

রেবাদেবী তৈরীই ছিল। ডিরেক্টরের ডাকে উঠে দাঁড়াল।

প্রথম প্রথম যতটা অসহ্য লেগেছিল, ক্রমে সে ভাবটা কেটে গেল। জীবন-যাত্রার অন্য উপকরণের মত এও গা-সওয়া হয়ে গেল। নটার মধ্যে মোটর এসে দাঁড়াত, কোনদিন ডিরেক্টর থাকতেন, কোনদিন অন্য কেউ। খুকুকে ডিরেক্টরের দেওয়া পরিচারক বাহাদুরের জিম্মায় রেখে লীলা মোটরে গিয়ে উঠত।

ফিরতে সন্ধ্যা গড়িয়ে পড়ত। ইচ্ছা করেই লীলা একটু রাত করত। অন্ধকার নামুক, চারদিকে দিনের আলো নিঃশেষে মুছে যাক, তারপর ঘোমটায় মুখ ঢেকে মল্লিক-বাড়ির বৌ বাড়ি ফিরবে। খুকু কোনদিন আর একটি কথাও বলে নি, এমন কি লীলা ফিরে এলে মুখ তুলে চায়ও নি। কি ভেবেছে, কি বুঝেছে সেই জানে।

তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে। ওপরের মাদ্রাজী পরিবার মেলামেশা দূরে থাকুক, লীলার সঙ্গে কথাবার্তাও একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে।

রোজ যে স্যুটিং থাকে এমন নয়। অবসর সময়ে দু হাঁটুর ওপর মুখ রেখে লীলা বসে থাকে। সামান্য শব্দে চমকে মুখ তোলে। হীরু বুঝি ফিরে এল। এতদিনের সহায় আর সম্বল। কিংবা বলা যায় না বেহালা বুকে করে খুঁজে খুঁজে শেখরনাথ দরজায় এসে দাঁড়ালেন। গম্ভীর গলায় ডাকলেন লীলার নাম ধরে। কিংবা ডাক নয়, শুধু ছড়ের টানে টানে করুণ মুর্ছনা। হাজার ডাকে যে কথা বলা যায় না, বেহালার মীড়ের মধ্যে সে কথা মূর্ত হয়ে ওঠে।

সময় অসময়ে ডিরেক্টর এসে হাজির হন। কখনও একলা, কখনও রেবা-দেবী সঙ্গে থাকে। যেদিন একলা আসেন, বাইরে বেড়িয়ে আসার প্রস্তাব করেন। দিনরাত এই বন্ধ ঘরে বসে থাকলে শরীর খারাপ হবে। শুধু শরীরই নয়, মনও অবসন্ন হয়ে পড়বে। যদি নিজের মন অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তবে দশজনকে আনন্দ বিতরণ করার অসুবিধা হবে যে। শিল্পীর জীবন এক সুনিয়ন্ত্রিত কঠোর সাধনা, নিজের বলে তার কিছু নেই, কিছু থাকতে পারে না। কাজেই এমন মনমরা হয়ে থাকলে চলবে না লীলার। দুর্বার প্রাণশক্তিতে টলমল করবে, স্বতস্ফূর্ত জীবনের আবেগে উচ্ছল।

লীলা কিন্তু নিস্পন্দ। কথাগুলো কানে গেছে মুখচোখের চেহারা দেখে তাও মনে হয় না। বেগতিক দেখে ডিরেক্টর নিজেকে গুটিয়ে নেন। এদিক ওদিক চেয়ে এক সময়ে উঠে পড়েন।

জানলার গরাদে মাথা রেখে লীলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। সামনের রাস্তা দিয়ে জনতার স্রোত। ঢেউয়ের মাথায় ফেনার ঝালরের মতন মেয়ে-ছেলেও দেখা যায়। দ্রুত পদবিক্ষেপে রাস্তা পার হয়ে চলেছে। পুরুষের পাশাপাশি জীবিকার সন্ধানে। বুক কাঁপিয়ে লীলার নিশ্বাস পড়ে।

হঠাৎ সকালের দিকে মোটর এসে দাঁড়াল। ডিরেক্টর বেতের ছড়ি হাতে নেমে দাঁড়ালেন।

লীলা বাহাদুরকে বাজারের পয়সা বুঝিয়ে দিচ্ছিল, গাড়ির শব্দে চোখ তুলল।

নিন তৈরী হয়ে নিন। ডিরেক্টর এগিয়ে এলেন, আর সময় নেই।

স্যুটিং অনেকদিন শেষ, আবার কিসের তাড়াহুড়ো?

আজ যে ছবির প্রজেকশন। সকালের দিকে দেখাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

ছবির প্রজেকশন। মুখে হাত দিয়ে লীলা হাই তুলল। সারা শরীর জুড়ে অসহ্য ক্লান্তি। দু চোখে ঔদাসীন্য। আস্তে বলল, আমি আর কি দেখব ওসব। আপনিই যান।

আরে আমার বই, আমি তো যাবই, ডিরেক্টর হাতের ছড়িটা দুবার ঘোরালেন, পকেট হাতড়ে পাইপ বার করতে করতে বললেন, আজ সব আর্টিস্ট আসবে, প্রযোজক থাকবেন. বাইরের দু একজন হোমরা চোমরাকে বলা হয়েছে, আপনাকেও যেতে হবে। নিজের পার্ট কেমন হয়েছে, নিজের চোখে একবার দেখবেন না?

নিজের পার্ট! ডিরেক্টরের দিকে উদাস দুটি চোখ মেলে লীলা দাঁড়িয়ে রইল। সেলুলয়েডে আর লীলা কতটুকু পাট করেছে, ক্যামেরা কতটুকু ধরে রাখতে পেরেছে তার জীবনের! শেখরনাথের সঙ্গে প্রথম দেখা, ঘোমটা মাথায় ভরতপুরের মাটিতে পা দেওয়া, শেখরনাথের অফুরন্ত ভালবাসা আর সোহাগ, তারপর জোর বাতির দীপ্তি অল্প অল্প করে নিষ্প্রভ হওয়ার মতন, চারপাশে ঘনিয়ে এল নিকষ অন্ধকার। সেই তমিস্রার সুযোগে রাহু প্রবেশ করল বৌরানীর জীবনে। দত্তসায়েব, নির্মম, কামনাকলুষ। বৌরানীর শেষ চেষ্টা। জীবনপণ করে বাইজির মুখোমুখি দাঁড়ানো। স্বামীকে বুকে জড়িয়ে ফিরবে ভেবেছিল, কিন্তু ফিরল ললাটে শোণিত-চিহ্ন নিয়ে। এ সবের কিছুই তো ডিরেক্টর জানেন না। সেলুলয়েডে ছায়া ফেলা, এ তো বৌরানীর বাঁচবার অন্তিম প্রয়াস নয়, আত্মজাকে মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ থেকে বাঁচাবার প্রচেষ্টা।

আমার আজ বেরনো হবে না। কতগুলো জরুরী কাজ রয়েছে।

আর্টিস্টের কাছে নিজের ছবির প্রজেকশন দেখার চেয়ে আর কি জরুরী

কাজ থাকতে পারে। ডিরেক্টর মুখ কুঞ্চিত করলেন। তা নয়, এড়িয়ে যাবার চেষ্টা। এটুকু বুঝতে ডিরেক্টরের অসুবিধা হল না।

তবু ডিরেক্টর একবার শেষ চেষ্টা করলেন, ঘণ্টা দুয়েকের বেশী সময় লাগবে না। গেলে ভাল করতেন।

লীলা ঘাড় নাড়ল, না, থাক। একেবারে ছবি যেদিন শুরু হবে, সেইদিনই বরং যাব।

পায়ের জুতো চৌকাঠে ঠুকলেন কিছুক্ষণ ধরে, তারপর ডিরেক্টর মুখ তুলে বললেন, নিতান্তই যখন যাবেন না, তখন চলি। বিকেলের দিকে একবার এসে বলে যাব কেমন হয়েছে।

বিকেলে বাড়ি থাকব না আমি। হঠাৎ কথাগুলো লীলার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ডিরেক্টর কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন, তারপর জোরে জোরে পা ফেলে মোটরে গিয়ে উঠলেন।

বিকেলের দিকে লীলা খুকুকে কাছে টেনে নিল, এই খুকু, বেড়াতে যাবি?

প্রথমটা খুকু নিজের কানকে বিশ্বাস করে উঠতে পারল না, তারপর কথাটা বুঝতে পেরে দু হাতে লীলার গলা জড়িয়ে ধরল, কোথায় মা?

যেখানে হোক, ইডেন গার্ডেন, চিড়িয়াখানা, গড়ের মাঠ।

শেষ কালে ঠিক হল চিড়িয়াখানা। বাহাদুর ট্যাক্সি ডেকে আনল। লীলা, খুকু আর বাহাদুর।

সন্ধ্যার ঝোঁকে ট্যাক্সি থেকে নেমেই লীলা থমকে দাঁড়াল। ঠিক বাড়ির সামনে ডিরেক্টর পায়চারি করছেন। মুখে নিভন্ত পাইপ, চলার গতি দেখে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে।

কতক্ষণ? লীলা এগিয়ে দাঁড়াল।

তা আধ ঘণ্টার ওপর হবে। ডিরেক্টর মণিবন্ধে বাঁধা হাতঘড়ির দিকে একবার নজর বোলালেন, সদলবলে কোথায় গিয়েছিলেন? নেমন্তন্নে নাকি?

না, চিড়িয়াখানায়।

চিড়িয়াখানায়, ডিরেক্টর হাঁ করে ফেললেন। অনেকক্ষণ মুখ আর বন্ধই হল না।

অবাক হলেন বুঝি? ভাবছেন স্টুডিয়োতে যারা ঘোরে তারা চিড়িয়াখানায় যায় কি দেখতে, তাই না?

ডিরেক্টর কথা বাড়ালেন না, আস্তে বললেন, তালা খুলুন, আপনার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।

লীলা দরজা খুলে বাইরে চেয়ার এগিয়ে দিল তারপর বাহাদুরকে রান্নার নির্দেশ দিয়ে নিজে ডিরেক্টরের সামনাসামনি একটা মোড়ায় বসে বলল, কি জরুরী কথা বলুন।

আজ প্রজেকশন দেখলাম। প্রডিউসার আমার পাশেই ছিলেন। আপনার পার্টটা বড় আড়ষ্ট আড়ষ্ট হয়েছে, কথাবার্তাও একটু জড়ানো। অবশ্য প্রথমবার কিছুটা এমন হয়, তবে আপনি যেন একটু বেশী নার্ভাস হয়ে পড়েছেন।

প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্য ডিরেক্টর চোখ তুলে লীলার মুখের দিকে একবার চাইলেন। শঙ্কা বা সঙ্কোচের সামান্য ছায়াও নেই মুখের কোথাও।

প্রডিউসার একটু হতাশ হয়েছেন। বারবার আমাকে বললেন যে আপনার পার্টটা অন্য কাউকে দিলেই ভাল হত। আমি অবশ্য বুঝিয়ে শুনিয়ে ঠিক করে দিয়েছি। বলেছি, এ লাইনে এই প্রথম, দু-একখানা বইয়ে কাজ করলেই জড়তা কেটে যাবে। তখন দেখবেন এঁর জন্য দর্শক পাগল হয়ে উঠবে।

ধন্যবাদ। লীলার কণ্ঠস্বরে জড়তার লেশমাত্র নেই। মানুষকে লীলা বুঝতে শিখেছে। তার দয়ামায়াই শুধু নয়, ছলচাতুরীরও হদিশ পেয়েছে। ডিরেক্টরকে লীলা এড়িয়ে চলছে, সেইজন্যই বুঝি এই ভয়টুকু দেখানোর প্রয়োজন ছিল। অবশ্য ডিরেক্টর লীলার ক্ষতি যথেষ্টই করতে পারেন। মাস মাস গ্রাসাচ্ছাদনের টাকা কটা সরিয়ে নিতে পারেন নির্মমহাতে। বুভুক্ষার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন মা আর মেয়েকে।

মনে মনে লীলা একটু হাসল। অদৃষ্ট মন্দ, তার পক্ষে সবই সম্ভব।

মুচকি হেসে লীলা ধীর গলায় বলল, প্রজেকশন দেখতে যেতে পারি নি, কিন্তু কথা রইল প্রথম শোতে আমাকে নিয়ে যেতে হবে।

বেতের চেয়ার নির্মম আর্তনাদ করে উঠল। ডিরেক্টর রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়েছেন। লীলার দিক থেকে এমন একটা অনুরোধ, এ তাঁর ধারণারও

অতীত। পাইপ ধরাবার বৃথা চেষ্টা করে নিরস্ত হলেন। আঙুলগুলো ভীষণ কাঁপছে। কণ্ঠস্বরও তাই। থেমে থেমে বললেন, এ কথা আবার আপনি মনে করিয়ে দিচ্ছেন আমাকে? প্রথম শো কেন, প্রেস শোর দিনই আপনাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

লীলা নিশ্চিন্ত হওয়ার নিশ্বাস ছাড়ল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, একটু বসুন, এক কাপ চা করে আনি আপনার জন্য।

চায়ের কাপ হাতে লীলা যখন এসে দাঁড়াল তখন ডিরেক্টর নিজের মনে ইংরাজী গানের সুর বাজাচ্ছেন শীস দিয়ে দিয়ে।

চায়ের কাপ হাতে তুলে দিয়ে লীলা আবার মোড়ার ওপর বসল।

ডিরেক্টর চায়ে বার দুয়েক চুমুক দিয়ে শুরু করলেন, আপনি মন খারাপ করবেন না। আমি যখন ভার নিয়েছি তখন আপনাকে প্রথম র‍্যাংকের 'স্টার' করে তুলবই। এর জন্য যদি সব কিছু আমাকে ছাড়তে হয়, তাতেও আমি রাজী।

আপনি আমার একটা উপকার করতে পারেন? লীলা মোড়া টেনে আর একটু কাছে সরে এল।

কি বলুন? ডিরেক্টর পাইপ পকেটে রেখে সামনে ঝুঁকে পড়লেন।

আমি বুঝতে পারছি এ লাইনে আমার কিছু হবে না, তার চেয়ে আমায় ছোট ছেলেমেয়েদের কাজে লাগিয়ে দিতে পারেন, কোন শিক্ষাসদনে? অবশ্য বিদ্যার পুঁজি আমার কিছুই নেই, কিন্তু একেবারে নিচের ক্লাশে বোধ হয় পড়াতে পারব।

ডিরেক্টরের মুখ দেখে মনে হল এক মুঠো ছাই নিয়ে কে যেন তাঁর মুখে লেপে দিয়েছে। সমস্ত উৎসাহ, উদ্দীপনা এক নিমেষে উধাও। কপালে ঘামের ফোঁটা জমে উঠল, হতাশায় বেঁকে গেল ঠোঁটের দু কোণ। যে মৃত্তিকায় দেবতা গড়া যায়, তা দিয়ে মনুষ্যেতর প্রাণী গড়বার এ কি হীন প্রয়াস।

এ আপনি কি বলছেন? আপনার এ প্রতিভা মাস্টারিগিরিতে নষ্ট করবেন? আপনি হতাশ হবেন না। আমি বলছি এ লাইনেই আপনার উন্নতি হবে। দেখুন না, এর পরের বইটাতে আপনাকে দিয়ে আমি নতুন একটি চরিত্র ফোটাব।

ডিরেক্টর আর অপেক্ষা করলেন না, আবার বেফাঁস কিছু শুনতে হয় এই

ভয়ে উঠে দাঁড়ালেন। যাবার মুখে ঘুরে দাঁড়িয়ে শুধু বললেন, দিন পনেরর মধ্যেই বই শুরু হবে, আমি প্রথম দিনেই আপনাকে নিয়ে যাব।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দেখে লীলা প্রায় দশ জায়গায় আবেদন-পত্র ছাড়ল। ছোট ছেলে-মেয়েদের পড়ানোর জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন, কিংবা কোন শিক্ষায়তনে কিণ্ডারগার্টেনের জন্য টিচার দরকার। অভিজ্ঞতার কথা লীলা এড়িয়ে গেল, পরিবর্তে লিখল খুব সামান্য দক্ষিণা হলেও তার অসুবিধা নেই।

উত্তরের আশায় পথের দিকে চেয়ে থাকাই লীলার সার হল, কোন উত্তর এল না, পত্রের স্বীকৃতিও নয়।

ভেঙে পড়ার মুখে ডিরেক্টর এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে রেবাদেবী।

নতুন বইয়ের স্ক্রীপ্‌ট্ নিয়ে কদিন বড় ব্যস্ত ছিলাম, এদিকে আসতেই পারিনি। আজ 'বিচিত্রা'য় বই শুরু হয়েছে, প্রথম শোতে যাবেন বলেছিলেন, কিন্তু আমি ভাবলাম অন্য সবাই যখন রাতের শোতে যাবেন, তখন আপনারও সেই সময়েই যাওয়া ঠিক হবে, কি বলেন?

উত্তরের আশায় ডিরেক্টর লীলার দিকে চাইলেন। কোন উত্তর দিল না লীলা, পোশাক বদলাতে ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

সিনেমাঘরের সামনে আসতেই ডিরেক্টর আঙুল দিয়ে দেখালেন। নায়িকা নয় লীলা, উপনায়িকাও নয়, তবু এদিকের বোর্ডে তার মুখ আঁকা হয়েছে। বাড়তি রং ঢেলে মহার্ঘ পোশাকে অপূর্ব দেহশ্রী। ছবি ঘিরে কিছু লোকও জমেছে। ঘৃণায় লীলার সমস্ত শরীর আবিল হয়ে উঠল। ছি, ছি, অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃ-পুরচারিণীর একি হীন পরিণতি! মদ্যপ, পরনারীসক্ত শেখরনাথও বুঝি মল্লিক-বাড়ির সম্ভ্রম আর আভিজাত্যকে এত নীচে নামাতে পারেন নি। চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল। কেন এ কাজ করল লীলা! এমনভাবে নিজের সন্তানকে বাঁচাবার কি প্রয়োজন ছিল। প্রাণ বাঁচাতে এ-ভাবে মান জলাঞ্জলি দিল!

সিনেমার বাতি নিভতে লীলা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। আশে পাশে এক গাদা লোকের গুঞ্জন। আর্টিস্টরা ছাড়াও, প্রতিষ্ঠানের অন্য কর্মীরাও এসেছে। পিছন থেকে কে যেন লীলার হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে গেল। শুধু লীলাকেই নয়, আরো কয়েকজন আর্টিস্টকেও। নায়িকা রেবাদেবী ফুলের তোড়া ছাড়াও, ফুলের মালা পেল কয়েকগাছা।

চোখের সামনে দ্রুত আবর্তিত হল সেলুলয়েডের রীল। মানুষের কান্নাহাসি সুখদুঃখের জীবন্ত আলেখ্য। পর্দাতে নিজের ছবি প্রতিফলিত হতেই লীলা টান হয়ে বসল। ও যেন লীলার আর এক সত্তা। ওরই রূপ নিয়ে, আকৃতি নিয়ে হাসছে কথা বলছে। শুধু বাইরের রূপই নিয়েছে, অন্তরের নিভৃত বেদনার কোন স্পর্শ নেই ও প্রতিকৃতিতে। লীলা মনে প্রাণে যা হতে চায় নি, সেই রূপ নিয়ে ব্যঙ্গ করে চলেছে।

ছবি শেষ হতেই ডিরেক্টর এসে দাঁড়ালেন। কোটের ফ্ল্যাপে রক্ত-গোলাপ।

কেমন লাগল?

কেমন লাগল কি বলবে লীলা? ছবির কতটুকুই বা সে দেখেছে? সারা ছবি জুড়ে ভরতপুরের কাহিনী। ভাঙা জীর্ণ মল্লিক-বাড়ির পটভূমিতে ব্যথাতুর দুটি বধূর জীবনযাত্রা ভেসে উঠেছে চোখের সামনে। অন্তহীন কান্নার স্রোতের পাশা-পাশি সুরার ফেনিল উচ্ছ্বাস। আবহসঙ্গীতে মল্লিক-বাড়ির আত্মার মর্মন্তুদ ক্রন্দনের সুর। সব ছাপিয়ে বেহালার আর্তনাদ। ছবি মুছে গেছে, পরিবেশও নিশ্চিহ্ন, কেবল ছড় টানার শব্দ, তারের সুরেলা ঝঙ্কার। এ সবের মধ্যে লীলা কখন হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে। ডিরেক্টরের এত শ্রম করে ফুটিয়ে তোলা কাহিনীর কোন কিছুই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি।

ভিড় এড়াবার জন্য সবাই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। দর্শকেরা কেমন করে বুঝি রেবাদেবীর আসার সংবাদ সংগ্রহ করেছে। দল বেঁধে নিষ্ক্রমণের পথ আটকে দাঁড়িয়েছে। দর্শনাকাঙ্ক্ষী।

অনেকক্ষণ পরে সবাই নামল। এবারে রেবাদেবী অন্য গাড়িতে উঠল। ডিরেক্টর আর লীলা এক গাড়িতে। সিনেমার সামনে ভিড় অনেক পাতলা। দর্শকের দল নিরাশ হয়ে সরে গেছে।

ডিরেক্টর সিটে হেলান দিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, কাল সকালে একবার যাব আপনার কাছে। নতুন বইয়ের গল্পটাও আপনাকে শোনাব, আর কি ধরনের চরিত্র আপনাকে দিতে চাই সে সম্বন্ধেও আলাপ করব।

জানলার কাঁচে মাথা রেখে লীলা বাইরের দিকে চেয়েছিল। আলো, চীৎকার, লোকের ভিড় কিছুই ভাল লাগছে না। দু হাতে মুখ ঢেকে অন্ধকারে কোথাও বসতে পারলে হত। জনহীন কোন জায়গায়। নিন্দা, স্তুতি, কিছু যেখানে পৌঁছবে না।

খুব সাবধানে গাড়ি এগিয়ে চলল, রাজপথের জনতা কাটিয়ে কাটিয়ে। ঘাড় ফিরিয়ে নিজের ছবিটার দিকে আর একবার চোখ ফেরাতে গিয়েই লীলা চমকে উঠল। স্বপ্ন দেখছে বুঝি, নাকি অতীতের যবনিকা তুলে ওর মনের কামনাকেই রূপায়িত করল নিষ্ঠুর নিয়তি। এ কি সম্ভব!

সব ভুলে লীলা ডিরেক্টরের একটা হাত জাপটে ধরল, চীৎকার করে উঠল স্থানকাল ভুলে, একটু থামান গাড়ি, থামান একটু।

ততক্ষণে গাড়ি অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় গিয়ারের মন্থর গতি রূপায়িত হয়েছে তৃতীয় গিয়ায়ের চঞ্চল বেগে।

কি হল, এমন করছেন কেন? ডিরেক্টর শক্তহাতে লীলার একটা হাত টেনে নিলেন।

দুটি পায়ে পড়ি আপনার, দয়া করে গাড়ি একটু থামাতে বলুন।

লীলার বেদনাতুর কণ্ঠস্বর রাত্রির বাতাসে অনুরণন তুলল।

ডিরেক্টর নির্দেশ দেবার আগেই, ড্রাইভার ব্রেকের কঠিন পেষণে গাড়ির গতি রুদ্ধ করেছে। যান্ত্রিক তীক্ষ্ণ শব্দ করে প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে গাড়ি থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হাতল ঘুরিযে দরজা খুলে লীলা ক্ষিপ্রপদে পথে নেমে পড়ল। বিস্মিত ডিরেক্টরও লীলার অনুসরণ করলেন।

॥ পনর ॥

চোখ মেলে লীলা দেখল নিজের বিছানায় শুয়ে আছে। আশেপাশে অনেকগুলো মুখ। উদ্বেগ-আকুল। ক্রমে ক্রমে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে এল। ডিরেক্টর, রেবাদেবী, খুকু আর একটি অপরিচিত মুখ, বোধ হয় ডাক্তারের।

চোখ খুলতেই ডিরেক্টর ঝুঁকে পড়লেন, এখন কেমন বোধ করছেন?

লীলা কথা বলবার চেষ্টা করতেই ডাক্তার হাত নেড়ে বারণ করল, থাক, এখন কথা বলার দরকার নেই। চুপচাপ শুয়ে বিশ্রাম করুন।

লীলা চোখ বন্ধ করল।

ঘণ্টাখানেক পরে আবার যখন লীলা চোখ খুলল তখন ডাক্তার আর নেই, ডিরেক্টর বসে আছেন। পাশে রেবাদেবী। বালিশে ঠেস দিয়ে লীলা উঠে বসল।

ডিরেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার বলুন তো? আচমকা গাড়ি থামিয়ে ওভাবে ছুটে নেমে গেলেন? চেনাশোনা কাউকে দেখতে পেয়েছিলেন?

লীলা কোন কথা বলল না। একদৃষ্টে ডিরেক্টরের দিকে চেয়ে রইল। চেনা লোক তো নিশ্চয়, কিন্তু কত চেনা তা ডিরেক্টর ধারণাও করতে পারবেন না। চোখের ভুল নয়। স্পষ্ট লীলা দেখতে পেয়েছিল। দীর্ঘ চেহারা, অবহেলায়, অত্যাচারে সুগৌর রং কিছু ম্লান। বুকের মধ্যে জড়ানো বেহালার বাক্স। একদৃষ্টে চেয়েছিলেন ভরতপুরের বৌরানীর প্রতিচ্ছবির দিকে।

কাছে গিয়ে লীলা কিন্তু আর দেখতে পায় নি। হৈ চৈ চীৎকারে শেখরনাথ বোধ হয় সরে গিয়েছিলেন সেখান থেকে, ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু এত সব কথা ডিরেক্টরকে বলা যায় না। শুধু এটুকু বলার কোন মানেও হয় না। সব কিছু বলতে হয়। একটা সংসারের ভেঙে পড়ার কাহিনী, একটা মানুষের সরে যাওয়ার ইতিকথা।

কি জানি কেমন আবছা একটা ছায়া দেখলাম। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠল। খুব নিস্তেজ গলায় লীলা বলল। থেমে থেমে।

ডাক্তার বললেন নিছক দুর্বলতা। আপনার বেশ কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

বিশ্রাম! চোখ দুটো বিস্ফারিত করে লীলা চেয়ে চেয়ে দেখল। স্টুডিয়ো থেকে বিশ্রাম, সেলুলয়েডের বাঁধন থেকে মুক্তি! কিছুই আপত্তি নেই লীলার। কিন্তু তারপর! গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত! মাসের পর মাস ডিরেক্টর নিশ্চয় এগিয়ে আসবেন না অর্থসাহায্য করতে। শিকল-কাটা পাখির ওপর তাঁর দরদ থাকবার কথা নয়।

একটু পরেই ডিরেক্টর বিদায় নিলেন, অবশ্য পরের দিন আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। পিছনে পিছনে রেবাদেবীও উঠল।

লীলা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। এতক্ষণ ধরে এটাই সে মনেপ্রাণে কামনা করছিল। আশেপাশে বাইরের কেউ থাকবে না। দেয়ালে হেলান দিয়ে একটানা চিন্তার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেবে। এ চিন্তায় বেদনার অংশ কম, আনন্দের ভাগ বেশি। শেখরনাথ শহরে এসেছেন। হয়তো লীলারই খোঁজে। বলা যায় না আশেপাশের ছোট-খাট শহর আর শহরতলী তন্ন তন্ন করে সন্ধান করে বোধ হয় কলকাতায় এসে হাজির হয়েছেন। এ বিরাট জনসমুদ্রে কোন

একটা মানুষকে খুঁজে বের করা যে কত দুঃসাধ্য তা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়েছে ভরতপুরের বধূর রঙচঙে আলেখ্য। সেই নিমেষেই হয়তো খোঁজবার স্পৃহা অন্তর্হিত হয়েছে শেখরনাথের।

অবশ্য এ সব তো লীলার মনগড়া কল্পনা। এমনও হতে পারে কোন এক খ্যাতনামা বাইজির তবলচী হিসাবেই শেখরনাথ এ শহরে পা দিয়েছেন। পথ চলতে চলতে চেনাজানা মুখের আদল দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছেন। এর বেশি কিছু নয়। নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে লীলা অনর্থক রঙীন ছবি এঁকে চলেছে।

যাই কিছু হোক, আসল কথা শেখরনাথ এসেছেন এ শহরে, লীলার কাছাকাছি। হীরু বাগ্দী থাকলে কাল থেকে লীলা তাকে নিয়ে সারা শহর তোলপাড় করতে পারত। গলি, উপগলি, মাঠ ময়দান সব জায়গা। যেমন করে হোক ফিরিয়ে আনত শেখরনাথকে। দরকার হলে পায়ে ধরেও।

লীলা নিশ্বাস ফেলল খুব সন্তর্পণে। খুকু কাছে বসে বই পড়ছে। নিশ্বাসের শব্দ পেলেই মুখ তুলে চাইবে। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরবে লীলাকে। কাঁদ-কাঁদ গলায় জিজ্ঞাসা করবে, কি হয়েছে মা? লীলা কোন উত্তর দিতে পারবে না। একদৃষ্টে শুধু চেয়ে থাকবে মেয়ের দিকে। শেখরনাথের চেহারার সঙ্গে মেয়েটার অদ্ভুত মিল। চেয়ে চেয়ে আশা যেন আর মেটে না।

পরের দিন বেলা পড়তেই লীলা বেরিয়ে পড়ল। একটু পরেই হয়তো ডিরেক্টর এসে জুটবেন। আবোল তাবোল কথাবার্তা। শরীর ঠিক রাখার অমূল্য উপদেশ। তখন আর বাইরে বেরোবার উপায় থাকবে না। বেরোতে গিয়ে খুকুর কথা মনে হল। ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে হয়। একবার লীলা চেষ্টা করেছিল, শেখরনাথকে ফিরিয়ে আনতে পারে নি। পত্নীপ্রেমে যা সম্ভব হয়নি, অপত্যস্নেহে যদি তা সম্ভব হয়! খুকুর মুখের দিকে চেয়ে যদি ফেলে আসা গৃহস্থালীর কথা শেখরনাথের মনে পড়ে। পরিভ্রমণক্লান্ত অবসন্ন মন যদি আবার নীড়ের আশ্রয় খুঁজতে চায়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত লীলা কি ভেবে খুকুকে আর সঙ্গে নিল না। মানুষটার সঙ্গে যে দেখাই হবে, তার কোন স্থিরতা নেই। মিছামিছি খুকুকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় ঘোরাঘুরি করবে। তা ছাড়া খুকু এখনও দুর্বল। অল্পতেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে।

বিচিত্রা সিনেমার সামনে লীলা যখন এসে দাঁড়াল, তখন সন্ধ্যার শো শুরু হতে দেরি ছিল। কিছু কিছু লোক জড় হয়েছে সামনের ফুটপাতে। ওর ছবির সামনেও কয়েকজনের জটলা। এদিক ওদিক দেখে লীলা রাস্তা পার হয়ে এ পাশের ফুটপাতে এসে দাঁড়াল।

ক্রমে ভিড় বাড়তে লাগল। সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে লীলা খোঁজ করল। এপাশ থেকে ওপাশ। এদিক থেকে ওদিক।

আবার শেখরনাথ এসে দাঁড়াবেন ছবির সামনে এমন একটা সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। কিন্তু আশা কুহকিনী। তা ছাড়া বলাও যায় না, শেখরনাথ এসে দাঁড়াতেও তো পারেন। বিয়ের পরে তোলা ফটো নিয়ে হয়তো আবার ফিরে আসবেন এখানে। ছবির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাচাই করবেন। এক ছবির সঙ্গে অন্য ছবির মিল খোঁজার চেষ্টা।

অনেকক্ষণ পরে লীলার খেয়াল হল। মানুষটা ধারে কাছে কোথাও নেই, কিন্তু লীলার আশে পাশে অনেকগুলো মানুষ জমায়েত হয়েছে। শুধু ঘিরেই দাঁড়ায় নি, রংদার দু একটা কথাও বলতে শুরু করেছে। লীলার হঠাৎই যেন মনে পড়ে গেল। শুধু বাড়ির চৌকাঠই সে পার হয় নি, হেঁটে হেঁটে জনতার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ছায়া ফেলেছে রুপোলী পর্দার বুকে। তাকে নিয়ে আলোড়ন না হোক, আলোচনা করার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু আলোচনা মানে কি বক্রোক্তি, এইভাবে চটুল কথার ফুলকি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেবে ওর দিকে! লঘু রসিকতা করবে!

লীলা আর দাঁড়াল না। জোরে জোরে পা ফেলে চৌরাস্তার দিকে এগিয়ে চলল। চলতে চলতে ইতস্তত দৃষ্টি ফেরাল। বলা যায় না পথচারীদের মধ্যে থাকতেও তো পারেন। দীর্ঘ কাঠামো, হাজার ঝড়ঝাপটায় টোল খেয়েছে শুধু, ভেঙে পড়ে নি। বুকে সযত্নে জাপটানো বেহালার বাক্স। ওরই মতন হয়তো চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন এদিক ওদিক। এক পথভ্রষ্টা অন্তঃপুরচারিণীর সন্ধানে।

পিছনে মোটরের হর্ন। চমকে লীলা সরে দাঁড়াল।

এদিকে কোথায়?

যেখানে বাঘের ভয়, সন্ধ্যার অন্ধকার বুঝি ঠিক সেইখানেই নেমে আসে। মোটরের দরজা খুলে ডিরেক্টর নেমে দাঁড়ালেন, আসুন, উঠে আসুন।

দ্বিরুক্তি না করে লীলা মোটরে উঠল। ডিরেক্টরের পাশাপাশি বসল।

আমি আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। আপনি কোথায় গিয়েছেন কেউ বলতে পারল না, না খুকু, না বাহাদুর। কোথায় যাচ্ছিলেন এদিকে?

কোথাও নয়। এমনি হাঁটছিলাম একটু। সারাটা দিন ঘরে বসে হাঁপ ধরে গিয়েছে।

তা তো ধরবেই। বেড়াবার ইচ্ছা আমাকে একটু বললেই পারতেন। এভাবে পথে পথে না হেঁটে, ময়দানের দিকে বেড়াতে পারতেন। ডিরেক্টরের গলায় অভিমানের ছোঁয়াচ। সত্যিই তো, লীলার সব ভার যখন তিনি নিজের হাতে নিয়েছেন, তখন এ সব কথা তাকে জানানো উচিত বৈ কি। সঙ্গে করে নিয়ে তিনি অনায়াসেই পদচারণা করতে পারতেন। শরীর, মন, আত্মা, সব কিছুর উন্নতির দায়িত্ব তো তাঁরই।

লীলা কোন উত্তর দিল না। সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজল। এ তবু অনেক ভাল। হাজার লোকের দৃষ্টি থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে, মোটর-কোটরে আত্মগোপন। অন্তত দ্রুতগামী যন্ত্রযানের মধ্যে পথচারীর বাঁকা বাঁকা কথার বাণ কানে এসে পৌঁছবে না।

এর পরের বইটা এবার শুরু করব। পাইপ ধরাতে গিয়েও ডিরেক্টর কি ভেবে ধরালেন না। দেশলাই পকেটে রেখে দিলেন।

লীলার দিক থেকে কোন সাড়া এল না।

আড়চোখে ডিরেক্টর একবার লীলার দিকে চাইলেন তারপর আস্তে আস্তে বললেন, আপনাকে এ লাইনে যখন থাকতেই হবে তখন আমার মনে হয় মনপ্রাণ লাগিয়ে কাজ করাই ভাল। এখানকার ব্যাপার কি জানেন, সব কিছু নির্ভর করে গণদেবতা বা জনদেবতার ওপর। ভাল অভিনয় করলে তারা মাথায় তুলে নাচবে কিন্তু পর পর দুটো বইয়ে যদি ঝিমিয়ে পড়েন, তখন তারা শুধু মাটিতেই ফেলে দেবে না, পায়ের তলায় চেপে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। তাই বলছিলাম, যে ভূমিকা অভিনয় করবেন তাতে ডুবিয়ে দিন নিজেকে। এই আপনার ধ্যান-জ্ঞান হোক।

এবারেও কোন কথা নয়। কাঁচের মধ্যে দিয়ে লীলা একমনে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগল।

গাড়ি বাঁদিকে ঘুরতেই লীলা কথা বলল, আমি বাড়ি ফিরব।

বাড়ি ? এই না বললেন ময়দানে হাঁটবেন একটু ?

না, আর হাঁটব না। অনেকটা হেঁটেছি। এবার বাড়ি যাব। খুকু অনেকক্ষণ একলা রয়েছে।

ডিরেক্টর কথা বাড়ালেন না। ড্রাইভারকে গাড়ি ঘোরাবার নির্দেশ দিলেন।

সারাটা পথ কোন কথা হল না। কেবল লীলা নামবার সময় ডিরেক্টর হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে দিতে দিতে বললেন, একটা কথা আছে।

গম্ভীর গলা ডিরেক্টরের। বেশ থমথমে।

লীলা ফিরে চাইল, কি বলুন তো ?

আপনার যদি এ লাইন ভাল না লাগে, আপনি সময়মত আমাকে জানিয়ে দেবেন। অবহেলা করে সংসারের কাজ হয়তো কোনরকমে করা যায়, কিন্তু সিনেমায় অভিনয় করা চলে না। এ কথা আমি আপনাকে বলতাম না, কিন্তু আপনার ভাবান্তর দেখে বলতে বাধ্য হচ্ছি।

কয়েক মিনিট। দাঁত দিয়ে শাড়ির আঁচল চেপে লীলা কি ভাবল, তারপর শান্ত গলায় বলল, একটা ব্যাপারে আমার মন খুব চঞ্চল রয়েছে। আজকের রাতটা আমায় ভাবতে দিন, কাল বিকালে যদি আসেন, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে পাকা কথা বলব।

কথা শেষ করে লীলা আর দাঁড়াল না। দু হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করে হনহন করে এগিয়ে গেল।

খাওয়াদাওয়ার পরে লীলা বিছানায় শুল বটে, কিন্তু অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না। মাত্র একটা রাত। এইটুকু সময়ের মধ্যে এতবড় একটা সমস্যার সমাধান করতে হবে। নিজের বাঁচার সমস্যা আর ইজ্জত বাঁচাবার সমস্যা। জীবনের দাঁড়িপাল্লা কোনদিকে ঝুঁকে পড়বে, লীলা কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। সারা শহরে এমন কোন আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই, পরিচিতও নয়, যার কাছে লীলা ছুটে যেতে পারে এ সমস্যার সমাধানের জন্য। হীরু বাগ্দীও সরে গেছে, হেমন্তবাবু আর গৌরী তারাও দূর দেশে। কাগজে কালির আঁচড় কেটে কেটে এ জিনিস কাউকে বোঝানো যায় না। রক্ত আর কালিতে তফাত যে অনেক !

একমাত্র ভরসা শেখরনাথ। মুমূর্ষু, পঙ্গুর জীবনে তিনিই আশার বার্তা

বহন করে আনতে পারেন। ক্ষতদেহে সান্ত্বনার প্রলেপ। কিন্তু কোনদিকে সামান্য তটরেখাও নেই। কোথায় নোঙর বাঁধবে লীলা, কোন ঘাটে বিশ্রাম খুঁজবে!

ডিরেক্টর বিকালের অনেক আগেই এলেন। লীলা তরকারি কুটছিল, ডিরেক্টরকে দেখে বঁটি সরিয়ে উঠে দাঁড়াল।

চলুন বেড়িয়ে আসি। মোটরেই কথা বলব। ডিরেক্টর বসলেন না।

বেড়াতে যেতে আর লীলার আপত্তি নেই। বরং ঘরে বসে থাকতেই বিশ্রী লাগে। পথে পথে ঘুরছে একটা মানুষ, বাইরে বের না হলে কি করে দেখা হবে তার সঙ্গে।

মিনিট পনেরর মধ্যেই লীলা তৈরী হয়ে নিল। খুকুকেও সঙ্গে নিল।

গাড়িতে কিন্তু একটি কথাও হল না। থমথমে নিস্তব্ধতা। লীলা এক মিনিটের জন্যও রাস্তা থেকে চোখ সরাল না, কি জানি যদি ভিড়ের মধ্যে মানুষটা হারিয়ে যায়! সেবারের মতন একবার দেখা দিয়েই তলিয়ে যায় অতল জন-সমুদ্রে!

কথা হল ময়দানে নেমে। রুমাল বিছিয়ে ডিরেক্টর বসতে বসতে বললেন, কি, ঠিক করলেন কিছু?

অসহায় দুটি চোখ তুলে লীলা চাইল। অস্ফুট-গলায় বলল, আমি তো ভেবে কোন কুলকিনারা পাচ্ছি না। আপনিই বলুন কি করব?

ডিরেক্টরের মুখের রং বদলাল। মাংসপেশীর খাঁজে খাঁজে আত্মপ্রসাদের ছাপ, বিজয়ীর চাপা উল্লাস। এতদিন পরে সুমতি হয়েছে লীলার, ঠিক পথে আসার চেষ্টা করছে।

আমার কথা তো আপনাকে আগেই বলেছি, ডিরেক্টর জাঁকিয়ে বসলেন, মনপ্রাণ সঁপে দিন এই লাইনে। দ্বিধা জড়তা কিছু রাখবেন না। দেখবেন উন্নতি অবধারিত।

কিন্তু ক্রমেই আমি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি নিজের ওপর। বার বার মনে হচ্ছে এ পথের আমি যোগ্য নই। পাথরে পাথরে ঘষলে আগুন বেরতে পারে, কাদার তালে হাজার ঠোকাঠুকি করলেও স্ফুলিঙ্গ বের হবে না।

কাদার তালই আমাদের পছন্দ লীলাদেবী। কাদার তালকে আমরা আমাদের মনের মত করে গড়ে তুলতে পারব। আমি সর্বদা আপনার পাশে

পাশে থেকে আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। আপনি শুধু আমার ওপর নির্ভর করুন।

আবেগের প্রাবল্যে ডিরেক্টর লীলার হাত জড়িয়ে ধরতে গেলেন, কিন্তু তার আগেই লীলা হাত সরিয়ে নিয়েছে।

অভিনয় ছাড়া আর কোন কাজ দিতে পারেন না আমাকে? আপনাদের স্টুডিয়োতে তো হাজার লোকের প্রয়োজন হয়। লীলা আস্তে আস্তে বলল। ডিরেক্টরের দিকে চোখ না তুলে।

অনেক লোকের দরকার হয় সত্য কথা, কিন্তু সব কাজ কি সবাইকে দিয়ে হয়? ডিরেক্টর স্মিতহাস্য করলেন। তারপর একটু থেমে গলার স্বর বদলে বললেন, ভদ্রঘরের বহু ছেলেমেয়ে এই শিল্পের উন্নতির জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করছেন, এ তো আপনি নিজের চোখেই দেখেছেন। আপনার আপত্তিটা কোথায়?

কোথায় আপত্তি! লীলা মাথা নিচু করে রইল, ঠিক কোথায় আপত্তি এটা হয়তো এক কথায় ডিরেক্টরকে সে বোঝাতে পারবে না। মল্লিক-বাড়ির অসূর্য-স্পশ্যা বৌরানী আর লাস্যময়ী চটুল অভিনেত্রী এ দুয়ের মাঝখানে দু মেরুর ব্যবধান। শুধু চোখে কাজল আর মুখে রং মাখলেই এক থেকে আর একটায় রূপান্তরিত হওয়া যায় না, বিশেষ করে সে রং যদি মনেই কোন সাড়া না জাগায়। তাছাড়া শেখরনাথ এসেছেন এ শহরে। এখন লীলার একমাত্র কাজ তাঁকে খুঁজে বের করে তাঁর পায়ে নিজেকে নিবেদন করা। তখন যদি শেখরনাথ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেন, লীলাকে কাছে টেনে নিতে অস্বীকার করেন, আবার ডিরেক্টরের কাছে এসে লীলা দাঁড়াবে। মল্লিক-বাড়ির বৌরানী, তার এ পরিচয় খসে যাবে, আর কোন দ্বিধা নয়, দ্বন্দ্ব নয়, হাত ধরে যে কোন নরকে ডিরেক্টর নামাবেন, লীলা নামতে রাজী। অবশ্য তার আগে খুকুর একটা বন্দোবস্ত করতে হবে। তাকেও যদি শেখরনাথ স্বীকার না করেন, তবে বাইরের কোন বোর্ডিংয়ে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ইজ্জতের বিনিময়ে আহরিত রজতমুদ্রায় তার খরচ চালান। খুকুই তো লীলার জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা। খুকু না থাকলে, ডিরেক্টরের কাছে নয়, গঙ্গার অগাধ সলিলে গিয়ে লীলা দাঁড়াত। কলুষ-অপহারিণী জাহ্নবী। চরম শান্তিলাভ করতে একটু দেরি হত না।

লীলার একবার মনে হল, ডিরেক্টরকে শেখরনাথের সব কথা খুলে বলে। পুরুষমানুষের সাহায্য ছাড়া তাঁকে খুঁজে বের করা সত্যই দুঃসাধ্য। প্রয়োজন হলে কোন সাময়িক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন। লীলার নাম-ঠিকানা দিয়ে। বলা যায় না, শেখরনাথের চোখে পড়ে যেতে পারে। ঠিকানা হাতড়ে হাতড়ে তিনি এসে দাঁড়াতে পারেন লীলার দরজায়। কিন্তু এর আর একটা দিকও লীলা ভাবল। ডিরেক্টর স্বার্থ ছাড়া একটি পাও এগোন না। তাঁর কি লাভ এমন করে লীলাকে তার স্বামীর হাতে তুলে দেওয়ায়! শেখরনাথের দেখা পাওয়া মানেই তো লীলার সিনেমা-জীবনের ইতি। হাজার হাত বাড়ালেও ডিরেক্টর আর তার নাগাল পাবেন না। এত প্রলোভন, চোখের সামনে রূপোলী পর্দার মোহময় জাল বিছানো, সবই তো বৃথা হবে। অভিজ্ঞ ডিরেক্টর এমন ভুল যে করবেন না, এ বিষয়ে লীলা স্থিরনিশ্চয়।

আপনি ভাল করে ভেবে দেখুন, ডিরেক্টর গলায় গাম্ভীর্যের রেশ মেশালেন, আপনার নিজের জন্য, আপনার মেয়ের জন্য প্রচুর টাকার প্রয়োজন। যদি দুজনে সুস্থভাবে বাঁচতে চান। বড় শহরের চাহিদাও অনেক। সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে বাঁচতে হলে প্রচুর টাকার প্রয়োজন, সেটা আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন। আপনার সঙ্গে এতদিনের পরিচয়ে যা বুঝেছি, তাতে মনে হয়েছে এ শহরে বা শহরের কাছাকাছি আপনার আত্মীয়স্বজন, হিতৈষী বিশেষ কেউই নেই, অন্তত বিপদের সময় যাঁরা বুক দিয়ে দাঁড়াতে পারেন, অর্থ সাহায্য করতে পারেন। অবশ্য সিনেমা ছাড়াও সাধারণভাবে বেঁচে থাকার জন্য মেয়েদের উপায়ের আরো পথ আছে। স্কুল, কলেজে অনেকে মাস্টারি করেন, অফিসে কাজ করেন পুরুষের পাশাপাশি বসে, নার্সের জীবিকাও অনেক নিয়েছেন, কিন্তু এ-সবের জন্য আপনি কতখানি উপযুক্ত সে বিচার আপনিই করবেন। এ ছাড়াও মেয়েদের বাঁচবার যে পথ আছে সেটা আপনার অজানা নয়। ইচ্ছা না থাকলেও, আপনার অবস্থা আপনাকে ধীরে ধীরে সেই পথে নামাবে। অভিভাবক বলতে আপনার কেউ নেই, অতুল রূপ আপনার, ভরাযৌবন। পাপের হাতছানিতে ভোলা আপনার পক্ষে—

দোহাই আপনার, দয়া করে থামুন, দুটো পায়ে পড়ি, লীলা আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল।

খুকু একটু দূরে বেড়াচ্ছিল, মার চীৎকারে ছুটে কাছে এসে দাঁড়াল। লীলা

খুকুকে কোলের কাছে টেনে বসাল তারপর ডিরেক্টরের দিকে ফিরে বলল, ঠিক আছে, এর মধ্যে একদিন আসুন, আপনার ছবি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে। আজ শরীরটা ভাল লাগছে না, চলুন উঠি।

ডিরেক্টর একবার ভাবলেন লীলাকে বলবেন, বন্ধ ঘরের চেয়ে খোলা ময়দানই তো ভাল। শরীর যদি একটু খারাপ হয়েই থাকে, তো ঝিরঝিরে হাওয়ায় ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু লীলার মেঘ-থমথম মুখের দিকে চেয়ে আর কিছু বলতে সাহস করলেন না। ঠিক আছে, আর ভয় নেই। চারদিকে নিশ্ছিদ্র প্রাচীর। দেয়ালে দেয়ালে মাথা ঠুকলে শুধু রক্তপাতই সার হবে, মুক্তির উপায় মিলবে না।

পরের দিন লীলা ভোর ভোর বেরিয়ে পড়ল। চা মুখে ঠেকিয়েই। সারা রাত ধরে কথাটা ভেবেছে। এ ছাড়া আর অন্য পথ নেই, অন্তত আর কোন পথের হদিশ লীলা পায় নি। স্টুডিয়ো থেকে যেতে আসতে হাসপাতালটা চোখে পড়েছে। তার সামনেই লীলা নামল। নামল বটে কিন্তু ভিতরে ঢোকার সাহস হল না। অনেকক্ষণ ধরে সামনে পায়চারি করল। কপালের ঘাম মুছল শাড়ির আঁচল দিয়ে। একবার ভাবল ফিরতি বাসে বাড়িই ফিরে যাবে, কিন্তু মনে জোর আনার চেষ্টা করল। কেন ভয় কিসের! আর্ত মানুষের সেবা, এর চেয়ে মহৎ কাজ আর কি আছে পৃথিবীতে! সমাজ কল্যাণের উৎকৃষ্ট পন্থা, এতে সঙ্কোচের কি আছে!

পায়ে পায়ে লীলা ভিতরে ঢুকল। গেট পেরিয়ে অফিসঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ছোট নেমপ্লেটে সুপারিনটেণ্ডেন্টের নাম। কাটা দরজার তলা দিয়ে অনেকগুলো পা নজরে এল। ভিতরে বেশ ভিড়। লীলা একটু অপেক্ষা করল। মিনিট পনের। তারপরই অফিসঘর খালি হয়ে গেল। এগিয়ে যেতেই বেয়ারা এসে দাঁড়াল। আচমকা ঢোকা চলবে না। পরিচয়পত্র চাই।

পরিচয়পত্র! লীলা বেয়ারার হাত থেকে কাগজের টুকরো নিয়ে নিজের নাম লিখল। হাতটা কাঁপছে থরথর করে। লেখাটা এঁকেবেঁকে গেল। মানুষ পড়তে পারলে হয়। বেয়ারা কাগজের টুকরো নিয়ে ভিতরে ঢুকল, একটু পরেই বেরিয়ে এসে বলল, যান ভিতরে।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক। মাথার সামনেটা জুড়ে বিরাট টাক। তীক্ষ্ণ নাক আর

চাপা ঠোঁটে বুদ্ধিমত্তার ঝিলিক। কাগজ থেকে চোখ তুলে সামনের চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বসুন।

লীলা বসল।

মিনিট দুই, তারপর সামনের কাগজগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে বললেন, বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি?

থেমে থেমে ঢোঁক গিলে লীলা বলল। খুব আস্তে আস্তে। অনেকবার কথায় কথায় জড়িয়ে গেল, এক কথা একাধিকবার বলল, তারপর বক্তব্য শেষ করে হাঁপাতে লাগল।

নার্সের কাজ? সুপারিনটেণ্ডেণ্ট লীলার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে দেখলেন, তারপর বললেন, আপনি কি ট্রেইনড্ নার্স? ডিপ্লোমা আছে আপনার?

লীলা ঘাড় নাড়ল।

সুপারিনটেণ্ডেণ্ট আবার পাশে রাখা কাগজগুলো সামনে টেনে নিলেন, বললেন, মাপ করবেন, ট্রেইনড্ নার্স ছাড়া আমাদের নেবার কোন ক্ষমতা নেই, তা ছাড়া বর্তমানে আমাদের নার্সের কোন প্রয়োজনও নেই।

লীলা উঠে দাঁড়াল। ইচ্ছা হল প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকে একবার অনুনয় করে, করুণ মিনতি। এখানে না হয়, অন্য কোন হাসপাতালের খোঁজ কি তিনি দিতে পারেন না। কিংবা ভদ্রভাবে বাঁচবার কোন একটা উপায়। কিন্তু লীলার সাহস হল না। দরজার কাছ অবধি গিয়েই আবার ফিরে দাঁড়াল, ভদ্রলোকটির গলার স্বরে, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো? মুখটা খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।

লীলা আর দাঁড়াল না। ফিরেও দেখল না একবার। কোথায় দেখেছেন ভদ্রলোক হয় তো মনে করতে পারছেন না, কিন্তু লীলা ঠিক জানে। 'বিচিত্রা', সিনেমার সামনে অতবড় রংচঙে ছবি, ভিতরে গোটা ফিল্ম দেখার আর অসুবিধাটা কোথায়! যে পরিচয় লীলা লুকোতে চায়, সেই পরিচয়ের সুতো ধরেই মানুষ টানাটানি করবে। ওটা যে নিছক ছদ্মবেশ এটা কি কেউ বুঝতে চাইবে না! হয়তো ভদ্রলোক সবই জানতে পেরেছেন, অভিনেত্রীকে সেবিকার পোশাকে বেমানান দেখাবে তাই লীলাকে নেবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। সারাজীবন এই কাদার ছিটেটুকু বয়ে বেড়াতে হবে, আর এমনি করেই মানুষ মুখের ওপর বারবার ভদ্রভাবে বাঁচবার সব দরজা সজোরে বন্ধ করে দেবে। নির্মম হাতে।

লীলা সোজা বাড়ি ফিরে এল না। সামনে যে বাস এসে দাঁড়াল, তাতেই উঠে পড়ল। জানলার ধারে বসে মুখ বাড়িয়ে পথচারীদের লক্ষ্য করতে শুরু করল। অখণ্ড চলমান জনস্রোত। অন্তহীন। বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন আকৃতি। এত ভিড়ের মধ্যে ঠিক মানুষটাকে খুঁজে বের করা সহজ কথা! কিন্তু এ ছাড়া তো আর উপায়ও নেই। যেমন করেই হোক খুঁজে বের করতেই হবে। লীলাকে জীবন্মৃত অবস্থা থেকে উদ্ধার করার আর কারো সাধ্য নেই।

শহরের একপ্রান্ত থেকে লীলা আর এক প্রান্তে চলে গেল। খালের ধার। এখানেও জনতার কমতি নেই। দু একজন অনিমেষ নেত্রে চেয়ে রইল লীলার দিকে। লীলা মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে আর এক বাসে গিয়ে উঠল। এবার বাড়িমুখো।

সন্ধ্যার ঝোঁকে ডিরেক্টর এসে দাঁড়ালেন। একলা নয়, সঙ্গে আর একজন।

লীলাদেবী ব্যস্ত আছেন নাকি?

লীলা ঘরের মধ্যে ছিল, বাইরে বেরিয়ে এসে বলল, না ব্যস্ত আর কি, বসুন।

বাহাদুর দুটো চেয়ার পেতে দিল দালানে। ডিরেক্টর আর তার সঙ্গী চেপে বসলেন।

কিন্তু আপনি? আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন? ডিরেক্টর উৎসুক গলায় বললেন।

বেতের মোড়াটা আনতে আনতে লীলা বলল, না দাঁড়িয়ে থাকব কেন, বসবার বন্দোবস্ত করছি।

লীলা বসলে, ডিরেক্টর সঙ্গের ভদ্রলোকটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি আমার বইয়ের লেখক শ্রীপ্রদোষ হাজরা। গল্পটা নিজের মুখে আপনাকে শোনাতে চান।

আমাকে? লীলা বিব্রত বোধ করল, কপালের ঘামের ফোঁটা মুছতে মুছতে বলল, আমাকে কেন? আমি ওসবের কি বুঝি।

ডিরেক্টর হাসলেন, বা, আপনার দরদ দিয়ে, মর্মস্পর্শী অভিনয় করে চরিত্র সজীব করবেন, গল্পে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন, আর আপনারা গল্প বুঝবেন না, তা কি হতে পারে। অবশ্য এই বই হতে আমার একটু দেরি হবে। একটু গোলমাল হয়ে গেল।

মনে মনে লীলা খুশি হল। মুখে উদ্বেগের চিহ্ন ফুটিয়ে বলল, কি হল? কিসের গোলমাল?

মানে, যিনি টাকা ঢালছিলেন, আমার প্রডিউসর, তিনি তো প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন কি না।

সর্বস্বান্ত!

এক রকম তাই বই কি। জমিদারি সব সরকার নিয়ে নিলেন। জমিদারি প্রথা লোপই পেয়ে গেল। যার যা জমি জায়গা ছিল সব সরকারের কবলে চলে গেল।

আনন্দ আর লীলা চেপে রাখতে পারল না। উৎফুল্ল হয়ে বলল, সব জায়গায় কি জমিদারি প্রথা উঠে গেল?

সব জায়গায় মানে আমাদের দেশে।

আঃ, লীলা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। তাই যদি হয় তবে দত্তসায়েবও তো পথের ভিখারী হলেন। তিল তিল করে জমানো জমিদারি নিঃশেষ। ভরতপুর, চণ্ডীডাঙা, গড়বিষ্টুপুর সব চলে যাবে হাতের বাইরে। একবার পাট্টা বদল করেছিল, শেখরনাথের নামের বদলে দত্তসায়েবের নাম, এবার দত্তসায়েবের নাম আর থাকবে না, সব কিছু গিয়ে উঠবে সরকারের তহবিলে।

ডিরেক্টরের কথায় লীলার চমক ভাঙল।

অবশ্য সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ কিছুটা পাওয়া যাবে, কিন্তু সে কতটা পাওয়া যাবে আর কবে, সে কথা বলাই দুষ্কর। কাজেই এই সব সাত পাঁচ ভেবে প্রডিউসর পিছিয়ে পড়েছেন।

কথাগুলো সব লীলার কানে গেল না। ওর মনই নেই এদিকে। চোখের সামনে দত্তসায়েবের চেহারা ভেসে উঠল। ধূলিধূসরিত দেহ, চোখের কোলে দুশ্চিন্তার কালিমা। পথে পথে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

যখন লীলার খেয়াল হল, তখন প্রদোষবাবু গল্প পড়া শুরু করে দিয়েছেন।

লীলা বাধা দিয়ে বলল, দাঁড়ান, আগে বাহাদুরকে চায়ের কথা বলে আসি। চা না হলে গল্প ঠিক জমবে না।

চা আসার পরেও গল্প মোটেই জমল না। প্রদোষবাবু অবশ্য খুব উৎসাহ-ভরেই পড়ে গেলেন, কিন্তু এক বর্ণও লীলার কানে গেল না। চোখের দৃষ্টি প্রদোষবাবুর দিকে থাকলেও, তার মন বনপ্রান্তর পার হয়ে ছোটখাট শহর

ডিঙিয়ে ভরতপুরে চলে গেল। দত্তসায়েবকে আর তার ভয় নেই। মুঠো মুঠো টাকা ছড়িয়ে আর তিনি মানুষকে বশ করতে পারবেন না। হাত বাড়িয়ে অবহেলাভরে আর ছুঁতে পারবেন না অন্তঃপুরিকাদের। মানুষের জীবন নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলতে পারবেন না। এখন অর্থের জন্য তাঁকে দাঁড়াতে হবে সরকারের দরজায় হাত পেতে। অন্যের দাক্ষিণ্যে জীবনধারণ করতে হবে।

পড়া শেষ হতে ডিরেক্টর বললেন, এ বইটা একটু অন্য ধরনের লক্ষ্য করলেন তো? গানবাজনার অংশই বেশী। এক বাইজিই এর প্রধান চরিত্র। তাকে ঘিরেই কাহিনী গড়ে উঠেছে। বাইজির পার্ট কাকে দেব ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না। রেবাকে দিয়ে আমার সাহস হচ্ছে না। অবশ্য আপনার 'রোল' আমি ঠিক করে ফেলেছি। বাইজি যে গুরুর কাছে গান শিখত, আপনি তার মেয়ে। আপনার প্রেমাস্পদ নিয়ে বাইজি খেলা করল। আপনি মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন, ফণা তুলে। বাকিটা তো আপনি শুনলেনই।

আমার প্রেমাস্পদকে বাইজি ছিনিয়ে নিল? লীলার দুটি চোখ বিস্ফারিত, অসম্ভব কাঁপছে গলার স্বর।

হ্যাঁ, একরকম তাই বই কি। যদি প্রডিউসর না পাই, তাহলে আমি নিজেই টাকা জোগাড় করে এ বই নামাব।

প্রদোষবাবু হাতের বই বন্ধ করে চুপচাপ বসেছিলেন, এতক্ষণ পরে বললেন, আজ উঠি। আমার আবার একটা সাহিত্য-সভা আছে। তারপর ডিরেক্টরের দিকে ফিরে বললেন, আমাকে দয়া করে সভায় নামিয়ে দিয়ে যাবেন তো?

নিশ্চয়, নিশ্চয়, ডিরেক্টর ঘাড় নাড়তে নাড়তে উঠে দাঁড়ালেন। লীলার দিকে চেয়ে বললেন, আচ্ছা, আজ উঠি লীলাদেবী। বুঝতেই পাচ্ছেন বইটা নিয়ে খুবই ব্যস্ত আছি।

ডিরেক্টর চলে যাবার পর অনেকক্ষণ লীলা বেতের মোড়ার ওপর বসে রইল। যেমন করেই হোক শেখরনাথকে খুঁজে বের করতেই হবে। জনসমুদ্র মন্থন করে। দত্তসায়েবের এমন সর্বনাশের কথা শেখরনাথকে না শোনাতে পারলে লীলা তৃপ্তি পাবে না। শুধু লীলাই তৃপ্তি পাবে না এমন নয়, হয়তো সতীর আত্মাও তৃপ্তি পাবে না।

অনেকদিন পরে লীলা বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। একটানা বিরতিহীন নিদ্রা।

পরের দিন বিকালের একটু আগে লীলা বেরিয়ে পড়ল। আবার একটা বাসে উঠে বসল। চোখ রাখল বাইরের দিকে। যেমন করেই হোক শেখরনাথকে খুঁজে বের করবেই। যতদিন লাগুক।

কিন্তু বরাত। লীলার বেশীদূর যাওয়া হল না। একটু এগিয়েই বাস থেমে গেল। একটা ঠেলাগাড়ির সঙ্গে ট্রামের সংঘর্ষ। টিন ভর্তি তেল রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে। লোকে লোকারণ্য।

কণ্ডাক্টর জানিয়ে দিল, বাস আর যাবে না। লীলা বাস থেকে নেমে পড়ল। একবার ভাবল অন্যদিকের একটা বাসে উঠে শহরের আর এক প্রান্তে চলে যাবে। কিন্তু মনে মনে ভাবল, প্রথমেই যখন বাধা তখন থাক, আর একদিন বেরলেই হবে।

কয়েক পা হেঁটেই এক চিলতে পার্ক। লীলা বেঞ্চে একটু জিরিয়ে নেবার আশায় পার্কে ঢুকল। বেঞ্চ খালি পাওয়াই দুষ্কর। গাছের তলায় গিয়েই বসবে বরং। কিন্তু এগিয়েই থেমে পড়তে হল। গাছের তলায় একদল লোক বসে তাস খেলছে। পোশাকপরিচ্ছদে মনে হল চাকর ঠাকুরের দল। আর একটু যেতেই বাহাদুরকে চেনা গেল। রোজ বিকেলে বাহাদুর খুকুকে নিয়ে এ পার্কে বেড়াতে আসে, তা লীলার জানা, কিন্তু খুকুকে একলা ছেড়ে দিয়ে সে এভাবে তাসের নেশায় মাতে, তা জানা ছিল না।

খুকু নিশ্চয় ধারে কাছেই আছে, এই ভেবে লীলা কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল।

খুকুকে কোলের কাছে নিয়ে চুপচাপ বসে রয়েছে। আরো যেন স্থবির হয়ে গিয়েছে। মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে। হাওয়ায় ইতস্তত উড়ছে পাকা চুলের রাশ।

লীলার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই খুকুকে সরিয়ে দিয়ে লোকটা উঠে পালাবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তার আগেই লীলা চিনে ফেলেছে। ছুটে গিয়ে পথরোধ করে চেঁচিয়ে উঠল, হীরু, যেও না দাঁড়াও।

হীরু বাগ্দী ফিরে দাঁড়াল।

দুচোখ জলে ঝাপসা। লীলা আরো এগিয়ে এল। বাষ্পরুদ্ধ গলায় বলল, তুমি আমায় ভুল বুঝে কেন সরে এলে হীরু? যা ভেবে তুমি ছেড়ে এলে আমাকে, বিশ্বাস কর, আমি তা নই।

আশেপাশে লোকের ভিড়। কয়েকজন চেয়েও রয়েছে ওদের দিকে। তবু লীলা নিজেকে সামলাতে পারল না।

লীলার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হীরু ঘাসের ওপর বসে পড়ল। মাথা না তুলে বলল, অমন কথা বলবেন না মা। আজন্ম আপনাদের নিমক খেয়েছি। ও কথা বললে আমি মহাপাতকের ভাগী হব। আপনাদের ছেড়ে কখনও থাকতে পারি মা? তাই রোজ চুপি চুপি এখানে চলে আসি। খুকুসোনাকে শুধু একটু দেখবার জন্য।

কান্নার আবেগে হীরুর গলা জড়িয়ে এল।

লীলা চাপা গলায় বলল, এখানে নয় হীরু। বাড়ি চল, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। ছোটবাবু এখানে এসেছেন।

ছোটবাবু? হীরু সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। ঝকঝক করে জ্বলছে দুটো চোখ। গালের মাংস থরথরিয়ে কাঁপছে।

হ্যাঁ, হীরু।

চলুন মা, দেখা করে আসি। কতদিন দেখি নি ছোটবাবুকে।

এবার লীলার চোখের দুকোণ চকচকিয়ে এল। ছোটবাবু বুঝি লীলার কাছে এসে উঠেছেন যে গেলেই দেখা হয়ে যাবে হীরুর সঙ্গে!

পথে যেতে যেতে লীলা সব বলল। আদ্যোপান্ত। কদিন ধরে ছোটবাবুর খোঁজে যে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে কথাও জানাল। আর ভয় নেই লীলার। এবার হীরু ফিরে এসেছে। যেমন করেই হোক সে ছোটবাবুকে খুঁজে বের করবেই। পারবে না হীরু?

হীরু কিছুক্ষণ নিষ্পলক চোখে লীলার দিকে চেয়ে রইল, তারপর বলল, আর কবছর আগে হলে বুক ফুলিয়ে হ্যাঁ বলতে পারতাম মা, কিন্তু শরীর ক্রমেই ভেঙে পড়ছে। চোখের জ্যোতিও কমে আসছে একটু একটু করে। তবু চেষ্টা একবার করে দেখব। অন্তত নিজে চোখ বোজবার আগে ছোটবাবুকে আপনার কাছে এনে দেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করব।

সে রাত্রে হীরু থাকল না। কোথায় কাঠচেরাইয়ের কলে কাজ করে দিনের বেলা, রাত্রে সেখানেই থাকে। কিছু বলে আসে নি। তারা হয় তো ভাববে। তাই রাতটা সেখানে কাটিয়ে কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে আসবে। কাজে ইস্তফা না দিলে সারা দিন ছোটবাবুকে খুঁজে বেড়াবে কি করে!

লীলা আশ্বাস দিয়েছে। কয়েকটা মাস সে খুব চালাতে পারবে। হঠাৎ ডিরেক্টর টাকা বন্ধ করবেন এমন মনে হয় না। নতুন বই নামানোর ব্যাপারে লীলাকে সহজে হাতছাড়া করবেন না। এর মধ্যে শেখরনাথকে যদি পাওয়া যায়, তবে তাঁর পায়ের ওপর লীলা উপুড় হয়ে পড়বে। যেমন করেই হোক ঋণমুক্ত করে লীলাকে তাঁর উদ্ধার করতেই হবে।

পর পর চার দিন। বিকেলে হীরু ফিরে আসে হাঁপাতে হাঁপাতে। দাওয়ার ওপর বসে ঘাড় নাড়ে। এক কোণ থেকে আর এক কোণ ছোটাছুটি করেছে। কোথাও ছোটবাবুর দেখা মেলেনি। বিশাল নগরী, মনে হয় আদি অন্তহীন। জনপ্রবাহের যেন শেষ নেই। কোন একটা মানুষকে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব।

লীলা হীরুর ক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে সান্ত্বনা দেয়, তোমার ছোটবাবু বোধ হয় এ শহরে আর নেই হীরু। কয়েক দিন হয়তো ছিলেন এখানে, সেই সময় আমি একবার দেখতে পেয়েছিলাম।

কিন্তু সন্দেহের ছোঁয়াচ হীরুর দুচোখের তারায়, কোথায় যাবেন ছোটবাবু? ভরতপুরে আর ফিরবেন না।

ভরতপুর ছাড়া তোমার ছোটবাবুর আর বুঝি যাবার আস্তানা নেই, লীলা ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, ফৈজাবাদ, কত জায়গা তো রয়েছে।

না, মা, হীরু দাঁত দিয়ে জিভ কাটল, নিস্তারের মুখে যা শুনলাম, ছোটবাবু একেবারে বদলে গেছেন। ও সব খেয়াল সম্পূর্ণ কেটে গেছে। ছোট বেলা থেকে জানি ছোটবাবুকে। একবার ফিরে দাঁড়ালে সে পথে আর যান না। শিকারের বেলাতেও যে দেখেছি।

লীলা নিজের কথাটাও হীরুকে বুঝিয়ে বলেছে। সিনেমায় নামার ইতিবৃত্ত। খুকুকে বাঁচাবার এ ছাড়া আর পথ ছিল না। বিশ্বাস করুক হীরু, লীলা নিজের সম্মান অটুট রেখেছে, কোথাও একটু কলঙ্কের ছিটেও লাগায়নি।

হীরু সঙ্গে সঙ্গে হাত যোড় করেছে।

আমায় মাপ করুন মা। আমার মাথার ঠিক ছিল না। আপনার মধ্যে যে আগুন রয়েছে সে কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। সব পাপ সে আগুনের ছোঁয়ায় পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

এবার ডিরেক্টর এলেন দিন দশেক বাদ। খুব ব্যস্ত ভাব। পাইপ টানতে

টানতে চৌকাঠে এসে দাঁড়ালেন। হীরুকে দেখেই একটু যেন থতমত খেয়ে গেলেন তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, কি হে, কোথায় ডুব মেরেছিলে বল তো ? তোমার মা তো ভেবেই সারা।

হীরু মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে বলল, আমরা আর ডুব দেব কোথায় বাবু। ক মাসের জন্য দেশে গিয়েছিলাম।

সেটা তোমার মাকে বলে যেতে হয়, ডিরেক্টর দেয়ালে পাইপ ঠুকে ছাই ঝাড়লেন, তারপর লীলাকে এগিয়ে আসতে দেখে কপাল-বরাবর হাত তুলে বললেন, নমস্কার, কেমন আছেন, বলুন ?

ভাল। লীলা নীরস গলায় বলল।

আমার বইয়ের প্রায় সব ঠিকঠাক। দিন পনেরর মধ্যেই কাজ শুরু করব। তবে এর মধ্যে একবার বম্বে যাবার ইচ্ছা আছে।

লীলা কোন উত্তর দিল না। শুধু একদৃষ্টে ডিরেক্টরের দিকে চেয়ে রইল।

আপনার স্ক্রিপট আমি যাবার আগেই দিয়ে যাব। বেশ করে পড়ে নেবেন। আপনার মুখে একটা বিষাদম্লান ছায়া আছে, আমার মনে হয় ট্র্যাজেডি আপনার ভালই ফুটবে।

কথা থামিয়ে ডিরেক্টর একটু দম নিলেন। পাইপটা বুক পকেটে গুঁজে রেখে বললেন, আজ বেরোবেন না কি ? মাঠের দিকে যদি যান তো চলুন, ঘরে একটু হাওয়া নেই।

দম বন্ধ হয়ে আসছে ডিরেক্টর মুখচোখের এমন একটা ভাব করলেন। অসহিষ্ণু পা দুটো ঘসলেন মেঝের ওপর।

না, আজ আর যাওয়া হবে না, লীলা ঘাড় নাড়ল।

ওঃ, তাহলে চলি আজ। আমার হাতে বেশী সময় নেই। পরে দেখা হবে। ডিরেক্টর আর দাঁড়ালেন না।

ডিরেক্টর গেট পার হয়ে যেতে লীলা হীরুর দিকে ফিরল, হীরু, এখনও এদের ঋণ শোধ হতে কিছু বাকি আছে। আর একবার হয়তো গায়ে কাদা মাখতে হবে। কিন্তু এই শেষবার। তারপর মায়ে-বেটায় কাশী গিয়ে উঠব। ভিক্ষে করে পেট চালাব। মেয়েটাকে কোন অনাথ আশ্রমে ভর্তি করে দেব।

দু গাল বেয়ে লীলার চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। মোছবার কোন চেষ্টা লীলা করল না।

হীরু দাঁড়িয়ে উঠল। দু-হাত বুকের ওপর জড় করে বলল, অমন করবেন না মা। আপনি একটু ধৈর্য ধরুন। আপনি ভেঙে পড়লে, গোটা সংসার ভেঙে পড়বে। সবই বরাত মা, নয়তো ঘরের লক্ষ্মীকে এমন পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে কেন।

লীলা কোন কথা বলল না। চোখ মুছে ঘরের ভিতর চলে গেল। ধৈর্য! আর কত ধৈর্য ধরবে লীলা! ক্রমেই চাপ চাপ মেঘে ওর দিগন্ত অন্ধকার হয়ে আসছে। বিদ্যুতের ভ্রূকুটির সঙ্গে কালবোশেখীর নর্তন শুরু হয়েছে। তচনচ করে দেবে সব কিছু। মানুষকে স্থির হয়ে দাঁড়াতে দেবে না।

দিনকয়েক পরে সকালের দিকে প্রদোষবাবু এসে দাঁড়ালেন। কোন হাঁক-ডাক নয়। চুপচাপ দাঁড়ালেন দরজার গোড়ায়। কি একটা কাজে লীলা বের হতে গিয়েই পিছিয়ে এল। ঘোমটা মাথায় তুলে দিয়ে বলল, কি ব্যাপার?

প্রদোষবাবু হাত থেকে গোটানো কাগজ বের করে বললেন, ডিরেক্টর বম্বে রওনা হয়ে গেছেন, আমাকে বলে গেছেন স্ক্রিপটটা আপনার হাতে পৌঁছে দিতে।

দিন, লীলা হাত বাড়িয়ে কাগজের বাণ্ডিল টেনে নিল। তারপরেও কিন্তু প্রদোষবাবু একভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিছু বলবেন? লীলা জিজ্ঞাসা করল।

না, মানে, তেমন কিছু নয়, প্রদোষবাবু আমতা আমতা করলেন। মাথাটা চুলকে নিলেন কয়েকবার।

বলুন, কি বলবেন? লীলা আশ্চর্য হয়ে গেল। কি এমন কথা থাকতে পারে প্রদোষবাবুর, তাও আবার তার কাছে!

ইয়ে, বলছিলাম, আমার কথাটা যদি দয়া করে ডিরেক্টরকে একটু বলে দেন।

আপনার কথা?

আজ্ঞে হ্যাঁ, উনি বলেছিলেন, সুবিধা হলে এ বইয়ে আমাকে অভিনয় করার একটা সুযোগ দেবেন। ওই ছোটখাটো কোন পার্টে।

এত দুঃখেও লীলার হাসি এল। অভিনয় করতে চায় তাই বুঝি লীলাকে মুরুব্বী পাকড়েছে। লীলা বললেই ডিরেক্টর মেনে নেবেন।

বলতে পারি এক সর্তে। লীলা গম্ভীর হবার চেষ্টা করল।

বলুন কি সর্ত?

আমাকে একটা চাকরি জুটিয়ে দেবেন কোথাও। বিদ্যার পুঁজি আমার শূন্য, কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ানো কিংবা রোগীর সেবা, এসব আমি খুব পারব।

অনেকক্ষণ প্রদোষবাবু কোন কথা বললেন না। একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন লীলার দিকে। তারপর আচমকা কপালে দুটো হাত ঠেকিয়ে বললেন, নমস্কার, আমি চলি।

হনহন করে প্রদোষবাবুর পালাবার ভঙ্গী দেখে লীলা হেসে ফেলল; হায় রে, এরা কেউ বিশ্বাসও করতে চায় না যে অভিনেত্রীর অঙ্গাবরণ ফুটছে লীলার দেহে। কৃত্রিম প্রসাধন ঘষে ঘষে সে মুছে ফেলতে চায়। স্টুডিয়োর মিথ্যা মোহ থেকে মুক্তি কামনা করে।

এক বিকালে বাক্স খুলেই লীলা মাথায় হাত দিয়ে বসল। যা সামান্য অর্থ আছে, বড় জোর দিন চার-পাঁচ চলবে। ডিরেক্টর হঠাৎ বম্বে চলে যাওয়ায় এ মাসের টাকাটাও দিয়ে যেতে পারেন নি। কতদিন তিনি বিদেশে থাকবেন তারও কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই।

বরাত লীলার। বাক্স খুলে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকতে থাকতেই মোটরের হর্নের শব্দে মুখ তুলে দেখল, ডিরেক্টর নামছেন গাড়ি থেকে। চোখ বন্ধ করে লীলা পশুপতিনাথকে স্মরণ করল। আর বুঝি ভয় নেই, অন্তত অনশনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে। লজ্জাসরম সব বিসর্জন দিয়ে ডিরেক্টরের কাছে লীলাকে হাত পাততেই হবে।

কি খবর? ডিরেক্টর চৌকাঠের ওপাশে এসে দাঁড়ালেন।

কোন কথা নয়। লীলা দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়াল।

আমি দাঁড়াব না বেশীক্ষণ। কাল থেকেই স্যুটিং আরম্ভ। নটার মধ্যে তৈরী হয়ে থাকবেন। আমাকে অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে। বুঝতেই পারছেন অবস্থাটা।

ডিরেক্টরের অবস্থা লীলা খুব বুঝতে পারছে, কিন্তু লীলার অবস্থাও তো ডিরেক্টরের জানা দরকার।

শুনুন, লীলার গলার আওয়াজে ডিরেক্টর ফিরে দাঁড়ালেন।

কি ব্যাপার?

বড্ড মুশকিলে পড়েছি। থেমে থেমে লীলা মুশকিলের কথাটা ডিরেক্টরকে শোনাল।

ওঃ। ডিরেক্টর পকেটে হাত দিলেন, কথাটা মোটেই খেয়াল ছিল না। মাপ করবেন। এখন এইটা রাখুন, বাকিটা স্টুডিয়োতে দিয়ে দেব।

পূজার নির্মাল্য গ্রহণ করার আগ্রহ নিয়ে লীলা হাত বাড়াল। মুঠোর মধ্যে নোট কখানা চেপে ধরল। কাগজের টুকরো নয়, যেন কজনের পরমায়ু ওর মুঠোর মধ্যে।

॥ ষোল ॥

ন-টার অনেক আগেই লীলা সেজেগুজে তৈরী হয়ে নিল। শেষ সময়ে হুড়োহুড়ি করতে বড় কষ্ট হয়। মনে মনে শুধু একটা সান্ত্বনা। এই ছবিতেই শেষ কাজ। এর পরে খেতে না পেলেও লীলা এ পথ মাড়াবে না। সত্যি সত্যিই এ শহর ছেড়ে চলে যাবে অনেক দূরে কোথাও। কিন্তু যাবার আগে ভরতপুরে গিয়ে একবার দাঁড়াবে। হৃত-সর্বস্ব দত্তসায়েবকে একবার নিজের চোখে দেখবে। বিষদাঁত-ভেঙে-যাওয়া কালসাপকে।

মোটরের শব্দ হতেই লীলা এগিয়ে গেল। ডিরেক্টর নয়, অন্য একটি ভদ্রলোক ড্রাইভারের পাশে বসে। লীলাকে দেখে নেমে দরজা খুলে দাঁড়াল।

স্টুডিয়োর দরজাতেই ডিরেক্টর অপেক্ষা করছিলেন। লীলাকে দেখে হাসলেন, বসুন ভিতরে গিয়ে। মন্ত্রীকে দিয়ে ক্ল্যাপস্টিক দেব। তাঁরই অপেক্ষায় রয়েছি।

লীলা পাশ কাটিয়ে ভিতরে গেল। আজ স্টুডিয়ো সাজানো হয়েছে দেবদারুপাতা আর কাগজের ফুল দিয়ে। ফ্লোরে গিয়ে দাঁড়াতেই মেকআপম্যান হাজির। রেবাদেবী মেকআপ নিচ্ছেন, লীলাদেবীকেও ভিতরে যেতে হবে। দু-একটা স্টিল হয়তো তোলা হবে, তার জন্য মুখেচোখে রং মাখার ঝামেলা। তুলি দিয়ে ভ্রূটানা আর চোখের পাতা বাড়ানো। কিন্তু উপায়ই বা কি। যে দেবতার যে মন্ত্র! মাল্যদান, হাততালি, রেবাদেবীকে সামনে রেখে ক্ল্যাপস্টিক, সবই শেষ হল, এমন কি ছায়াশিল্পকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মন্ত্রীর আধঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতাও। তারপর কিছু সময় বিরতি। মন্ত্রীকে কয়েকজন গাড়িতে উঠিয়ে দিতে গেলেন।

সকলে ফিরতে ডিরেক্টর দু-একটা স্টিল ছবি তোলার আয়োজন করলেন। রেবাদেবী মুখ মেরামত করতে মেকআপরুমে গিয়েছিল, কাজেই লীলাকে দিয়েই সুরু হল।

সব ঠিকঠাক হতে ডিরেক্টরের খেয়াল হল ক্যামেরাম্যান নিখোঁজ। কাছাকাছি দু-একজনকে খুঁজতে পাঠালেন কিন্তু তারাও আর ফিরল না। কি ব্যাপার! সঠিক খবর দিল মিস্ত্রী সনাতন।

কি ব্যাপার বাইরে গিয়েই দেখুন না। ক্যামেরাম্যান মধুবাবু রয়েছেন, মোহিনীবাবুও রয়েছেন সঙ্গে।

মোহিনীবাবু খ্যাতিমান গীতিকার। ইদানীং বেশ নাম করেছেন। ডিরেক্টর বিরক্তিতে ঠোঁট কামড়ালেন, এই জন্য এদেশে ভাল কিছু গড়ে তোলা অসম্ভব। কারুর যদি সময়ের জ্ঞান থাকে। দেখি কি করছেন সবাই।

ডিরেক্টরের পিছন পিছন আরো দু-একজন বেরিয়ে গেল। মেকআপরুম থেকে রেবাদেবী বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল, ফ্লোর জনশূন্য দেখে বলল, কি ব্যাপার এত সকালেই প্যাক আপ নাকি?

লীলা ফিরে বলল, না, বাইরে কি হচ্ছে, তাই দেখতে গেছেন সবাই।

বারে, আমরা বুঝি বাদ পড়ব। চলুন আমরাও দেখে আসি।

রেবাদেবীর সঙ্গে লীলাও বেরিয়ে এল।

একটু দূরে বাগানের মধ্যে লোকের জটলা। কি যে হচ্ছে, এখান থেকে কিছুই বোঝা গেল না। সনাতন ফিরে আসছিল, রেবা তাকেই জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার সনাতন?

আজ্ঞে, মোহিনীবাবু রাস্তা থেকে কাকে ধরে এনেছেন। বলছেন বাজনার হাত নাকি চমৎকার।

সনাতন কথা বলবার আগেই বেহালার করুণ মূর্ছনা শোনা গেল। আকাশ বাতাস নিংড়ে আর্ত বিলাপ। ছায়ানটের বিরহবিধুর সুরের ছোঁয়া।

দ্রুত পায়ে লীলা এগিয়ে গেল। চেতনা নেই। সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, দুটো পা টলে টলে পড়ছে।

দু হাতে ভিড় ঠেলতেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। বাঁধানো অশত্থ গাছ। তারই নিচে বেহালাটা থুতনি দিয়ে চেপে ধরে আস্তে আস্তে ছড় টানছেন। একমাথা উস্কোখুস্কো চুল, পরনের পোশাকও ধূলিমলিন। এবার

লীলা খুব সাবধানে এগিয়ে গেল। সেদিনের মতন মানুষটা সরে না যেতে পারে। চোখের নিমেষে চোখের আড়ালে। দু হাতে বুকটা চেপে ধরে লীলা এগিয়ে গেল। কিন্তু একেবারে কাছে যেতে পারল না। হাত বাড়িয়ে ছুঁতে যাবার আগেই চোখের সামনে পুঞ্জীভূত অন্ধকার, বেহালার সুর খুব অস্পষ্ট, চেতনার ওপার থেকে যেন ভেসে আসছে।

সম্মিলিত লোকের চীৎকার। পায়ের তলার মাটি দুর্নিবার বেগে ঘুরছে। আর কিছু লীলার মনে নেই।

অনেকক্ষণ, মনে হল যেন এক যুগেরও বেশী। আস্তে আস্তে লীলা চোখ খুলল। শাড়ি, জামা, মাথার চুল সব ভিজে। এদিক-ওদিক চাইতেই নজরে পড়ল। লীলার মাথা কোলে নিয়ে শেখরনাথ। কপালে হাত বোলাচ্ছেন। নিজের দেওয়া ক্ষতচিহ্নের ওপর। ভাল করে লীলা দেখল। নিষ্পলক চোখে। মত্তপ, বার-নারী-আশ্রিত শেখরনাথ নয়, চকদিঘির জঙ্গলে প্রথম দেখা শেখরনাথ। যে শেখরনাথ সমস্ত সামাজিক বাধা ঠেলে, বাড়ির মতামত উপেক্ষা করে বলিষ্ঠ দু বাহু দিয়ে লীলাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন।

লীলার আর ভয় নেই। শেখরনাথের জন্য তো নয়ই, নিজের জন্যও নয়। জলের ঝাপটায় ওর জোর করে মাখানো রং আর কালি ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন। মেকআপের ছিটেফোঁটা কোথাও নেই। অভিনেত্রী লীলাদেবীর অস্তিত্ব নেই, তার বদলে ভরতপুরের বৌরানীর রূপ ফুটে উঠেছে। ব্রীড়াময়ী লজ্জানতা বধূ। এখনও কয়েকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে ওদের ঘিরে। তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টেনে দিতে গিয়েই লীলা বাধা পেল। দুটো হাত দিয়ে শেখরনাথ ওর হাত আঁকড়ে ধরলেন। শীঘ্র যে ছেড়ে দেবেন মুখের ভাব দেখে এমন মনে হল না।

লজ্জা ঢাকতে লীলা শেখরনাথের কোলেই মুখ লুকিয়ে ফেলল।

॥ সমাপ্ত ॥

এই লেখকের ঃ

উপন্যাস

ইরাবতী (৩য় সং)
আরাকান (২য় সং)
উপকূল (২য় সং)
তরঙ্গের পর (২য় সং)
মৃত্তিকার রং (২য় সং)
পূর্বরাগ (২য় সং)
অভিসারিকা (২য় সং)
বনকপোতী
অবরোধ
অন্য দিগন্ত
কস্তুরী-মৃগ (২য় সং)
নক্ষত্রের জাল
অন্যতমা (৩য় সং)
দূরের মালঞ্চ (২য় সং)
অভিষেক (২য় সং)
ঋতুরঙ্গ (২য় সং)
মেঘলোকে
চন্দনবাঈ

গল্প-গ্রন্থ

মরসুমী

প্রজাপতি মন

স্বপ্নমঞ্জরী

পঞ্চরাগ

মৃগশিরা

সপ্তকন্যার কাহিনী (২য় সং)

প্রান্তিক (২য় সং)

চন্দনকুঙ্কুম (২য় সং)

সুরবাহার

শঙ্খলিপি